# শান্তিনিকেতন



"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ | মাঘ, সন ১৩২৮ সাল। | ১ম সংখ্যা।

## ভূমিকা।

আমাদের আশ্রমের ছাত্র এবং আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা ক্রমশই বাহিরে বিস্তৃত হইতেছে। আমাদের পরস্পরের সহিত এবং আমাদের এই আশ্রমের সহিত সকলের যোগ রক্ষার জন্য একটি পত্রিকার অভাব আমরা বারবার অনুভব করিয়াছি। তাহারই ফলে আশ্রমিক সংঘের তরফ হইতে এই পত্রিকাটি বাহির করা হইল।

বিশ্বমানবের স্বরূপ এবং গভীরতর ঐক্যটি উপলব্ধি করিতে পারা আশ্রমে প্রতি দিনই সহজ হইয়া আসিতেছে। নানা দেশ হইতে নানা জাতির সেই সকল ব্যক্তিরা আজ আশ্রমে আসিতেছেন যাঁহারা এই নব যুগের বাণী গভীর ভাবে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আশ্রমের মন্দিরের উপদেশ আলাপ আলোচনা অধ্যয়ন এখানকার জীবনপ্রবাহের সহিত দূরে কর্ম ক্ষেত্রে গিয়াও আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটুক এই কামনা লইয়া আমরা কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি।

## বিশ্বভারতীর পরিষদ-সভার প্রতিষ্ঠা

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের আম্রকুঞ্জে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্বভারতীর সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে সংহিতি (consti tution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্য, সিলভ্যাঁ লেভি, ম্যাডাম লেভি, রাজগুরু ধর্ম্মাধার মহাস্থবির, ডাক্তার মিস ক্রামরিশ, শ্রীযুক্ত উইলিয়মস্ পিয়ার্সন, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীমতী প্রতিমাদেবী, শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায়, স্যার নীল রতন সরকার, দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এস্ কে রুদ্র, শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ, ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির উপবেশনের

স্থানটি কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক আলপনার দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি প্রদান করেন।

## শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা

আজ বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছু দিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে আজ সর্ব্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পন করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষিবৃন্দ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন আজ এখানে ডাক্তার শীল, ডাক্তার সরকার এবং ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরো সৌভাগ্য যে সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন যাঁর খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্ম্মে যোগদান করতে আচার্য্য পরম সুহৃদ সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে আমরা এঁকে পাশ্চাত্যদেশের প্রতিনিধিরূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে ইঁহার চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যে সকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছু দিন লালন পালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন,—এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতিক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

বিশ্বভারতীর মর্ম্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভাল করে তা জানেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পরম সুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তার সাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠীরূপে যে সকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তন হয়েছে। বর্ত্তমানে গবর্মেণ্টের দ্বারা যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে গুলি এই দেশের নিজের সৃষ্টি নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পুরাকালের এই বিদ্যালয় গুলির মিল আছে, এরা আমাদের নিজের সৃষ্টি। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নূতন যুগের স্পন্দন তার আহ্বান প্রকাশ পাওয়া; না যদি পায়তো বুঝতে হবে

তারা সাড়া দিচ্ছে না মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মত বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম। যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম। তাঁর ইচ্ছা সাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনি ভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতিলাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবী সমস্ত বিশ্বের,—তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব্বমহাদেশ কি সম্পদ দিতে পারে, তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্ম্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে, তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও একথা বুঝতে পেরেছেন এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশতঃ আপন ধর্ম্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে, তবে সেই অহঙ্কারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহঙ্কারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে যাচ্চে, ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে মানবের বড় অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হ'ব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সঙ্কীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড় গৌরব?

(এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও এঁকে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।) কিন্তু আমাদের দেবার কি আছে? কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কি দান করবে? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এই জন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

আমি ইচ্ছা করি আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় কিছু বলুন। আমাদের কি কর্ত্তব্য—এই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ কোথায়, তা আমরা শুনতে চাই। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করে আপনাদের অনুমতি ক্রমে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করলুম।

তাঁহার বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অধিষ্ঠাতা আচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবটির অনুমোদন করেন। তিনি বলেন যে—

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে গুরুদেব যা বল্লেন, তাকে প্রকাশ করার জন্য উপনিষদের একটি বাক্য আমরা গ্রহণ করেছি, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্', "যেখানে বিশ্ব একনীড়ে বাস করে"। বিশ্বভারতীর প্রধান কথা এই যে বাহিরের বিশ্ব সেখানে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে। বাহির ও ভিতর এ দুয়ের সামঞ্জস্য না হলে যথার্থ কল্যাণ হয় না, শান্তি লাভ করা যায় না। হয় তো কেউ মনে করতে পারেন যে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে একথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাহিক দিক দিয়েও এ সত্যকে উপলব্ধি করতে বলা হয়েছে, একথার মধ্যে এই গূঢ় ভাব নিহিত আছে। আমরা যেন সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা আমি আনন্দে ও সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার শীল মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহাকে আশ্রমের পক্ষ হইতে পুষ্পচন্দনের দ্বারা বরণ করা হইল। তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন নিম্নে দেওয়া হইল।

## ডাক্তার শীলের বক্তৃতা

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হ'ল, তাহা আমি শিরোধার্য্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হ'লাম। বহুবৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরণের educational experiment দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল' এর মত দু'একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত, এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘ-রৌদ্র-বৃষ্টি-বাতাসে বালকবালিকারা লালিত পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ প্রকৃতির আবির্ভাব নয়,—কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালকবালিকারা এক পরিবার ভুক্ত হয়ে আচার্য্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ personality এখানে সর্ব্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনি ভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আরেকটি ধ্বনিগত অর্থও আছে;—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে, আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা? যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। "Each can realise himself only by helping other as a whole to realise themselves এ যেমন সত্য এর converse অর্থাৎ "Others can realise themselves by helping each individual to realise himself" ও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্ত্তী তেমনি আমিও তার মধ্যবর্ত্তী; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এভাবে দেখতে গেলে বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কি তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্ব্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে, সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম, দেবালয় প্রভৃতি যা কিছু হয়েছিল, তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা order progress-কে মানে না, reform চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড় যুদ্ধ চলে আসছে। গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে? সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কি বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এতকালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যাপূরণ করবার কিছু আছে

কিনা? ইয়োরোপে এসম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটি-ক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর "treaty" "convention" "pact" এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে; এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে Multiple Alliance হয়েও হ'ল না, বিরোধ ঘটল। Arbitration Court এবং Hague Conference এ হল না, শেষে League of Nations এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of arimaments কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এ ছাড়া আরো অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে; কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations এর জন্য নূতন humanisim এর religious movement হওয়া উচিত। তার ফলস্বরূপ যে machinery হবে তা পার্লামেণ্ট বা cabinet এর diplomacyর অধীনে থাকবে না। পার্লামেণ্ট সমূহের joint sitting তো হবেই, সেই সঙ্গে বিভিন্ন people এরও conference হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিষ আবশ্যক হবে mass এর life;mass এর religion। বর্ত্তমান কালের কেবল মাত্র individual salvation এ চলবে না, সর্ব্ব মুক্তিতেই এখন মুক্তি,না হ'লে মুক্তি নেই। ধর্ম্মের এই mass life এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কি বাণী হবে? ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীনদেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় তো হবে না। কনফিউসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক fellowship এর উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয়, তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আরেকটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে,— তা হচ্ছে অহিংসা, মৈত্রী, শান্তি। প্রত্যেক individual এ বিশ্বরূপ দর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা, এই ভাবের মধ্যে যে Peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace, compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীন দেশের social fellowship এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অফ্ নেশনে কিছু হবে না। Great war এর থেকেও বিশালতম যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে State আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্ম্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationality তে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অফ নেশন এর nationalityর ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the world স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অফ্ নেশনে এই extra territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্ব্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে—রাজচক্রবর্ত্তী হয়েও—এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের message কি? আমাদের এখানে group ও communityর স্থান খুব বেশী। এরা intermediary body between state and individual.। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে state

ও individualএ বিরোধ বেধেছিল ; শেষে individualism এর পরিণতি হল anarchyতে, এবং state, military socialism এ গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে, বর্ণাশ্রমে এবং ধর্ম্মসংঘের ভিতরে communityর জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual যেমন আছে, তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে group personality এবং individual personality জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। Group personalityর ভিতর individual এর স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের individual personalityর বিকাশ হয়নি, co-ordination of power in the state ও হয়নি। আমরা individual personalityর দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, বূাহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

আজকাল ইয়োরোপে group principleএর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization এ সবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যা পূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন ইউরোপের কাছ থেকে State এর centralization ও organization নেবার আছে তেমনি ইউরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organization কে গ্রহণ করে আমাদের village community কে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং rurali-zation এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সে জন্য বলছি না যে town lifeকে develop করতে হবে না, তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownership এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবন ও দরকার আছে কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual ownership এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large scale production আনতে হবে। বড় আকারে energy কে আনতে হবে কিন্তু দেখতে হবে কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায় প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনি ভাবে economic organization এ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের standard of life এত নিম্ন স্তরে আছে যে আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organization এর নির্দ্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজন সাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই রাষ্ট্রনীতি:সমাজধর্ম্ম ও অর্থনীতির যে যে institution পৃথিবীতে আছে সে সবকেই study করতে হবে এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকেও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে; আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির Scheme of life আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও একজায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environment এর জন্য যে life values সৃষ্ট হয়েছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই life schemes গুলির আদান প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরী হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কি কি অভাব আছে, কি কি আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে? আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে আমরা বড় একপেশে, emotional। আমাদের

ভিতরে will ও intellect এর মধ্যে, subjectivity ও objectivityর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব subjective নয় তো খুব universal। অনেক সময়েই আমরা universalisim বা সাম্যের চরম সীমায় চলে চাই, কিন্তু differentiation এ যাই না। আমাদের objectivity র পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও observation এর ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকেও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellect এর character এর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের intellectual honestyর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে; তা হলেই দেখব যে কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে; law, justice ও equalityর যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardised product তৈরী হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalnessএর স্থান হয়েছে, আশাকরি বিশ্বভারতীতে সেই spontanietyর বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকে। Universityকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এসিয়ার genius, universal humanism এর দিকে, অতএব ভারতের এবং এসিয়ার interestএ এরূপ একটি Universityর প্রয়োজন আছে। পূর্ব্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতীরূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

অতঃপর ডাক্তার স্যার নীল রতন সরকার মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটি এই "স্থির হইল যে বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হউক এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার প্রথম সভ্যরূপে গণ্য হউন":—

১। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি, ৩। ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, ৪। প্রিন্সিপাল সুশীলকুমার রুদ্র, ৫। ধর্ম্মাধর রাজগুরু মহাস্থবির, শ্রীযুক্ত,—৬। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ৮। জগদানন্দ রায়, ৯। ক্ষিতিমোহন সেন ১০। নন্দলাল বসু, ১১। প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, ১২। নেপালচন্দ্র রায়, ১৩। ফণীভূষণ অধিকারী ১৪। ভীমরাও শাস্ত্রী, ১৫। অসিতকুমার হালদার, ১৬। উইলিয়মস পিয়ার্সন, ১৭। সি এফ অ্যাণ্ড্রুজ, ১৮। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ২০। সুরেন্দ্রনাথ কর, ২১। গৌরগোপাল ঘোষ, ২২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৩। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪। তেজেশচন্দ্র সেন, ২৫। নগেন্দ্রনাথ আইচ, ২৬। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়, প্রভৃতি।

এই উপলক্ষ্যে ডাক্তার সরকার মহাশয় বলেন—

আজ পশ্চিম দেশেও হাহাকার পড়ে গেছে—প্রচলিত শিক্ষায় মানবত্বের বিকাশ হল না। ধন লালসার ভিতর দিয়ে জাতির অবনতি দেখে সে দেশের চিন্তাশীলেরা নিরাশ হয়েছেন। তাঁরা আজ পূর্ব্বের দিকে চেয়ে আছেন—সেখান থেকে এদিক দিয়ে কি আশ্বাসবাণী পাওয়া যায়। কে কত মানুষকে দাস রূপে পরিণত করতে পারে, কে কত দেশ অধিকার করতে পারে পশ্চিমে তার প্রতিযোগিতা চলছে এই ব্যাপার দেখে একটি কথা মনে পড়ে। কম্বোডিয়া এক সময়ে বাংলাদেশের অধীন ছিল। সে দেশবাসীরা ভারতবর্ষ থেকে নানা শিক্ষা লাভ করলেন। তাদের মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হল; যখন তাঁরা স্বাধীনতার কামনা করলেন, তখন আমাদের পূর্ব্ব পিতামহরা কামান বন্দুক দিয়ে আট ঘাট বাঁধার চেষ্টা না করে, আনন্দের সঙ্গে বল্লেন—"তথাস্তু!"—এ শিক্ষা আমাদের পৃথিবীকে দেবার আছে।

ভবিষ্যতে বিশ্বমানবের অভিব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন

হবে তার সম্পূর্ণ ধারণা করা আজ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়—কিন্তু মানবের কল্পনা যতদূর যেতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত ভেবে একটা ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যকে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে তার সংস্থিতিকে যথাসম্ভব ব্যাপক করা হয়েছে—আশা করে যেতে পারে ভবিষ্যতের বৃদ্ধির পথে এ সংস্থিতি অন্তরায় হবে না।

উক্ত প্রস্তাব বিশ্বভারতীর ইতিহাসাধ্যাপক ফরাসী পণ্ডিত মসিয়র সিলভঁ্যা লেভি অনুমোদন করেন এবং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, মিষ্টার উইলিয়াম পিয়ার্সন এবং শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমর্থন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন।

"স্থির হইল যে নিম্নলিখিত সংস্থিতি গৃহীত হউক; আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অধিষ্ঠাতা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লইবেন।"

এই প্রস্তাব প্রিন্সিপ্যাল এস্ কে রুদ্র মহাশয় অনুমোদন করেন। তিনি বলেন,—"শান্তিনিকেতনে এসে আমার মনে হয় নিজের জায়গাতেই এসেছি। এখান থেকে গিয়ে যখন দিল্লীর কাজে যোগদান করি তখন দুটি জিনিস আমাকে চেপে ধরে, সরকার এবং আমার ধর্ম্ম সম্প্রদায়। এখানে এসে আমি নূতন জিনিস দেখতে পাই, আমাদের যা যথার্থ সম্পদ তা মরে নি। কিন্তু এটি গুরুদেবের শক্তির প্রভাবে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের যিনি স্থাপয়িতা তাঁর প্রাণের ঐশ্বর্য্য একে নূতন প্রাণ দিয়েছে। এখানকার বাণী সমস্ত পৃথিবীতে যেতে পারবে সে কথা আজ আবার নূতন করে উপলব্ধি করছি। সাধনার দ্বারাই আমরা আমাদের নিজের অধিকারকে ফিরিয়ে আনতে পারব। আমি এই প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।"

রুদ্র মহাশয় ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ মহাশয় তাহা সমর্থন করেন।

ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র মহাশয় চতুর্থ প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন:—

"স্থির হইল, যে অধিষ্ঠাতা-আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ১২, ২৩ ও ২৬ ধারানুযায়ী প্রথম তালিকা প্রস্তুত করিবার এবং কর্ম্মসমিতি ও শিক্ষাসমিতির প্রথম বর্ষের সভ্য নিযুক্ত করিবার ভার অর্পণ করা হউক।"

শিশির বাবু প্রস্তাব উপস্থাপন কালে বলেন "যিনি এই বিশ্বভারতীর প্রাণস্বরূপ তাঁকে এই যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এ তো অতি সামান্য। আমরা তাঁর স্বভাব জানি। ত্যাগই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র তিনি প্রভুত্ব ভাল বাসেন না। তিনি আশ্রমকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন।" উক্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় অনুমোদন এবং শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় সমর্থন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন "ডাক্তার শীল মহাশয়ের জ্ঞানের কাছে কেবল আমাদের দেশ নয়, সমস্ত বিশ্ব ঋণী। তিনি আমাদের গৌরবের সামগ্রী, আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা তাঁকে পেয়েছি।"

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অধ্যাপক সিলভঁ্যা লেভি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লেভি সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান কালে তিনি বলেন—"অধ্যাপক মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আমার আহ্বান স্বীকার করে তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। এ দেশের জন্য তাঁর অকৃত্রিম প্রেম। যে কোনো ভারতীয় ছাত্র বিদেশে তাঁর কাছে গেছে তাঁর প্রেমে তার চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে গেছে। তারা ইঁহার মুখে ভারতের অশেষ গুণগান শুনেছে, ভারতের প্রতি তাঁর প্রেম কিরূপ জানতে পেয়েছে। তিনি বহুদূর থেকে দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করে এদেশে এসেছেন। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যাবার কথা ছিল। তিনি সেই সম্পত্তিশালী দেশের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে আমাদের আশ্রমে এসেছেন। আমরা বাহ্যসম্পদে সে দেশের চেয়ে অনেক দরিদ্র। তিনি

শুধু প্রেমের আকর্ষণে আমাদের এখানে এসে জুটেছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যে যোগ এই পুণ্যক্ষেত্রে সাধিত হ'ল আজ তারই প্রথম অনুষ্ঠান। এই যোগই বিশ্বভারতীর বড় জিনিষ। পশ্চিমের প্রতিনিধিরূপে তিনি যে বিশেষ ভাবে বিশ্বভারতীর ভার গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

অতঃপর সভাভঙ্গ হইল। সভাস্থলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বভারতী পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আবেদন পত্র স্বাক্ষর করিয়া গিয়াছেন।

---

# ৭ই পৌষ।

## শান্তিনিকেতন আশ্রমের

## ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

৭ই পৌষের পুণ্যদিবসে সর্ব্বদিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে আশ্রম বৈতালিকগণ আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া "আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে" গানটি গাহিয়া সকলের নিদ্রাভঙ্গ করে। মন্দিরের পার্শ্বে সুমধুর ধ্বনিতে শানাই বাজিয়া উঠিয়া চারিদিকে উৎসবের ভাব আনিয়া দিতেছিল। আশ্রমবাসী সকলে এবং আগত অতিথি অভ্যাগতগণ মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে মন্দিরে সমবেত হইলেন। গুরুদেব মন্দিরে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম্ম আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। মন্দিরের পর সকলে "কর তাঁর নাম গান" গানটি মহর্ষিদেবের সাধনক্ষেত্র সপ্তপর্ণবেদী প্রদক্ষিণ করিয়া গাহিয়াছিলেন। তৎপর মেলার দিকে সকলে যাত্রা করিলেন।

এবার মেলায় কিছু কিছু নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের বয়ন বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকারের তাঁত আনিয়া তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সকলকে দেখাইয়াছিলেন। কলিকাতা রিসার্চ ট্যানারী হইতে নানারকমের চামড়া চর্ম্মব্যবসায়ীদের দেখাইবার জন্য আনান হইয়াছিল। তিন রকমের চরকার কাজও মেলায় প্রদর্শিত হয়। বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগের চিত্রশিল্পী ও পূর্ব্ববিভাগের ছাত্রছাত্রীদিগের অঙ্কিত চিত্রাবলী মেলায় চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর ফলে অনেক উদীয়মান অজ্ঞাত নবীন চিত্রশিল্পীর পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। একদল কীর্ত্তনীয়ারা মেলায় কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইয়াছিল। আশ্রমের কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক মেলাক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া কীর্ত্তন ও অন্যান্য গান গাহিয়া অনেককে আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সাঁওতালদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তীর-ধনুক দিয়া লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৈকালে তাহারা দলে দলে নৃত্যগীত করিয়া মেলায় উৎসব করিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও যাত্রাগীত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ভক্তগায়ক ৺নীলকণ্ঠের পুত্র বরাবর আশ্রমে উৎসবের দিন যাত্রা গান করিয়া থাকেন। এবারও তাঁহার দলই এই ভার লইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময়ে বিপুল জনতার কিয়দংশকে লইয়া ছায়া-চিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়। ইক্ষুচাষ ধানকাটা, বন্যজন্তু ধরা প্রভৃতির ছবিও বায়স্কোপের সাহায্যে দেখানো হয়। এগুলি সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিল।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাজী পোড়ানো হইয়াছিল। সায়ংকালে সহস্র সহস্র নরনারীর কলকোলাহলে আমাদের নিস্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

---

# ৮ই পৌষ।

## শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের

## বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ গুরুদেব 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নাম দিয়া একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩১৮ সালের ৮ই পৌষ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাম্বৎসরিক উৎসব নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ১৩২৬ সালের ৮ই পৌষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উচ্চতর শিক্ষা দিবার জন্য "বিশ্বভারতীর" গোড়াপত্তন হয়। এই দুই বৎসর ধরিয়া বিশ্বভারতীর উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছিল। এবৎসর গুরুদেব তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী এই দুই প্রতিষ্ঠানকে একনামে অভিহিত করিয়া "বিশ্বভারতী" অথবা The Santiniketan University নাম দিয়া ইহার সংস্থিতি প্রস্তুত করিয়া দেশের লোককে ইহা উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ৮ই পৌষ সকালে ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। ইহার বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

বিশ্বভারতীর পরিষদ সভার পরে প্রাক্তন ও বর্ত্তমান আশ্রমবাসিগণের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবক্রমে ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র মহাশয় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভে 'যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ণ ধ্মাতো অদ্রিবঃ—এই বেদ গানটি গীত হয়। তৎপরে গত বৎসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ও বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আশ্রমের ও বিশ্বভারতীর বাৎসরিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। তাহার পর আশ্রমের যে সকল পুরাতন ছাত্র অধ্যাপক ও হিতৈষীরা অদ্যকার দিনে আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের পত্রাদি পঠিত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

## ডাক্তার মৈত্রের অভিভাষণের সারমর্ম্ম

আপনারা আমাকে এই আসনে আহ্বান করিয়া বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন—এ সম্মানের আমি অনুপযুক্ত। জীবনে এ পর্য্যন্ত কোনও সত্যে উপনীত হই নাই, সত্যের পথে আমি তীর্থযাত্রী মাত্র, কর্ম্মের জগতে সামান্য মজুর। এমন জ্ঞানী এবং কর্ম্মীদের সভায় আমার সভাপতির আসন গ্রহণ করা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার। তথাপি আপনারা আমাকে যখন আহ্বান করিয়াছেন, তখন সে আহ্বান আমার শিরোধার্য্য।

এ শান্তিনিকেতন প্রকৃতই শান্তির নিকেতন। কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া যে কি শান্তিলাভ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। উত্তেজনা মানুষের পক্ষে কিছু দিন মন্দ নয়, কিন্তু বরাবর উত্তেজনার মধ্যে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

এখানকার যে শান্তি সে নির্জ্জীবতার শান্তি নয়—it is not the wintry peace of the grave yard—এ শান্তি গতির শান্তি; এ শান্তি মৃত্যুর বাহক নহে, ইহা যৌবনের দূত। এখানে এই কথাই শুনিতেছি "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। শান্তির পথিক, তোমার যেন মনে থাকে, তেজো বৈ সঃ, তিনি তেজ স্বরূপ।"

জগতের উৎপত্তিই যখন গতিশীল, তখন গতিহীন স্তব্ধতা কখনো শান্তি দিতে পারে না। বাস্তবিক কর্ম্মসন্ন্যাস ত্যাগই নহে। নৈষ্কর্ম্ম্যে ত্যাগের ধর্ম্ম প্রকটিত নহে।

ত্যাগ বলিতে আমরা বুঝি দ্বন্দ্ব প্রলোভনের মধ্যে সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, শাশ্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আরামকে বিলাসকে তুচ্ছজ্ঞান করতঃ, কঠিন কর্ত্তব্যকে বরণ করিয়া লওয়া। ত্যাগে সংসারের প্রতি উদাসীনতা নাই, কেবল ভোগের প্রতি আছে। ত্যাগী পুরুষ কর্ম্মী।

আজ শান্তিনিকেতনে যে ত্যাগের ভাব দেখিতেছি তাহা এইরূপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে অলন্ত ত্যাগের উদাহরণ শান্তিনিকেতনের কি ছাত্র কি অধ্যাপক কি দর্শককে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর একদিকে কর্ম্মীরই উদাহরণ। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বাংলার গৌরব, ভারতবর্ষের এবং জগতের গৌরব কবি রবীন্দ্রনাথ একজন প্রকৃষ্ট কর্ম্মী—এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইতে সকল কর্ম্মেই তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কবির সহিত এই আশ্রমকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবনে আমরা একাধারে ত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠার অধিষ্ঠান দেখিতে পাই। প্রত্যেক ছাত্রটীও এখানে ত্যাগ ও কর্ম্ম উভয়ের মিলন নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করে। ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ না করা ইহাদের পক্ষে কঠিন।

একাধারে এই ত্যাগ ও কর্ম্মের সমাবেশে আশ্রমটি এমন শান্তিময় হইয়াছে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"— ভোগের আশা মনে না করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এই রূপ কর্ম্ম যতদূর শাখা প্রশাখা মণ্ডিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ততই মঙ্গল। অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল—সমাজনীতি, এবং সামাজিক জীবনেরই একাংশ মাত্র যে রাষ্ট্রনীতি, ছাত্রদের পক্ষে তাহার চর্চ্চা একেবারেই বর্জ্জনীয়। আমার মনে হয় এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। এই আশ্রম-বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণ স্বরূপ কবি রবীন্দ্রনাথও এ ধারণা পোষণ করেন না। সেইজন্যই এই আশ্রমে এত স্বাধীন চিন্তা আমরা দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে কোনও প্রতিবন্ধকতাই তিনি রাখেন নাই। মানব প্রকৃতি যে বিশ্বনিয়মের অনুবর্ত্তী, তাহা ইংরাজের শাসন মানে না, সমাজরক্ষকের শাসনও মানে না। যাহা স্বাভাবিক যাহা নৈসর্গিক তাহাকে জোর করিয়া বন্ধ করিতে গেলেই তাহা চতুর্গুণ শক্তিতে বাধা ঠেলিয়া অস্বাভাবিক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। শান্তিনিকেতনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ত্যাগ আছে বলিয়াই ত্যাগ এবং সংযম এখানকার ছাত্রদের মজ্জাগত। সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সেইজন্যই এত স্বাভাবিক ভাবে তাহারা আলোচনা করিতে পারে, এ সকল হইতে কোনও অনিষ্ট তাহাদের ঘটে না।

আমি এই মাসের "Calcutta Review" এ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কবি রবীন্দ্রনাথের মূল মন্ত্র হইতেছে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, humanity in its totality। এই মূল মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রা'খয়া তিনি সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। এই শান্তিনিকেতনেও তাহারই উদাহরণ দেখিতে পাই। এখানে সর্ব্বাগ্রে এই কথাই মনে হয়, এখানকার ছাত্রজীবন কলিকাতার ছাত্রজীবনের তুলনায় কত বেশী পূর্ণ। বহুমূল্য অট্টালিকা, সাজসরঞ্জাম সত্ত্বেও এখানকার তুলনায় সে জীবন রিক্ত।—সমবায় বোধ (corporate feeling) সেখানে কতই কম, অন্য ছেলেদের সুখ দুঃখ সেখানে কয়জনের নিকটেই বা বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয়।—কিন্তু এখানে সকলেই পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ—সে বন্ধন সুধু একত্র বাসের বন্ধন নহে আশ্রমের প্রত্যেক গাছটি প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক ইষ্টকটির সহিত তাহাদের একটী নাড়ীর টান আছে। ইহাদের সব চিন্তা বই এর পাতার মধ্যে আবদ্ধ নহে, দেশের এবং দশের কথা ইহারা চিন্তা করে, social service এখানকার ছাত্রজীবনের একটি অঙ্গ।—Co operative movement এখানে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। আশা করা যায় নবাগত Mr. Elmhirst এর চেষ্টায় ইহা আরও পল্লবিত হইয়া উঠিবে। কৃষিশিক্ষার এখানে বিশেষ আয়োজন চলিয়াছে। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার শিক্ষা এই আশ্রমের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা ইহাদের জীবনকে যে স্ফূর্ত্তি এবং পূর্ণতা দিতেছে, অন্যত্র তাহা দেখা যায় না।

আজ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা এখানে হইল। যে আদর্শে শান্তিনিকেতন এতদিন চালিত হইয়াছিল সেই আদর্শ বিশ্বভারতীও গ্রহণ করিল। সমগ্র জগৎ নূতন আলোক পাইবার আশায় এই বিশ্বভারতীর দিকে তাকাইয়া আছে—

কেননা যে ভাবে এই শান্তিনিকেতন এতদিন চালিত হইয়াছে তাহাতে এই বিশ্বভারতীর নিকট হইতেই আমরা সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারি যাহা আমাদিগকে অসৎ হইতে সতে, তমঃ হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতে পারে।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পরে আশ্রমপ্রতিষ্ঠার দিন রচিত "মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ" গানটি গীত হইলে সভাভঙ্গ হয় এবং সকলে আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া "আমাদের শান্তিনিকেতন" গান করেন।

৮ই বৈকালে পুরাতন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের sports হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীবিনায়ক মাসোজী (বিশ্বভারতী) শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন) ও শ্রীঅতুল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমান) বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সাঁওতাল বনাম আশ্রমের tug of war এ সাঁওতালগণ এবং সাঁওতাল বনাম প্রাক্তনদের tug of war এ প্রাক্তনগণ জয়ী হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা নাট্যশালায় প্রধানতঃ প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে "বিসর্জ্জন" নাটকটি এবং সংস্কৃত "বেণীসংহারের" কিয়দংশ অভিনীত হইয়াছিল। প্রধান পাত্রগণের অংশ নিম্নলিখিতরা লইয়াছিলেন :—গোবিন্দ মাণিক্য শ্রীসন্তোষ চন্দ্র মজুমদার. নক্ষত্ররায়—শ্রীসরোজ রঞ্জন চৌধুরী, রঘুপতি শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জয়সিংহ ও অশ্বত্থম (বেণীসংহার)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। সকলেরই বিশেষতঃ রঘুপতির ও অশ্বত্থমার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বিসর্জ্জনের জনতার দৃশ্যগুলি সরোজ রঞ্জন বিশ্বভারতীর ছাত্র শচীন্দ্র কর প্রভৃতি খুব জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের দরুণ মোট ৭॥০ টাকা আদায় হইয়াছিল। তাহা প্রাক্তনছাত্রদের গৃহনির্ম্মাণ-ফণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান ছাত্রগণ বিনা টিকিটে অভিনয় দেখিয়াছিল।

---

# আশ্রম-সংবাদ

গত শ্রাবণ মাসের প্রথমে বিদেশ হইতে গুরুদেবের আশ্রমে প্রত্যাগমনের পর হইতে নানা দিকে কর্ম্মস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর সংস্থিতি সংগঠন ছাড়া বহুবিধ কার্য্যে জড়িত থাকিয়াও গুরুদেব আশ্রমের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিয়াছেন। প্রায় প্রতি দিনই সন্ধ্যার সময়ে সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিছু না কিছু পড়িয়া তিনি শুনাইয়াছেন এবং তাহার পর সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই সময়ে "বলাকা" কাব্যগ্রন্থ পড়া হইতেছে। এই সূত্রে কবিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা, ছন্দ প্রভৃতির মূলগত তাৎপর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছে তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকদের গোচর করার ইচ্ছা রহিল।

বিশ্বভারতীর কাজ ও জমিয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স হইতে স্বনামধন্য প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সিলভাঁ লেভি সস্ত্রীক গত কার্ত্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে আশ্রমে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি, অমায়িকতা এবং নম্রতা আশ্রমবাসী সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতা করা ছাড়াও, বিশ্বভারতীর ছাত্রদের তিনি খুব উৎসাহের সহিত তিব্বতী ও চীন ভাষা শিক্ষা দিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বাগচী তাঁহার নিকট চীন ভাষা শিক্ষা করিতে বিশ্বভারতীতে যোগদান করিয়াছেন।

অধ্যাপক লেভির পত্নীও আশ্রমের কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। ফরাসী ভাষার সর্ব্বোচ্চশ্রেণী তিনি নিয়মিত পড়াইতেছেন।

মিষ্টার এল্‌ম্‌হার্ষ্ট নামক একজন ইংরাজ কৃষিতত্ত্ববিৎ আমেরিকায় কৃষিতত্ত্ব-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিশ্বভারতীর

কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। সুরুলের বাড়ী ও জমিতে তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতীর কৃষি-শিক্ষা-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কৃষি ও কৃষিশিক্ষাকেন্দ্র সমূহ তিনি পরিদর্শন করিয়া নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

অষ্ট্রীয়াবাসিনী ডাঃ মিস্ ক্র্যামরিশ পি.এইচ্.ডি.আশ্রমে আর্ট-সমালোচক রূপে আগমন করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর চিত্রকলার অধ্যাপকদিগের সহিত তিনি বর্ত্তমানে য়ুরোপীয় চিত্রকলার বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। বিশ্বভারতী-তে তিনি জার্ম্মান ভাষাও শিক্ষা দিতেছেন। আশ্রমের ছোট ছোট বালিকাদের মিউজিক্যাল ড্রিলও তিনি শিক্ষা দিতেছেন।

সম্প্রতি আশ্রমে একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন গুপ্তা কিছু দিন হইতে আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বিদুষী মহিলাটি এই ছাত্রীনিবাসের বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজী অধ্যাপনারও সহায়তা করিতেছেন।

আশ্রমের হিতৈষী মাত্রেই শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন যে আশ্রমের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে গত অগ্রহায়ণ মাসে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রদের সহিত মিশিয়া তাহাদের হৃদয় আবার তিনি অধিকার করিয়া লইয়াছেন। বিশ্বভারতীর ইংরাজি ক্লাশে ও বিদ্যালয়ের ইংরাজি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগে সর্ব্বদাই তাঁহার সহায়তা পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ্ সাহেব দেশের কাজের সহিত এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে সম্প্রতি তাঁহার পক্ষে আশ্রমে একসঙ্গে অধিকদিন বাস করা ঘটিয়া উঠিতেছে না। গত এক বৎসরের উপর ভারতবর্ষের পীড়িত আর্ত্তদের জন্য নানা স্থানে তাঁহাকে যাতায়ত করিতে হইয়াছে। গত আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে তিনি পূর্ব্বআফ্রিকা যাত্রা করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিয়াছিলেন যে বিশ্বভারতীর ক্লাশ আবার নিয়মিত পড়াইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে আরামের অবকাশ রাখেন নাই—তাঁহাকে মোপলাবিদ্রোহের সম্পর্কে মালাবার প্রদেশে যাত্রা করিতে হইয়াছে।

গত চৈত্র মাস হইতে আশ্রমে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের প্রসার লাভের সহিত তাহার ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের আবশ্যকতা বোধে "বিশ্বভারতী সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে চিত্রকলা, সমাজনীতি সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা এবং চিত্রপ্রদর্শনী, সঙ্গীত ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই সম্মিলনী হইতে পরিচালিত "বিশ্বভারতী" নামে চিত্রশোভিত এক খানি হস্ত লিখিত পত্রিকা মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

"আশ্রম সম্মিলনীর" কাজ ভালই চলিতেছে। নূতন বৎসরে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদক, শ্রীক্ষীরোদ গোপাল সিংহ ও শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত মাসে ইহার বার্ষিক সভায় পূজনীয় গুরুদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্বৎসরের প্রতিবেদন সভায় পঠিত হইয়াছিল। ছাত্রদিগের পরিচালনার সর্ব্বপ্রকার ভার ছাত্রগণের হাতেই সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত আছে। যে সকল নায়ক, অধিনায়ক প্রভৃতি ছাত্র—পরিচালনার জন্য নির্ব্বাচিত হয় তাহারা যাহাতে তাহাদের দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে এবং প্রত্যেক ছাত্রের দায়িত্ব-বোধ যাহাতে জাগ্রত হয় সে সম্বন্ধে এই সভায় বিশেষভাবে আলোচনা হয়।

ছাত্রগণের হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা গুলি বাহির হইতেছে। গত বৎসর কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সে গুলি এখন চলিতেছে না। সাহিত্য সভাতেও ছাত্রগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সুহৃদ নৈশ ও প্রসাদ বিদ্যালয় দুইটি ভালরূপে চলিতেছে। সুহৃদ নৈশ বিদ্যালয়ে এখন চার জন ছাত্র বৈকালে নিয়মিত অধ্যাপনা করিয়া থাকে।

প্রসাদ বিদ্যালয়ের একজন বেতনভোগী শিক্ষক আছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়টির সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্র পরলোকগত প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়টি সযত্নে পালন করিতেন, তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

অতিথি সমাগম—আশ্রম পরিদর্শন করিতে অনেক অতিথির সমাগম এখানে হয়; তন্মধ্যে ইয়োরোপীয় পর্য্যটকের সংখ্যা কম নহে। ডাক্তার বে নামক একজন লিথুয়ানীয়ান বিজ্ঞানবিৎ আশ্রমে নিভৃতে বাস করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। তিনি তিন মাস আশ্রমে যাপন করিয়া হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছেন। সম্প্রতি Madam Du Manziarly নামে একজন রুষ দেশীয়া বিদুষী মহিলা আসিয়া ছিলেন। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ এবং রুষ ও ফরাসী ভাষায় সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি দুই দিন রুষের বর্ত্তমান অবস্থা ও রুষ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর অধ্যপক ও ছাত্রদের সহিত কলাভবনে যে মনোজ্ঞ আলাপ ও আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে অনেক নূতন কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। জার্ম্মানী হইতে প্রত্যাগত আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মোহন বসু কিছু দিনের জন্য আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। তিনি Electric Theory of matter সম্বন্ধে কয়েক দিন অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। গত ৬ই জানুয়ারী তিনি পুনরায় জার্ম্মানি যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র মহাশয় এক সপ্তাহ আশ্রমে বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, চরিত্রের মাধুর্য্য এবং গভীরতা আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

৯ই পৌষ—৯ই পৌষ সকালে প্রচলিত প্রথা মত আম্রকুঞ্জে পরলোকগত আশ্রমবাসীদের স্মরণ করিবার জন্য শ্রাদ্ধসভায় অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সভার পরে প্রাক্তন ছাত্রদের নির্ম্মিত গৃহে আশ্রমিক সংঘের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হন—(ক) আশ্রমিক সঙ্ঘ—সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ধনাধ্যক্ষ-শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর; কার্য্য নির্ব্বাহিকা সমিতির সভ্যগণ, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেন গুপ্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (খ) "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সরোজ রঞ্জন চৌধুরী, সহকারী কার্য্যাধক্ষ শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়, ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকা সমিতির সভ্যগণ, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক, শ্রীযুক্ত তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুহৃদ কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপোধ্যায়। ৯ই পৌষ বৈকালে প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ হইয়াছিল তাহাতে প্রাক্তনগণ একগোলে জয়লাভ করিয়াছিল।

২৫ ডিসেম্বর ১০ই পৌষ—খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত উইলিয়াম্‌স্ পিয়ার্সান খৃষ্টের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

## কলিকাতা সংবাদ

বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গুরুদেব কলিকাতায় প্রায় তিন সপ্তাহ কাল কাটাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে লইয়া যে সকল সভাসমিতি হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। (১) ১৫ই আগষ্ট, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্বর্দ্ধনা এবং তদুপলক্ষ্যে "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধ পাঠ (২) ১৮ই আলফ্রেড থিয়েটরে ঐ বিষয়েই মৌখিক বক্তৃতা। আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হইয়াছিল এবং টিকিট বিক্রয়ের টাকা (৬৪০।০) খুলনা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। (৩) ২০শে, কলকাতা সেবা সমিতির অভ্য-

র্থনা (৪) ২১ শে, সঙ্গীত সঙ্ঘের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে গানের মজলিস। তাহাতে গুরুদেব গান সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন। (৫) ২৯ শে, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধ পাঠ। (৬) ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর, জোড়াসাঁকোতে "বর্ষামঙ্গল" উৎসব। তাহাতে ১৮টি বর্ষাবিষয়ক গান গীত হয় এবং গুরুদেব "কণিকা"র তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেন। গুরুদেব, শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতীর পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগের সঙ্গীতজ্ঞ ছাত্রছাত্রীগণ এবং আশ্রমের কলিকাতাস্থ সুগায়ক বন্ধুবান্ধবেরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে গুরুদেব ষষ্টি-বৎসরে উপনীত হওয়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থরাজি গুরুদেবকে সাহিত্য পরিষদ এই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর জন্য উপহার দিয়াছেন।

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতায় "বিশ্বভারতী-বন্ধু-সভা" নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাহিরে প্রচার করা এবং নানা বিষয়ে আশ্রমকে সাহায্য করা ইহার উদ্দেশ্য। "বর্ষামঙ্গল" প্রধানতঃ বন্ধুসভার উদ্যোগে সম্পন্ন হয়।

গত ১৭ই ডিসেম্বর ছাত্রসমাজ কর্ত্তৃক আহুত একটি সাধারণ সভায় আমাদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ মহাশয় "রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

## বৈদেশিক সংবাদ

এবার পাশ্চাত্য দেশে গুরুদেব কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন সংবাদ পত্রে তাহার বিবরণ সকলেই পড়িয়াছেন। এই ব্যক্তিগত সম্মান ব্যতীত নানা পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত তাঁহার পুস্তকগুলিও সেখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেছে এবং তাঁহার নাটকগুলি নানা দেশে অভিনীত হইতেছে। আমরা বৈদেশিক সংবাদ পত্র হইতে সম্প্রতি যে সকল খবর পাইয়াছি তাহা এখানে দিলাম।

গত ৭ই নভেম্বরের বার্লিনস্থ Der Tag পত্রে প্রকাশ:—বার্লিনের ট্রিবিউন থিয়েটারে বৈকালিক অভিনয়ে গুরুদেবের 'দি গার্ড্‌নার' এবং 'দি ক্রেশেণ্ট মুন' (শিশু) হইতে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছিল।

গত ১৭ই নভেম্বর Doebelner Anzeiger পত্রে প্রকাশ:—জার্ম্মানীর Doebeln সহরে 'দি পোষ্ট অফিস' ('ডাকঘর') এর প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

গত ২৭শে নভেম্বরের Alpenlandische Zeitung পত্রে প্রকাশঃ—অষ্ট্রীয়ার ইন্‌স্‌ব্রুক্‌ সহরের Stadt Zheatre এ 'দি স্যাক্রিফাইস্‌' ('বিসর্জ্জন') অভিনীত হইয়াছিল।

গত ২০শে ডিসেম্বরের National Zeitung পত্রে প্রকাশঃ—সুইট্‌জারল্যাণ্ডের Basle সহরে প্রতি রবিবার সকালে ধর্ম্ম-বিষয়ক নানা নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ করা হইয়াছিল। 'দি পোষ্ট অফিস্‌' ('ডাকঘর') নাটকের অভিনয়ের দ্বারা এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

---

Printed by—Jagadananda Ray
at the Santiniketan Press, Santiniketan, Birbhum.

# গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

"শান্তিনিকেতন" পত্রিকার গ্রাহক মহোদয়গণের নিটক ১ম সংখ্যা নমুনা স্বরূপ ভিঃ পিঃ না করিয়াই পাঠান হইল কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিয়াই পাঠান হইবে। যদি কাহারো গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে আপত্তি থাকে তো আগামী ৩রা ফাল্গুনের মধ্যেই আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে অনর্থক আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে।

আজ কাল ভিঃ পিঃ খরচ অত্যন্ত বেশি। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা যদি আগামী ৩রা ফাল্গুনের মধ্যেই পত্রিকার বার্ষিকমূল্য ১॥০ দেড় টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দেন তো ভাল হয় নতুবা তাঁহাদের ভিঃ পিঃ খরচ অতিরিক্ত দিতে হইবে।

"শান্তিনিকেতন" পত্রিকা প্রতি মাসের ১৫ই তারিখেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।

নিবেদক

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শান্তিনিকেতন পোঃ (বীরভূম)

---

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ } ফাল্গুন, সন ১৩২৮ সাল। { ২য় সংখ্যা

৭ই পৌষে মন্দিরের উপদেশ ও ব্যাখ্যান।

## দীক্ষা

যে মহাত্মা এই আশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করেন আজ তাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিক উৎসব। আমরা সকলে জানি যে যৌবনারম্ভে হঠাৎ একদিন সেই দীক্ষার মন্ত্র ছিন্নপত্র সহযোগে বাতাসে তাঁর হাতে এসে পড়ে। সেই মন্ত্র তিনি সকল জীবন ধরে সাধনা করেন। আমাদেরও সকলের জীবন সেই দীক্ষার অপেক্ষা করছে। আমাদের জন্যও তেমনি করেই দীক্ষামন্ত্র বাতাসে ফিরছে। প্রতিদিন প্রভাতের আলোকে সেই মন্ত্র বিকীর্ণ হচ্ছে; কেবল সেটা আমাদের হাতে এসে পড়বার অপেক্ষা আছে। হাতে যে অকস্মাৎ এসে পড়ে তাও ঠিক নয়—ভিতরে আমাদের চিত্ত যখন অনুকূল হয় তখন বাইরে থেকে দীক্ষা কেমন করে' আপনি এসে পৌঁছায়।

অথচ অন্তরের গভীরতার মধ্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আছে—সেই আকাঙ্ক্ষা বারে বারে তাকে তার আবরণ ছিন্ন করতে বল্‌চে, নিজেকে নূতনতর করে প্রকাশ করতে বল্‌চে; কালের যে-সব আবর্জ্জনা মানুষের চারিদিকে জমে উঠে' তার পথকে বাধাগ্রস্ত করে, যে বাধাগুলি অভ্যাসক্রমে সে আপন আশ্রয় বলে কল্পনা করে এসেচে, তাকে ধূলি-সাৎ করে' নিজেকে আবার সম্মুখে অগ্রসর হতে বল্‌চে। মানুষের ইতিহাস এই বারে বারে বাধা মোচনের ইতিহাস। বারে বারে তার মনের মধ্যে এই বাণী এসেচে, "ত্যাগ করতে হবে," এই বাণী এসেচে, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—ওঠ, জাগ, আরামের শয্যা ত্যাগ কর, সঞ্চয়ের স্তূপ ধ্বংস কর; সেই পথে চল কবিরা যাকে বলেন, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ।" অভ্যাসের [illegible] অন্তরের এই গভীরতম বাণীকে মানুষ অনেক [illegible] অবজ্ঞা করে,—চলার পথের বাধাকেই ক্রমশ বিপুল করে তোলে তখনই প্রচণ্ড বিপ্লব ঝড়ের মত এসে পড়ে। [illegible] হঠাৎ কোথা থেকে অবতীর্ণ হয়ে ঐশ্বর্য্যপ্রাকারবেষ্টিত

জাতির চিত্তকে আঘাত করে,—যে পুরাতন প্রথার আবরণে তার সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে পরম বেদনায় তাকে ছিন্ন করে দেয়, ঘোষণা করে যে কোনো বেষ্টনের মধ্যে তার চিরস্থিতি হতে পারে না। সেই জন্য অপ্রত্যাশিত অপঘাতে দেশ সহসা তার দীক্ষার মন্ত্র লাভ করে।

নবজীবনের দীক্ষার মন্ত্র তেমনি করেই শোকের অভিঘাতে অভ্যাসের বাধা বিদীর্ণ করে মহর্ষির চিত্তের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল। সেই দীক্ষার অমৃতবাণী ভারতের প্রাচীন তপোবনে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। আজ আমাদের কে তাকে গ্রহণ করবে, কখন গ্রহণ করবে, বর্ত্তমান যুগে সেই অপেক্ষা রয়েচে। সেই বাণী নবজীবনের মন্ত্র বহন করচে, কে তাকে নিতে প্রস্তুত আছে? আমরা প্রত্যক্ষ দেখেচি, আধুনিক কালে একজন মহাত্মার চিত্তক্ষেত্রে সেই মন্ত্র বীজরূপে এসে পড়েছিল।

## সে মন্ত্রটি কি?

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। আমরা চোখে যা দেখচি তা কি? এই যে নানা গতিবেগ পরিবর্ত্তনের মধ্যে যা চলছে ঘটছে, এটাই ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাহিরের এই গতিকেই মানুষ চরম বলে স্বীকার করে নি। যাঁর দৃষ্টি সত্য হয়েচে তিনি এই চলনশীলতার ভিতর যখন পরিপূর্ণতার আদর্শ দেখেছেন তখন তাঁর চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম সত্য হয়েচে। অন্ধ গতিকে চরম বলে মেনে নিলে জগতে বিরোধের অন্ত থাকে না। মানুষ তা' হলে ঘোর অন্ধতার দ্বারা নীত হয়ে চলে, পরস্পরকে বেদনা দেয়।

কিন্তু শুধু ধ্যানের দৃষ্টিতে সত্যকে দেখা এবং সেই ধ্যানের আনন্দে মুগ্ধ থাকাই জীবনের পূর্ণতা সাধন নয়। দীক্ষার মন্ত্র শুধু ধ্যানের মন্ত্র নয়, তা কর্ম্মের মন্ত্র। সত্যের দীক্ষা নিখিলের সঙ্গে চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মের সত্য যোগসাধন করে—সেই যোগে কল্যাণ। সেই জন্য এই দীক্ষা মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে বটে যে বিশ্বজগতে যা কিছু নিরন্তর চলচে তাকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে উপলব্ধি কর কিন্তু কেবল আন্তরিক উপলব্ধির মধ্যেই মন্ত্রটি থামে নি, তার পরে বলা হয়েচে, যে, যে ভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে সেই আকাঙ্ক্ষাকে কোন্ সত্যের দ্বারা নিয়মিত করবে? "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে—"মা গৃধঃ", লোভ কোরো না। লোভের দ্বারা মানুষ ভোগের যে আয়োজন করে তাতেই অনর্থপাত করে; সেই ভোগ নিজের আত্মাকে অবরুদ্ধ ও অন্যের আত্মাকে পীড়িত করতে থাকে—অবশেষে একদিন প্রলয়ের মধ্যে তার অবসান হয়। তার কারণ যে-লোভ স্বার্থের দিকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে তা' সেই বাণীকে অস্বীকার করে যে বাণী জানায় যে, যা কিছু আছে সমস্তকে এক অনন্ত পুরুষের দ্বারা অধিকৃত ব'লে জানবে। লোভ ক্রোধ মোহ আমাদের চিত্তের স্বাভিমুখী গতি, তা' আমাদের স্বার্থের সীমার দিকে টানে, যিনি সকলকে সর্ব্বত্র অধিকার করে আছেন তাঁর দিকের থেকে ফিরিয়ে আনে। এই জন্য পৃথিবীতে লোভকৃত কর্ম্ম স্বার্থঘটিত চেষ্টা কোনো মহৎকে সৃষ্টি করে না—কেন না সৃষ্টি সেই সত্যের দ্বারাই হয় যা নিস্বার্থ আনন্দময়। পূর্ণতার যে প্রেরণা সেই হচ্চে সৃষ্টির প্রেরণা, সেই হচ্চে ত্যাগের প্রেরণা। সেই ত্যাগের দীক্ষাই আমাদের সত্য দীক্ষা, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ।"

মানুষের দৈহিক জীবনের ক্ষুধা তৃষ্ণা বেদনা তাকে ছোট গণ্ডীতে বদ্ধ করে' স্বার্থের দাবীর দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছে, প্রবৃত্তির বেগ তাকে বিচলিত করছে। কিন্তু সে বলে যে এই দাবীকে যদিও অস্বীকার করা কঠিন তবুও একে চরম ব'লে গ্রহণ করা যায় না। আমাদের পেট ভরানো ও সংগ্রহ করার সীমাকে নিরন্তর অতিক্রম করতে থাকলে অবশেষে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে, আত্মা মাথা নেড়ে ব'লে, না, এতে হলো না, আমার এতে পরিতৃপ্তি নাই। এমনি করেই এক দিন এক মহাপুরুষের কাছে আকাশের আলোও কালো ব'লে বোধ হয়েছিল। গভীরতম আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঐশ্বর্য্যের সুখ স্বপ্নে তাড়না করল। কিসের জন্য অন্তরের বেদনা, কি

চাই—তা তখনো মনে আসে নি। আত্মার ক্রন্দন তাঁকে আঘাত করে জাগাল, এমন সময়ে যে দীক্ষার মন্ত্র ভারতের বায়ুতে ভেসে বেড়াচ্ছিল তাই তাঁর কাছে সহসা এসে পৌঁছিল।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

সেদিন থেকে তাঁর যা কিছু ত্যাগ আর নিবেদন সব সেই পরমানন্দ স্বরূপের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে অহঙ্কারের বন্ধন বারে বারে ক্ষণে ক্ষণে ছিন্ন করতে হয়েছে। সমগ্র জীবন ধ'রে তিনি অনন্ত জীবনের লক্ষ্যপথে আত্মাকে প্রবৃত্ত করেছেন।

এই তো মানুষের সাধনা। সে যখন ত্যাগের দ্বারা আপন সম্পদকে নিখিলের কাছে উৎসর্গ করে অমনই সে সত্য হয়ে উঠে। এত দুঃখ বেদনার ভিতরও মানুষ তা অনুভব করছে। সে বুঝছে যে কেবলই অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে, বিষম ঘূর্ণিপাকে তার অশান্তির শেষ নাই। কিন্তু তার নিজের এবং তার চারিদিকের জড় অভ্যাসে ক্ষুদ্রের পথেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, ভূমার পথে না। সেই অভ্যাসের অচেতনতার থেকে তার জাগরণ আর ঘটবে না—সেইজন্য প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের মধ্যে যে উদ্বোধনের দীক্ষা আমাদের কাছে আসচে, যে দীক্ষা আমাদের প্রাচীন ভারতে সত্যদ্রষ্টার কণ্ঠে বাণী লাভ করেচে সে ত বারে বারেই ফিরে যাচ্চে। কিন্তু সেই দীক্ষা সাধকের সার্থক জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে আজ প্রবেশ করুক। এখনই আমাদের শুভক্ষণ আসুক। এখনই আমাদের আত্মার গভীরতম প্রতীক্ষাকে সেই মন্ত্র অমৃতের দীক্ষায় চরিতার্থ করুক।

## আনন্দরূপ

শ্লোক পাঠ—ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। ইত্যাদি……

পরিপূর্ণতার আনন্দের থেকেই জগৎ উৎসারিত হচ্ছে। সেই পরিপূর্ণতার আহ্বানেই বিশ্বের এবং সকল ইতিহাসের গতি তদভিমুখে চলচে। এই সত্যের দ্বারা পূর্ণ করে বিশ্বকে দেখতে হবে। তাকে যন্ত্রের মত করে দেখলে হবে না। কোনো কাব্যে তার বাইরের যে রূপ প্রত্যক্ষ হয় তা হচ্ছে ব্যাকরণের নিয়মে, কথার বন্ধনে এবং নানা চেষ্টা ও কষ্টের মধ্যে তার যান্ত্রিক রূপ। কিন্তু কাব্যের আন্তরিক সত্যটি এই ব্যাকরণেই পর্য্যাপ্ত বললে চলবে না। বাইরের থেকে বিশ্লেষণ করে দেখলে কেবল এই ব্যাকরণের নিয়মটাই দেখানো যেতে পারে, কারণ তার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। কিন্তু তার ভিতরকার সত্য কেবল আমাদের নিজের ভিতরকার উপলব্ধির থেকেই দেখা যায় আর কিছুতেই তাকে দেখানো যেতে পারে না। কবিতার আদি ও অন্তে যে আনন্দ আছে তা সেই বলতে পারে যে ব্যক্তি কবিতার আনন্দরূপকে আপন আনন্দের মধ্যেই দেখতে পায়। ব্রহ্মবাদী তেমনি করে বিশ্বের অন্তরের রূপকে দেখেছেন। তিনি আপন আনন্দ হতেই বিশ্বের ভিতরকার সত্যকে দেখতে পেয়েছেন। বিশ্বের যান্ত্রিকতারও একটি দিক আছে। কিন্তু ব্রহ্মবাদীরা বলছেন যে আনন্দের প্রেরণার দ্বারাই যান্ত্রিক জগৎ বিধিবদ্ধ হচ্ছে, সেই প্রেরণাকে যে না দেখছে সে কেবল কষ্টটাকেই নিয়মের জটিলতাকেই দেখছে। মনীষী জ্ঞানের সন্ধানে যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি ভুলে নিরন্তর প্রয়াসে নিযুক্ত থাকেন তখন বাইরের থেকে তাঁর সেই তপস্যা দেখে' তাঁর অজ্ঞ ভৃত্য মনে করে যে তার প্রভু কি বিষম দায়ই বহন করছেন, তাঁর যেন দুঃখের শেষ নাই। সে জানে না যে এই কষ্ট আনন্দেতে লীন। অথচ সে বাইরে থেকে যে প্রকাশ দেখছে তা কেবল মাত্র কষ্ট চেষ্টা দুঃখকেই সপ্রমাণ করছে। জ্ঞানের সার্থকতাকে যে ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া জানে সে নিশ্চিত বিশ্বাসেই জানে যে এই বিচিত্র দুঃখরূপের মূল কথাটি হচ্চে আনন্দ। তাই ব্রহ্মবাদী বলছেন যে বিশ্বের মূল কথা হচ্ছে আনন্দ।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন।" মন্ত্রকে 'শেষ

[illegible] যোগবিয়োগ অন্ধভাবে চলছে এটা [illegible] দুঃখ হয়। যে মানুষ আত্মার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দরূপকে দেখছে তার ভয় ঘুচেছে। আত্মার আনন্দেই আমরা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানতে পারি, তাঁকে মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে বুদ্ধি বারবার প্রতিহত হয়ে ফিরে ফিরে আসবে। সব আনন্দেরই প্রকৃতির মধ্যে আছে দুঃসাধ্য সাধন। নিরানন্দ যে সেই ভীরু এবং ভীরু যে সে আনন্দের কর্তৃত্বকে বহন করতে পারে না, দুঃখকে সে একান্ত দুঃখরূপেই পায়, মৃত্যুকে সে একান্ত মৃত্যুরূপেই জানে। কিন্তু পরম সত্যের আনন্দ যাঁর চিত্তকে অধিকার করে তাঁর কোন ভয় নেই। কোনো ক্ষতিতে তাঁর ক্ষতি নেই, কোনো দুঃখে তাঁর পরাভব নেই।

## গান

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়  
পূর্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়।  
এস অপরাজিত বাণী  
অসত্য হানি  
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়।  
এস নব জাগ্রত প্রাণ  
চির যৌবন জয় গান।  
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা  
জড়ত্ব নাশা  
ক্রন্দন দূর হোক বন্ধন হোক ক্ষয়।

## নবযুগ

নব অরুণোদয় [illegible] নবযুগের প্রভাত এসেছে! শান্তি-[illegible] নবযুগের অভ্যর্থনার ভার নিয়েছি। [illegible] অন্ধকার রাত্রি কেটে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রাচীন কালের বিরোধের যুগ, পরস্পরের [illegible] করবার যুগ কেটে গেছে। যে বিশ্বাসের মধ্যে নব সৃষ্টির শক্তি আছে তাকে আমরা গ্রহণ করব।

প্রতি বৎসরের উৎসবে এই দিনে সত্যকে আমরা কিছু না কিছু নূতন করে অনুভব করবার ও এইরূপে সমস্ত বৎসরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করবার চেষ্টা করি। প্রতি বৎসর আমরা কিছু না কিছু লাভ করেছি যা আমাদের ক্ষুধা দূর করেছে। এবৎসর আমাদের শান্তিনিকেতনে নূতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হ'ল। এখানে আমাদের নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে। 'অপরাজিত বাণী' এসেছে, তাকে আতিথ্যদান করবার জন্য আজকের আয়োজন। এ অনুষ্ঠান কোনো বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার জন্য বা কোনো ক্ষুদ্র কর্তব্য সাধনের জন্য নয়। আজ আমরা জয়ধ্বনি জাগাব। নূতন যুগের এই ব্রত নিয়েছি একথা আজ ঘোষণা করতে চাই সেই নবযুগের জন্য আমরা প্রস্তুত হই। যে অবস্থায় প্রাচীনকাল বদ্ধ ছিল সে অবস্থায় একসময়ে প্রয়োজন ছিল। যেমন বীজকে প্রথমে ছোট আলে রোপন করা হয়, তারপর অঙ্কুরোদ্গম হ'লে তাকে বৃহৎ ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হয় তেমনি এক একটি জাতি ছোট সীমানার মধ্যে সত্যসাধনার বীজ বপন করেছিল, কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার ভৌগোলিক সীমা অসত্য হয়ে গেছে। জলে স্থলে আকাশে পথ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। অতীতের বাধা দূর হয়ে গেছে। চিরাভ্যাসক্রমে এই বাধাকে আজও যে স্বীকার করে সে এই বাধাগুলিকে দৃঢ় করে তোলাই আজও তার সাধনা বলে কল্পনা করেচে। জাতীয় বিচ্ছেদের সীমাগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে সে পাকা করে খাড়া করবার চেষ্টা করচে। সমুদ্র পর্বত দিয়ে দেশের যে সব সীমা নির্দিষ্ট ছিল তার ভার মানুষকে তেমন করে বহন করতে হয় নি। কিন্তু আজ কৃত্রিম সীমাবেষ্টনকে জোর করে ধ্রুব রাখবার যে উদ্যোগ নিরন্তর সৈন্য সামন্ত অস্ত্রশস্ত্রের যে আয়োজন তার ভার কৃত্রিমতার ভার, এই জন্য তা দুর্ভর। এই ভার যতই বাড়ে মন ততই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে সংশয়ের কারণ ততই বাড়তে থাকে—পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ততই দূর হতে দূরে প্রসারিত হতে থাকে। এমনি করে অস্ত্রের ভারবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের রিপুর ভার এবং রিপুর ভারবৃদ্ধির সঙ্গে তার

অস্ত্রের ভারবৃদ্ধি অন্তহীন আবর্ত্তে ঘুরতে থাকে। এমনি করে কৃত্রিম আত্মরক্ষার চিরবর্দ্ধমান প্রভূত প্রয়াসের চাপে প্রবল জাতিরা আত্মবিনাশের প্রবল উপায় কেবলি উদ্ভাবন করচে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যে, মানুষের সঙ্গে মানুষ যে একত্র হয়েছে এই মহৎ ঘটনাকে আমরা আজও সত্য বলে অনুভব করতে পারচি নে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেই প্রাচীন অভ্যাসটাকেই মনের মধ্যে পাকা করে তোলবার চেষ্টা এখনো চলচে—তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় করে তোলাকেই আমরা কর্ত্তব্য বলে স্থির করেচি। এমন অবস্থায় কোনো একজায়গায় আজ সেই বাণীর ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই যে বাণী সীমাবদ্ধ অতীত কালের বাণী নয়, যে বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী। সেই থান থেকে বলতে হবে, নবযুগ এসেচে নব অরুণোদয় হয়েচে। এই বাণী কারা ঘোষণা করবে? ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত যারা তারা নয়; তারা যে প্রবল বন্যায় ডুব্‌তে ডুব্‌তেও তাদের অতীতের সঞ্চয়কে আঁকড়ে থাকে—তারা যে লুব্ধ—বাহিরের ধনকেই একান্ত বলে মানাই যে তাদের চির অভ্যাস। তাই অকিঞ্চনের কণ্ঠ থেকে নবযুগের জয়ধ্বনি উঠ্‌বে এমন আশা আছে। বিধাতা অক্ষমকে দিয়ে সবলকে পরাভূত করেন। পৃথিবীতে বড় বড় উন্নত মস্তক যাঁদের চরণধূলি গ্রহণ করে, সার্থক, তাঁদের চরণ আশ্রয়হীন পথের ধূলির মধ্যে বিচরণ করেচে।

এমন কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাই যে যতক্ষণ রাষ্ট্র-শক্তিতে আমরা শক্তিমান না হই ততক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমাদের সত্য প্রচারের অধিকার নেই, অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে ধনে মানে সমকক্ষ না হলে তার কাছে আমরা আত্মার বাণী বহন করতে পারব না। কিন্তু পৃথিবীতে সত্যের যাঁরা দৌত্য করেচেন তাঁদের কয়জনই বা বাহ্য সম্মানের পাথেয় নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করেচেন? দারিদ্র্য ও অপমানে কি তাঁদের বাণীর অধিকারকে হরণ ও তার তেজকে খর্ব্ব করেচে? কত কৌপীনধারী ভিক্ষু মানুষের ইতিহাসকে চিরকালের মত অগ্রসর করে দিয়েচেন। বিধাতা কালে কালে দেখিয়েছেন যে যারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত তারা মহতী বিনষ্টির দিকে গেছে। মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আমরা বাহ্য ক্ষমতায় হীন হলেও আত্মার বাণী আমাদেরই কণ্ঠের অপেক্ষা করেছে। নিষ্ঠুর পৃথিবীর সামনে নম্র হয়ে আমরাই বলব দেবতার আহ্বান এসেছে। নব অরুণোদয় হয়েছে। আমরাই পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে বলব, ঐশ্বর্য্যের মোহ দূর হয়ে যাক্,—আনন্দের সঙ্গে বলব কোনো ভয় নেই। যার বহু সম্পদ আছে সে সম্পদ রক্ষা করতে তাকে সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকতে হয়। সে আপনার দ্বাররুদ্ধ রাখে—সেই রুদ্ধতা তার আত্মাকেই সঙ্কীর্ণ করে। তার কাছে পরম সত্য সহজ হয় না; আপনার লোভতৃপ্তির দ্বারাই সে আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা বলব, তোমরা লোভকে বিশ্বাস কর, আমরা ত্যাগকে বিশ্বাস করি, তোমরা অস্ত্রশস্ত্রকে বিশ্বাস কর আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি।

এস অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

# মন্দিরের উপদেশ।

## ৪ঠা মাঘ ১৩২৮

আমি পূর্ব্বেই বলেচি আমাদের ঋষিদের বলে মন্ত্রদ্রষ্টা। অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে তাঁরা যে সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখেচেন, যা তাঁদের মনন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেচে তাকেই তাঁরা মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেচেন। এই মন্ত্রগুলিকে মনন করে আমরাও যতক্ষণ মনের মধ্যে তাদের স্পষ্ট করে না উপলব্ধি করব ততক্ষণ আমাদের জীবনে তাদের সার্থকতা ঘটবে না। শুধুমাত্র আবৃত্তি করে গেলে কোনই ফল নেই। এই মন্ত্র-

গুলির সুরের সঙ্গে আমাদের জীবনের সুর মিলিয়ে নিতে হবে এই জন্যেই তারা অপেক্ষা করচে। কিন্তু তাদের সেই গভীর সুরটি যদি স্পষ্ট করে না শুনতে পাই তাহলে সুর মেলাব কি করে?

আমরা "পিতানোহসি" এই যে মন্ত্রটি আমাদের উপাসনায় ব্যবহার করে থাকি, উচ্চারণ করতে করতে এটিকে হৃদয়ের ভিতরে ত দেখ্‌তে হবে। কেননা পিতার সত্যকেই পরম সত্য বলে তাঁরা বিশ্বের মধ্যে এবং চিত্তের মধ্যে নিঃসংশয়ে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন এই জন্যেই তাঁরা এমন জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমাদের পিতা, তুমি আছ" চৈতন্যের দ্বার উন্মুক্ত না করে এই কথাটির সমস্ত সত্য আমরা গ্রহণ করতে পারিনে।

এমন কত মন্ত্র আছে যা আমাদের সাধনার আশ্রয়। তার মধ্যে একটি যেমন ;"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাচ্চেন। যিনি অনন্ত তাঁকে আমরা বাক্যমনের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারিনে, অতএব তিনি অবাক্ত এমন কথা বলা যেতে পারত কিন্তু যিনি পরম সত্যকে পরম আনন্দরূপে সুস্পষ্ট দেখেচেন তিনি সে কথা বল্‌বেন কি করে? তিনি তাঁর দেখাটিকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে রাখ্‌তে পারেন নি, বলে উঠেচেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

কেবলমাত্র অন্তরের ধ্যানের মধ্যেই যে তাঁর উপলব্ধি তা নয়, যা কিছু প্রকাশমান তার মধ্যে তাঁর আনন্দ রয়েচে এই-টেই হচ্চে এই মন্ত্রের ভিতরকার কথা। যা কিছু সমস্তের মধ্যেই সেই আনন্দের অমৃতরূপ দেখ্‌তে পেলেই তবেই এই মন্ত্রটিকে আমরা দেখ্‌তে পাব।

জগৎকে কেবলমাত্র বাইরের দিক থেকে ব্যবহারের দিক থেকে দেখি বলেই আশ্চর্য্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ আমাদের ব্যর্থ হয়। আমাদের প্রাত্যহিক অভ্যাস সংস্কার ও প্রয়োজনের ঘন আবরণের মধ্য দিয়ে এর সত্যরূপ দেখাই হয় না। আমাদের অহং-এর সীমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে যা দেখি তা মরীচিকা মাত্র, তা মৃত্যুর দ্বারা অধিকৃত, তার মধ্যে অমৃতের পরিচয় নেই।

সমস্তকে বর্জ্জন করে দূরে গিয়ে একটা বিশুদ্ধ শূন্যতার মধ্যে আনন্দ পাব, অর্থাৎ অপ্রকাশের মধ্যেই সত্য এ কথা আমরা গ্রহণ করতে পারব না। এই যা কিছু দেখি শুনি স্পর্শ করি, এই সমস্ত ধূলো মাটিতে যাকে তুচ্ছ বলি আর যাকে মূল্যবান করে কল্পনা করি সমস্তই এক অখণ্ড অমৃতের অন্তর্গত।

যা সুখকর তাই আনন্দকর এমন কথা দুর্ব্বলের কথা। সুখের প্রাণ ছোট, সে আঘাতে ক্লিষ্ট হয়, ক্ষয়ে তার ক্ষতি করে, কিন্তু দুঃখসাগরের তরঙ্গেও আনন্দের রুদ্রবীণায় ঝঙ্কার ওঠে। যাঁরা বলেছিলেন "আনন্দরূপমমৃতং" তাঁরা কিছু বাছাই করে নিয়ে বলেননি তাঁরা উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা সংসারক্ষেত্র থেকে সুখের কণা খুঁটে খুঁটে নিয়ে ভিক্ষুকের মত কৃপণের মত ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিয়ে কথা কন নি,—তাঁরা সুখদুঃখ সুন্দর অসুন্দর সমস্তকেই বিরাট আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ করে দেখিয়েছিলেন।

আমাদের অন্তরে যে সব রিপু আছে তাদের কাজ হচ্চে জগৎকে খণ্ডিত করে নিয়ে তাতে নিজের রং মাখিয়ে সেই ক্ষুদ্র ফলকটির উপরে নিজের নাম সই করে দেওয়া। আমাদের আমি মনে করে এম্‌নি করেই সে যেন নিজেকে চিরন্তন করে তুল্‌বে। সে নিজের আয়ত্তের বাইরেকার আর সমস্তকেই ছায়াময় করে দিয়ে তাকে অস্বীকার করে। ভূমাকে লুপ্ত করতে চায় নিজেকে বড় করবার জন্যে, কিন্তু একথা যদি আমরা স্পষ্ট করে বুঝতে পারি যে এই আমাদের খণ্ডিত জগৎ সত্য জগৎ নয় এবং সেই জন্যেই আমরা এই মায়ার মধ্যে কেবল মৃত্যুর বঞ্চনাই দেখচি সত্যের অমৃতরূপ দেখচিনে তাহলে আমাদের সাধনা কি পরিমাণে সফল হচ্চে তা প্রতিদিন পরীক্ষা করে জানতে পারি, আমাদের আত্মার সঙ্গে বিশ্বের স্পর্শ ক্রমশ বাধামুক্ত হয়ে অব্যবহিত হয়ে উঠ্‌চে কিনা তা অনুভব করতে পারি।

প্রতিদিন প্রভাতে স্বর্গের মুক্ত উৎস হতে যখন আনন্দের স্রোত আলোকের ধারায় জল স্থল আকাশকে প্লাবিত করে দিচ্চে তখন যদি দেখি আমার চিত্তের দৃষ্টি আবৃত হয়ে রয়েচে

অসাড় রয়েচে আমার মন, ক্ষুব্ধ রয়েচে আমার অন্তঃকরণ তাহলে একথা বুঝবে যে, "আনন্দরূপমমৃতং" এই মন্ত্রের সঙ্গে আমার সুর মিল্‌চেনা।

তখন নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে কেন মিল্‌চেনা? কোথায় লুকিয়ে রয়েচে, লোভ ক্রোধ দুশ্চিন্তা! স্তব্ধ হয়ে বসে ধীরে ধীরে ভিতরকার গ্লানি দূর করে দিতে হবে,— ক্রমে ক্রমে চিত্তের আকাশ যখন নির্ম্মল হবে, অক্ষুব্ধ হবে, তখন সেই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখতে পাব। ক্ষণকালের জন্যেও এই আনন্দের স্পর্শকে হৃদয়ের মধ্যে যদি পাই তাহলে জীবনের সমস্ত বেসুর ক্রমে ক্রমে ঘুচে যেতে থাকবে, এবং আমাদের চিন্তা বাক্য ও চেষ্টা সত্যের সৌন্দর্য্য লাভ করবে।

যিনি আনন্দময় তিনি বিশ্বের অমৃতরূপকে ব্যক্ত করেচেন নিজের পূর্ণতা থেকে; বাইরের তাড়না বা প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে নয়,—বিশ্বের সত্যরূপ যখন দেখি তখন এই সত্যটি আমরা জান্‌তে পারি এবং তখন এই সত্যের দ্বারাই আমাদের নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হয়! আমাদের জীবন আমাদের সৃষ্টির ক্ষেত্র। এই সৃষ্টিতেই আমাদের আত্মার প্রকাশ। সেই প্রকাশ যদি অমৃতরূপের প্রকাশ হয় তা হলে সত্য প্রকাশ হয়। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের জীবনের সৃষ্টি অমৃতরূপের সৃষ্টি—এই সৃষ্টির দ্বারা তাঁরা মানবাত্মার চির সত্যকে প্রকাশ করেন। তাঁদের জীবনের কর্ম্ম অন্তরের পূর্ণতা থেকে উৎসারিত—স্বার্থের তাড়না রিপুর উত্তেজনা থেকে নয়। তাঁদের চিত্তের মধ্যে আনন্দ তাঁদের কর্ম্মের মধ্যে অমৃত। বিশ্বসৃষ্টির যে সত্য, তাঁদের জীবনের সৃষ্টিরও সেই সত্য। তাঁদের জীবনে এই মন্ত্রটি উজ্জ্বল হয়ে আছে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

---

## ১৩২৭—১৩২৮ সালের প্রতিবেদন।

গত বৎসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় গত ৮ই পৌষের বার্ষিক সভায় আশ্রমের যে প্রতিবেদন পাঠ করেন আমরা তাহা হইতে কয়েকটি বিষয় সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বর্ত্তমানে বৃত্তিভোগী অধ্যাপকের সংখ্যা ২১ জন, তন্মধ্যে ৩ জন বিশেষ ভাবে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

আলোচ্য বৎসরের শেষ তারিখে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ১৬৫ জন তন্মধ্যে ৩২ জন, অধ্যাপকদের পরিবারভুক্ত আত্মীয়। এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন্ দেশ হইতে কতজন আসিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। সিন্ধু—৫, আসাম (শ্রীহট্ট)—১১, কাথিয়ার—১, বর্ম্মা—২, ছোটনাগপুর—৩, যুক্তপ্রদেশ—৪, নেপাল—২, খাসিয়া—১, গুজরাট—১১, জয়পুর—২, কচ্ছ—৫, বঙ্গদেশ—৯৩, সিংহল—৪।

বর্ত্তমান বর্ষে আশ্রমের পাকশালা হইতে মোট ৪, ৬৬৬ জন অতিথি বিনাব্যয়ে একবেলা আহার করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ছয় জন করিয়া অতিথি ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার এককালীন এবং মাসিক নিয়মিত দানের উপরেও এ বৎসর আরও সতর হাজার আট শত উনপঞ্চাশ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

আশ্রমের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বান্ধবদের নিকট হইতে এ বৎসর চব্বিশ হাজার টাকা দান সাহায্য আমরা পাইয়াছি।

পুস্তকাগারের পুস্তকসংখ্যা গতপূর্ব্ব বৎসরে ১০,০০০ ছিল, এ বৎসর তাহা বাড়িয়া ১১,৬৩০ হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে ছয় বাক্স পুস্তক আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাণা ফরাসী হইতে তাঁহার পরলোকগত পুত্রের বহুমূল্যবান্ পুস্তকসমূহ এবং ফ্রান্সের ম্যজেগিমে তাহাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী আশ্রমকে উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাহাদের প্রকাশিত

গ্রন্থরাজি দান করিয়াছেন। ভারতীয় ইতিহাস ও প্রাচ্য-বিদ্যা সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলীর সংগ্রহ চলিতেছে।

এ বৎসর ছাত্রগণ ফুটবলে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। তাহারা কুচবিহার, বর্দ্ধমান, কাঞ্চনতলা, গুসকরা, এবং কলিকাতার অগিল্‌ভি হোষ্টেল, অক্স্‌ফোর্ড মিশন হোষ্টেল ও বেঙ্গলটেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ এই কয়েকটি জায়গার খেলোয়াড়দের সহিত ফুটবল ম্যাচে সকলের নিকটই জয়ী হইয়াছে।

আশ্রমের হাঁসপাতালে আটজন রোগীর শয়নের ব্যবস্থা আছে, ইহা যথেষ্ট নয় সুতরাং হাঁসপাতালকে বৃহত্তর করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

সুরুলের ১৯ বিঘা ধানের জমিতে এবার ৫৪ মণ ধান ও ৭ কাহন খড় উৎপন্ন হইয়াছে। তরিতরকারী, খেজুর গুড়, চীনাবাদাম আখ প্রভৃতিও কিছু কিছু পাওয়া যায়। সুরুলের গোশালা হইতে মোট ৬৬৮৷৹ আনার দুধ পাওয়া গিয়াছে। আশ্রমের ১৫ বিঘা জমি হইতে মোট ৪১ মণ অর্থাৎ ১৪৩৷৷৹ আনার ধান এবং সবজিবাগানে ৭৪৮৫ পাইয়ের ফসল পাওয়া গিয়াছে। নেবুবাগানের গাছগুলি গত বৎসরের ভীষণ রৌদ্রদাহে অধিকাংশ মরিয়া গিয়াছে।

---

# আশ্রম-সংবাদ

সাতই পৌষের বাৎসরিক উৎসবের পর জনকোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পদ্মাবক্ষে কিছুকাল কাটাইবার নিমিত্ত গুরুদেব গত ১৩ই পৌষ শিলাইদা গিয়াছিলেন। সপ্তাহকাল কাটাইয়া গত ২২শে পৌষ সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি নূতন নাট্য লিখিতে এতদিন প্রবৃত্ত ছিলেন। সেটি সমাপ্ত হইলে ৩০শে পৌষ আশ্রমবাসীদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। সংশোধন ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় দুইবার পাঠ করিয়াছিলেন। তিন দিনের জন্য কলিকাতা গমন করিয়া বন্ধুদিগের নিকট নাট্যটি দুইদিন পড়িয়াছিলেন।

অতিথি-সমাগম।—গত ৭ই মাঘ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কন্যা এবং সহোদরা শ্রীমতী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় আশ্রমে আসিয়াছিলেন। শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী ভিজিয়ানাগামের মহারাণীর সংগৃহীত প্রায় একশত প্রাচীন মোগল, কাঙ্‌রা ও রাজপুত চিত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে আকবরের আমলের ইন্দো-পারসীয়ান মিশ্রণ চিত্রও দু-একটি ছিল। ছবিগুলি প্রাচীন হইলেও পূর্ব্বকালের ওস্তাদ শিল্পীদের নকল চিত্রই ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল। দুখানি মোগল বাদসাহর আকৃতি-চিত্র এবং দু তিন খানি কাঙ্‌রা (বা কাশ্মিরী) ও একটি রাজপুত চিত্র নিপুণ শিল্পীর কলমে আঁকা বলিয়া মনে হয়। মোগল আমলের প্রাচীন চিত্র গুলি ছাত্রদের বিশেষভাবে দেখিবার ও জানিবার সুবিধার জন্য কলাভবনের চিত্রশালায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। আশ্রমের সকলেই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২৯শে পৌষ হল্যাণ্ড হইতে মিসেস্ ভ্যান্ ঈগেন নামে একজন বর্ষীয়সী মহিলা কিছুদিন আশ্রমে বাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। হল্যাণ্ডে বাস কালে গুরুদেব পুত্র, পুত্রবধূ ও মিঃ পিয়ার্সনের সহিত এই মহিলার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিসেস ভ্যান ঈগেনের সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা আছে। তিনি বাংলা গান শিখিতেছেন, এবং বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রীকে নিয়মিতরূপে য়ুরোপীয় সঙ্গীত ও স্বরলিপি শিক্ষা দিতেছেন। ইঁহার মধুর চরিত্র এবং মাতৃহৃদয় আমাদের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে।

মাদ্রাসের "লীগ অব টিচর্‌স্ এ্যাণ্ড পেরেন্টস্"এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুলকারনি গত ২২ ও ২৩শে পৌষ আশ্রমে ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিক্ষানীতি ও শিশুদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কলিকাতার বিখ্যাত নাহার পরিবারের শ্রীযুক্ত পৃথ্বিসিং নাহার কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে আসিয়াছিলেন। বিশ্ব-

বিশ্বভারতীতে জৈনধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনার যে ব্যবস্থা হইতেছে সে সম্বন্ধে তিনি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

গত ১৬ই মাঘ পিঠাপুরামের মহারাজবাহাদুর সপরিবারে আশ্রমে আগমন করিয়া তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার বীণকরও আসিয়াছেন। তিনি দুই তিন দিন সন্ধ্যায় বীণা বাজাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। বীণকর উপস্থিত আশ্রমে থাকিয়া বীণাবাদন শিক্ষা দিতেছেন।

পুস্তকালয়।—পূজার ছুটির মধ্য হইতে এবার আশ্রমে গৃহ নির্ম্মাণ ও সংস্কার কার্য্য বিশেষ তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে দিন দিন নানা দেশীয় বহুমূল্য পুস্তক আসিতেছে কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ ভাল করিয়া বন্দোবস্ত করা যাইতেছে না। সেইজন্য লাইব্রেরি গৃহের উপরকার দোতলা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে—এবং তাহার পাশে নূতন বড় পুস্তকাগার নির্ম্মিত হইতেছে। লাইব্রেরিটি সম্পূর্ণ হইতে এখনও কিছুদিন সময় লাগিবে।

ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। সত্য, মোহিত ও শমীন্দ্র কুটীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে দুইটি দ্বিতল গৃহের পত্তন করা হইয়াছিল তাহার একটি সম্পূর্ণ হইয়াছে অন্যটিও শেষ হইতে বিশেষ বিলম্ব নাই। নূতন দ্বিতলটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে।

যান—বোলপুর সহরে ও ষ্টেশনে গমনাগমনের জন্য একটি মোটরলরি আনা হইয়াছে। তাহাতে মাল ও যাত্রী দুই বাহিত হয়।

৭ই পৌষের উৎসবের পর নূতন বৎসরের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও সাতদিনের ভ্রমণের ছুটি ছিল। পাঁচজন অধ্যাপকের সহিত ৫টি দল নানা দিকে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। আশ্রমের অদূরবর্ত্তী কোপাই নদীর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিতে কয়েকজন ছাত্র ও প্রাক্তনছাত্র-অধ্যাপক বাহির হইয়াছিলেন। পদব্রজে তাঁহারা সাঁওতাল পরগণার উপসীমায় উপস্থিত হইয়া কোপাই নদীর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন। অন্য একদল বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে গিয়াছিলেন। আর একটি দল দেওঘর, ঋরিয়া প্রভৃতি স্থানে ও অন্য দুটি দল সাহেবগঞ্জ, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। একটি দল মুঙ্গেরে রেলের ধর্ম্মঘটের জন্য আট্‌কাইয়া গিয়া জলপথে মুঙ্গের হইতে গোয়ালন্দ দিয়া ঘুরিয়া আসেন। ইঁহাদের ভ্রমণ সব হইতে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

আশ্রম হইতে ২২মাইল দূরে কবিবর জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুলি তীর্থে প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় ৪।৫ দিন ধরিয়া মেলা হয়। সেখানে নানা স্থান হইতে বাউল, সন্যাসী দরবেশ প্রভৃতি আসিয়া থাকেন। মেলাতেও ২৫।৩০ হাজার লোক হয়। আমাদের আশ্রম হইতে কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র গমন করিয়া চারদিন মেলাস্থানে তাঁবুতে বাস করিয়াছিলেন। যাহাতে অজয় নদীর উপরের দিকের জল দুষিত না হয় তাহার জন্য আমাদের দল বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছয়টি বৃহৎ পুষ্করিণীতে ঔষধ দিয়া জল শুদ্ধ করা হইয়াছিল। খাবারের দোকানের জলেও ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। দোকানে জলখাবার খাইয়া লোকেরা যে সকল পাতা রাস্তা ও দোকানের আশে পাশে ফেলিয়া দেয় তাহা অচিরে পচিয়া স্বাস্থ্যহানিকর হইয়া উঠে। সেগুলি আমাদের কলাবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ছাত্রদের লইয়া ঝুঁড়ি করিয়া সরাইয়া ফেলিতেন। মেলাতে জল বিতরণের চেষ্টা সফল হয় নাই। রোজ সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে ছায়াচিত্র দেখাইয়া শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনায়ক মাসোজী প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেন লোকে খুব উৎসাহের সহিত শুনিত। ইহা ব্যতীত স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা চিত্র মেলার স্থানে স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছিল। অধ্যাপক লেভি, তদীয় পত্নী ও ডাক্তার ক্রাম্‌রিশ বাউল ও বৈষ্ণবদের গান সাধনভজন দেখিবার জন্য প্রায় ত্রিশমাইল পথ গরুর গাড়ীতে কেন্দুলি গিয়া এক রাত্রি কাটাইয়া আসিয়াছেন। মেলা দেখিয়া এবং

বাউলদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আচার্য্য লেভি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তি এবং সৌজন্যের গুণে আশপাশের সাধারণ লোকদের সহিত অতি সহজে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

সভা—আশ্রমসম্মিলনীর পূর্ণিমা ও অমাবস্যা অধিবেশন-গুলি নিয়মিত ভাবে হইতেছে। গত পূর্ণিমা সম্মিলনীতে শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশী তাঁহাদের কোপাই অভিযানের মনোজ্ঞ বিবরণ পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন।

অমাবস্যা সম্মিলনীতে কাজের কথা হয়। অধিনায়ক-গণের মন্তব্য, প্রতিনিধিগণের প্রতিবেদন ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। এবারকার সভার বিশেষ আলো-চনার বিষয় ছিল ছাত্রদিগের বিচার সভার পুনর্গঠন।

৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে সকালে মন্দিরে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিয়া ছিলেন।—আগামী সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইবে।

দ্বিপ্রহরে শালবীথিকায় স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের স্মরণ সভা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সভা-পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বসু তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কালী-মোহন ঘোষ মহর্ষিদেবের জীবনের মূলগত তত্বটি ব্যক্ত করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীমান্ বামন ভাণ্ডারে স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গ্রন্থ এবং জীবনস্মৃতি হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করেন।

গত ১৩ই মাঘ সন্ধ্যায় সাহিত্য সভার অধিবেশন হইয়া-ছিল। ছাত্রগণ নিজেদের রচিত গল্প, ভ্রমণ কাহিনী কবিতা ইত্যাদি পাঠ করিয়াছিল। বালকগণ ছোট দুটি হেঁয়ালী নাট্য অভিনয় করিয়াছিল। নূতন বৎসরে শ্রীমান্ পরেশ নাথ বিশী সাহিত্য সভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ফরাসী হাস্যরসিক নাট্যকার মোলিয়্যারের ত্রৈশতাব্দীক উৎসবে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। গুরুদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্ব-ভারতীর ফরাসী ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পেস্টনজি [illegible] ভাই মরিস্ মহোদয় অমর সাহিত্যিক মোলিয়্যারের জীবনী ও লেখার সহিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় সাধন করিয়াছেন। অতঃপর অধ্যাপক লেভি মূল ফরাসী ভাষায় মোলিয়্যারের একটি সনেট ও একটি ব্যঙ্গ নাট্যের একটি দৃশ্য পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি বিশেষ উপভোগ্য হইয়া-ছিল। সব শেষে গুরুদেব হাস্যরস-প্রধান নাট্য ও লেখার সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন।

গত ১০ই মাঘ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কবীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অধ্যাপক লেভি ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স এর সভাপতি রূপে আহূত হইয়া কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি ঢাকা গমন করিবেন।

ডাঃ স্টেলা ক্রামরিশ শিল্পকলা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মিশর, এসেরিয়া, গ্রীস্, ও ইটালীর শিল্পকলার বিষয় পর্যন্ত বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে তিনি মধ্যএসিয়া, চীন জাপান ও ভারতবর্ষের শিল্পকলা সম্বন্ধে বলিবেন।

বিশ্বভারতীর নূতন সংহিতি অনুসারে পরিষৎ সংগঠিত হইতেছে। সংসৎ, কর্ম্ম সমিতি, শিক্ষাসমিতি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য কর্ম্মকারকগণের নাম দেওয়া হইল ;—

ধনরক্ষক—শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ম্মসচিব—শ্রীজগদানন্দ রায়

অধ্যক্ষ উত্তরবিভাগ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

অধ্যক্ষ পূর্ব্ববিভাগ—শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

কর্ম্মসমিতি—অধিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, অধ্যক্ষদ্বয়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ও শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। নির্ণীত শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ কর, সি, এফ, এণ্ড্রুস্। মনোনীত শ্রীযুক্ত

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরগোপাল ঘোষ, অনিলকুমার মিত্র, এবং ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাসমাসে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর দুইটী অধিবেশন হইয়াছে। একটিতে বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ সৈয়দ্ মজতুবালি "শিশুমারী" বিষয়ে একটি রচনা পাঠ করেন। দ্বিতীয়টিতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় "ক্ষুদ্রের খেলা" নাম দিয়া শব্দতত্ত্ব বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। "ক্ষুদ্র" শব্দের উৎপত্তি এবং নানা ভাষায় তাহার রূপান্তর কেমন করিয়া হইল তাহা অতি সুন্দররূপে তিনি বুঝাইয়াদেন। গুরুদেব সভাপতি ছিলেন।

গত ডিসেম্বর মাসে আশ্রমের দুইটি প্রাক্তনছাত্র শ্রীশ্যামকান্ত সর্দ্দেশাই ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য জর্ম্মণী গমন করিয়াছেন। শ্রীশ্যামকান্ত উচ্চ বিজ্ঞান বিশেষত রসায়ন শাস্ত্র ও জ্যোতিষচন্দ্র চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন সংকল্প করিয়া গিয়াছেন। গত সপ্তাহে বার্লিন হইতে তাঁহাদের চিঠিতে পৌছনসংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

## দেশ বিদেশের সংবাদ।

(১)

গত ১৪ ই মাঘে আশ্রমের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত সেবক বোমানজি য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বোম্বাই সহরে "পার্শি রাজকীয় সভায়" বক্তৃতাকালে বলেন:—

মধ্য য়ুরোপের প্রদেশগুলি—এমন কি ফ্রান্স, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি মিত্র রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা পরম আগ্রহের সহিত কেন পর্য্যালোচনা করিতেছে তাহার কারণ আমি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আমাদের কবি রবীন্দ্র নাথ ঐ সকল প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতেরা আমাদের এই বরেণ্য কবিকে যখন তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন তখনকার সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। পাঁচ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় পীড়িত হইয়া যে প্রেম এবং শান্তি লাভ করিবার জন্য য়ুরোপের মানবাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহারই একটি পূত মূর্ত্তবিগ্রহরূপ কবির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন। এমন কি সুইডেনের রাজাও কবিকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার এই পরম সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর বাণী এবং বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মধ্য-য়ুরোপের সুধীবর্গ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধী দ্বারা প্রবর্ত্তিত স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতের এই নব আন্দোলন তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহৃদয়তার সহিত পর্য্যালোচনা করিতেছেন।

(২)

আয়র্লাণ্ডের নবীন কবি Padraic Colum—যাঁহাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজবিদ্রোহী বলিয়া আয়র্লাণ্ড হইতে আমেরিকায় পলাইতে হইয়াছিল—তিনি ১৭ই ডিসেম্বর Nation ও Athenaeum সাপ্তাহিক পত্রে য়ুরোপ হইতে যে সকল মনীষী ব্যক্তিরা গত বৎসর আমেরিকায় বেড়াইতে বা বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয় আলোচনাচ্ছলে লিখিতেছেন:—

আমেরিকার খবরের কাগজ যে উদ্দেশ্যকে (Cause কে) সুনজরে না দেখে তাহার বিষয় যদি কোন য়ুরোপের বক্তা বক্তৃতা দেন তবে আমেরিকার জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় পূর্ব্ব পর্য্যটনের বিজয় গৌরবস্মৃতি এবারকার পুনরাগমনের উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার এক মাত্র কারণ এই যে তিনি—প্রকাশ্য সভায় না হউক—কথাবার্ত্তায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের সপক্ষে মত দিয়াছিলেন।

ইহা শুনিয়া ইংরাজেরা হয়ত মনে করিবেন যে আমেরিকার মত বন্ধু তাঁহাদের আর কেহ নাই। কিন্তু ইহা সত্য

নহে। রবীন্দ্রনাথ যদি সুদূরের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন তাহা হইলেও আমেরিকাবাসীর হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিতেন না। যাহা আছে তাহা বর্জ্জন করিয়া নূতনের আমদানি করা আমেরিকানের ধাতে সহিবে না। তাহারা নিজে এক সময়ে বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং সেই সময়কার বীরত্বের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়া আজিও তাহারা গৌরব অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু অন্য দেশের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বন্ধন মোচনের চেষ্টাকে ইহারা কখনই সুনজরে দেখিতে চাহে না।

(৩)

হাঙ্গারী হইতে জনৈক ভদ্রলোক পাঞ্জাবে তাঁর বন্ধুকে যে পত্র দিয়াছেন তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

আমি আশা করি যে প্রাচী সমস্ত পৃথিবীতে একটি নব-চেতনার স্পন্দনে তরঙ্গিত করিবে। টলষ্টয় কেবলমাত্র আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার দোষ দেখাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের নবযুগের মহাপুরুষ, তিনিই আমাদের সম্মুখে নব সভ্যতার আলোক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। Jesus এর পূর্ব্বে John the Baptest এর ন্যায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে টলষ্টয় আমাদিগকে নব জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন ইহা আমি স্বীকার করি।

এই দুই মহাপুরুষের রচিত "What is art" নামক দুইটি রচনায় ইঁহাদের মতের পার্থক্য ধরা পড়িয়াছে। টলষ্টয় কোনটা art নয় তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমস্ত art এর মর্ম্মগত সত্যটি তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "Personality" পুস্তকখানি তোমার নিকট হইতে পাইয়া তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন ব্রহ্ম-জ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছেন; তিনিই আমাদিগকে মোহান্ধকার হইতে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন। আমি এখানে তাঁহার শিক্ষাপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছি। যদি তাঁহার নিকট যাইতে পারিতাম তবে কি আনন্দ হইত! একই কালে একজন মহাপুরুষের সঙ্গে বাস করিয়াও তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইতে বঞ্চিত হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে!

(৪)

গুরুদেব গতবার যখন লণ্ডনে ছিলেন, তখন Millais house এর বিখ্যাত ফটোগ্রাফার Hoppe তাঁহার যে ফটো তুলিয়াছিলেন তাহার প্রশংসা এখন পর্য্যন্তও শোনা যায়। এই ছবি সম্প্রতি লণ্ডনের এক প্রদর্শনীতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া Daily Graphic লিখিতেছে:—

চিক্কণ রজত-শুভ্র শ্মশ্রু এই যে রবীন্দ্রনাথ, ইঁনি এখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনকার শতসহস্র নরনারীর হৃদয়ে তাঁহার পূজার দীপ প্রদীপ্ত রহিয়াছে। তিনি হৃদয়ের রাজা, তাঁহার গতি তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ রাজোচিত।

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ | চৈত্র, সন ১৩২৮ সাল। | ৩য় সংখ্যা

## বুধবার

২৫শে শ্রাবণ ১৩২৮

আজ প্রভাতে যখন ক্ষণকালের জন্য মেঘের আবরণ উন্মুক্ত হয়ে গেল তখন অতি সহজে উপর থেকে সুন্দরের বাণী এসে পৌঁছল, নির্ম্মলতায় আকাশ ভরে গেল। অসীমের আনন্দস্বরূপ ধরণীর হৃদয়ের মাঝখানটিতে প্রকাশ হল, প্রসন্নতায় চারদিক ঝলমল করতে লাগ্ল।

যুগে যুগে প্রতিদিন বসুন্ধরা এই শান্তি ধারায় স্নান করে' আপন আনন্দময় প্রণামটিকে উপরের দিকে তুলে ধরেচে। এত সহজে আমাদের এই ছোট গ্রহটির উপরে অসীমের আনন্দ পরিব্যক্ত হল কি করে? একেবারেই হয় নি; আবরণ ছিল, বাধা ছিল, সে সমস্ত ক্রমে ক্রমে সরে গিয়েচে, কুঁড়ির বন্ধন খুলে গিয়েচে, তবেই সৌন্দর্য্যের পুষ্প আলোকের মধ্যে আপনাকে বিকশিত করেচে।

এই তপস্বিনী ধরণীর দুটি প্রকাশের ধারা আমরা দেখ্তে পাই, একটি আছে যে দিকে তার বন্ধন, আরেকটি, যে দিকে তার মুক্তি। একদিকে সে আপনার বস্তুপুঞ্জকে বাঁধচে, সংহত করচে, ভাগ করচে, নানা আকারে তাকে গুছিয়ে সাজিয়ে নিচ্চে। এই দিকে সে যেন আপনার সঞ্চয়কে এঁটে বেঁধে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখচে— এইখানে তার জল মাটি পাথর ও ধাতুদ্রব্যের পিণ্ড; বিষম তার ভার, প্রকাণ্ড তার হিসাবের অঙ্ক। এই খানে সে বিষয়ী।

কিন্তু তার আর একটা দিক আছে-সেই দিকে সে খোলা। সেটা হচ্চে তার বায়ুমণ্ডল। সেখানে অনন্ত আকাশের সঙ্গে তার যোগ, সেই খানে প্রাণের অনন্ত সমীরণ বহমান, সেইখানে জ্যোতির্লোকের আনাগোনার পথ, সেইখানে নক্ষত্রমণ্ডলীর সঙ্গে তার আত্মীয়তা, সেই খানে কোটি যোজন ক্রোশ দূর হতে আলোক দূতের হাতে তার তত্ত্ব আসে।

কিন্তু এ ত একদিনে হয় নি। এমন এক সময় ছিল যখন বিষবাষ্পের পরিবেষ্টনে সে ঘনভাবে আবৃত হয়ে ছিল।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে এই বাষ্পের নাম কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস। এই [illegible]গ্যাসের উপরিতলে মেঘস্তর অতি নিবিড় হয়ে ভাসমান [illegible]। মেঘবাষ্পের অবরোধের মধ্যে তপ্ত বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড ঝড়ের উৎপাত নিরন্তর চলেছিল। সেই বিপুল কৃষ্ণ আবরণ ভেদ করে সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারত না।

কিন্তু কালে কালে পৃথিবী স্তরে স্তরে সেই আবরণ মোচন করেচে। আজ বায়ুমণ্ডল তার পক্ষে মুক্তির বেষ্টন। এইখানে মুক্ত অবগুণ্ঠনে সূর্য্যের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হল। এইখানে সূর্য্যালোকে বর্ণবিকাশের লীলানিকেতন। এই খানেই সুন্দরের সঙ্গে তার মালা-বদল। এই খানেই মুক্তির হাওয়া বয়ে গেল, বেঁচে গেল সব জীবজন্তুরা, পৃথিবীর হৃদয় মাধুর্য্যে ভরে উঠল।

পৃথিবীর মধ্যে এই যে ইতিহাস দেখি এর মধ্যে মানুষের সাধনার প্রতিরূপ দেখ্‌তে পাই। তার একটা দিকে বস্তু-সঞ্চয়, বিষয়-সম্পত্তি, ধন-ভাণ্ডার। এইখানে সে নিজের সংগ্রহকে নিজের চারিদিকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে আপনাকে কঠিন পিণ্ডাকার করে তুলচে। এই দিকেই তার ঈর্ষ্যা, ভাব বিদ্বেষ, অন্যের প্রতি তার সন্দেহ। কত লোক দেখ্‌তে পাই যার এই দিকটাই নিত্য প্রকাশমান, অন্য দিকটা নেই বল্লেই হয়। শুনেচি চন্দ্র মৃতগ্রহ, তার বায়ু-মণ্ডল নেই, একদিকে তার চির নিবিড় অন্ধকার, অন্য দিকে চির প্রখর উত্তাপ। যারা ঘোর বিষয়ী তাদের এই দশা। লাভ ক্ষতির সুতীব্রতায় তাদের জীবন বিভক্ত। সুখও তাদের মারে, দুঃখও তাদের মারে। তাদের বস্তু আছে হাওয়া নেই, সঞ্চয়ের পিণ্ড আছে, বিকীরণের প্রবাহ নেই। সঞ্চয়ের সাধনা হচ্চে মৃত্যুর সাধনা, মুক্তির সাধনা হচ্চে অমৃতের সাধনা। এরা সেই অমৃতকে জান্‌লই না, মান্‌লই না।

কিন্তু যে মানুষ আপনার চারদিকটিকে ঘিরে মুক্তির হাওয়া বইয়ে রাখ্‌তে পারে তার অন্তরে জ্যোতির্লোকের বাণী এসে পৌঁছিয়ে তার জীবনকে সফল করে তোলে। অনন্তের সঙ্গে তার মিলনের পথ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকেনা; তার চিন্তায় এবং কর্ম্মে সৌন্দর্য্য ও শান্তি বিকীর্ণ হতে থাকে। কেবলমাত্র মর্ত্ত্যলোকের সম্বন্ধবন্ধনে সে আবদ্ধ থাকেনা; অমৃতলোকের দিকে তার সম্বন্ধ প্রসারিত হয়। বিষয়ের যে পিণ্ড, যেটা তার "আমির" চারিদিকে আকৃষ্ট সেটা যে লুপ্ত হয়ে যাবে তা নয়। অর্থাৎ যেটা তার বিশেষত্বের রূপ সেটাকে তুচ্ছ মনে করা ভুল—কিন্তু এই বিশেষত্ব নিরর্থক হবে যদি এরই মধ্যে অসীমের প্রকাশ না থাকে। যে আলোকের দ্বারা তাকে পূর্ণ করে জানা যায়, যাতে তাকে নিজের বাহিরের সঙ্গে নিখিলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বুঝতে পারি সেই আলোককে প্রত্যাখ্যান করলেই সে মিথ্যা একটা বোঝা মাত্র হয়ে ওঠে। ঘন আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর উপর আলোক এসে পৌছল, এতেই তার প্রাণ, তার আনন্দ, তার প্রকাশ। আলোক এল কোন্ পথে? পৃথিবীর মুক্তির পথে, স্বচ্ছ আকাশের ভিতর দিয়ে, খোলা হাওয়ার উপর দিয়ে। মানুষের জীবনের উপর তেমনি করেই আলো আসা চাই—তবেই তার অমৃতরূপ দীপ্যমান হয়ে প্রকাশ পাবে। সেই আলো আসবে মুক্তির পথ দিয়ে—যে পথ অনাবৃত, অবারিত, যে পথে বিষয়ের বাধা অপসারিত,—এই মুক্তির বায়ুমণ্ডলে তার ধ্যানের বিস্তার, এইখানে তার যোগের প্রকাশ। আপনার নিবিড় সংসারের চারদিকে এই মুক্তির পরিবেষ্টনকে বাধামুক্ত করে, নির্ম্মল করে সর্ব্বদাই এ'কে রক্ষা করে চলা মানুষের সাধনা। এই সাধনার দ্বারাই তার সীমার সংসার অসীমের নিরন্তর স্পর্শলাভ করে এবং সত্যলোকে ধ্রুব হয়ে ওঠে।

---

# আলোচনা

## মোলিয়্যারের ত্রৈশতাব্দিক উৎসব।

গত ফাল্গুন সংখ্যায় শান্তিনিকেতনের এই উৎসবের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে আচার্য্য শ্রীযুক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

আমি মোলিয়ারের বিষয়ে একরকম অনভিজ্ঞ, তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান, তা দাদার বাংলা অনুবাদ ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে হয়েচে ; আর বোধ হয় মোলিয়ারের ইংরাজী অনুবাদও কিছু কিছু পড়েচি। সাহিত্যের কোনো ভাল রচনা ভাষান্তরিত হলে তা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, সেই অনুবাদে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। অনুবাদের ভিতরে দিয়ে লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না এবং সে পরিচয়কে অবলম্বন করে সমালোচনা করাও কঠিন। আমাদের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক মরিস সাহেব স্বয়ং মাদাম লেভির কাছে মূল মোলিয়ার পড়চেন সুতরাং এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর বক্তৃতায় আমরা নাট্যকার সম্বন্ধে অনেক পরিচয় লাভ করেচি। আজ আমি সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলব।

মরিস সাহেবের বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেচেন যে মোলিয়ার সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ কেউ কেউ করেন যে, তিনি যে সকল পাত্রের চরিত্র চিত্রিত করেচেন, অতিশয়োক্তির দ্বারা, স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করে তাদের দেখানো হয়েচে। এই উক্তির প্রতিবাদ বা সমর্থন করা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এই বাদানুবাদ সম্বন্ধে আমি মোটামুটি কিছু বলতে পারি।

শিল্পী একটা বিশেষ প্ল্যানকে নির্ব্বাচন করে তাঁর কাজ করেন। তিনি যা গড়ে তুলবেন তার সমগ্রতার রূপ তাঁর মনে আছে, তাকে জাগিয়ে তোলবার জন্য তিনি বহির্জগতের থেকে সব জিনিষকে অবিকল গ্রহণ করে একত্র সংগ্রহ করেন না। তিনি কতক ত্যাগ করেন, কতক গ্রহণ করেন—তাদের নিয়ে এমন সংলগ্ন সঙ্গত একটা চিত্র সৃষ্টি করেন, যা তাঁর মনের পরিকল্পনার অনুরূপ। বাইরে যা দেখচি তার প্রতিলিপি তৈরী করলে তা যথার্থ আর্ট বলে গণ্য হয় না। সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি 'ম্যাকবেথ' বা 'হ্যামলেট' এর বর্ণিত ঘটনা বাইরের বিশ্বে কখনো এত বেশি সুসংলগ্ন ও নিবিড়ভাবে ঘটে না। শোক দুঃখ, চিত্তের আবেগ, চিত্তদাহ, এমন উজ্জ্বলভাবে তিনি চিত্রিত করেচেন যে বাস্তব জগতে তা এমন করে প্রকাশ পায় না। কারণ প্রকৃতিতে ছেদ আছে—শোকদুঃখ অমন সংহতভাবে দেখা দেয় না। সংসারে চলতে ফিরতে, নানা প্রকার আলাপআলোচনা, ছোটবড় নানাবিধ কাজকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই শোকদুঃখ বিস্তৃত হয়ে যায় বলে তার তীব্রতা চোখে পড়ে না। কিন্তু কবি তাদের এমন সুব্যক্ত সুদৃঢ় করে তাঁর ট্র্যাজেডি লেখেন যে সমস্ত উপাদান আমাদের সামনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘনীভূত হ'য়ে দেখা দেয়। রাজা লীয়ার ঝড়ের মধ্যে গিয়ে বিদূষকের সঙ্গে যে রকমভাবে বাক্যালাপ করলেন, পাগলেও তেমন করে না। এই যে এখানে বাস্তবজগতের হিসাবে অতিশয়তা প্রকাশ হয়েচে, এটা কাব্যজগতের পক্ষে অতিশয় হয় নি। অতএব কাব্যে কোন্ অতিশয়োক্তি সত্য ও কোন্‌টা অসত্য তার একটা আদর্শ আমাদের মনে থাকা চাই। একটা বাহ্যিক প্রাসঙ্গিক ও আকস্মিক ব্যাপারকে যদি বেশি প্রাধান্য দান করা হয় তবে সাহিত্যে তা সয় না। যেমন একজন পাত্রের খুঁড়িয়ে হাঁটা যদি রঙ্গমঞ্চে দেখানো যায় তবে তাতে লোককে হাসানো যেতে পারে কিন্তু এতে কোনো নিত্য সত্যকে প্রকাশ করা হয় না। এরকম বাড়াবাড়িকে trick বা কৌশল বলা যেতে পারে কিন্তু তাতে কোনো পাত্রের চরিত্রের কোনো সত্য উপাদান দেখানো হয় না।

শিশু মন এমন করে ভাবে, বিশ্বকে এমন করে দেখে যে তার মধ্যে আমরা অসঙ্গতি দেখতে পাই, আমাদের হাসি পায়। এই অদ্ভুত অসংলগ্নতাই শিশুস্বভাবের চিরন্তন লক্ষণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণে এই শিশু আছে—আমাদের সমস্ত চিন্তা সমস্ত আচরণই যুক্তিসঙ্গত নয়। এই অসঙ্গতি এই অযৌক্তিকতা যেখানে মানবচরিত্রের কোনো একটি ব্যাপক পরিচয় দেয় সেইখানেই সে হাস্যরসের বড় রকমের উপাদান যোগায়। আর যেখানে সে নিতান্ত অগভীর, যেখানে সে মানবচরিত্রের

একটা অবান্তর বিষয় মাত্র, সেখানে সেটাতে কেবল ভাঁড়ামি প্রকাশ করা যায়।

মোলিয়ারের বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে একথাই বলতে পারি যে তিনি যে খ্যাতি লাভ করেচেন শুধু ভাঁড়ামি করলে সেই পরিমাণ খ্যাতি পাওয়া যায় না। কোনো পাত্রের তোৎলামিতে লোকে হেসে অস্থির হতে পারে কিন্তু তাতে যথার্থ সাহিত্যরসনৈপুণ্যের যশ লাভ করা যায় না। প্রতি পাত্রের গভীর প্রকৃতিতে এমন একটা হাসি বা কান্নার দিক আছে যাকে স্থায়ী প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে সে ম্লান হয় না। যা আকস্মিক তাকে অত্যুক্তির দ্বারা উৎকটভাবে প্রকাশ করলে যে ক্ষণিকভাবে আপাত ফল ফলে না তা নয়—এতে লোককে হাসানো আর কাঁদানো যেতে পারে। তার দৃষ্টান্ত, আমাদের দেশে বক্তৃতাতে 'মা' শব্দ বারংবার ব্যবহার করলে শ্রোতার চোখে জল আনা খুবই সহজ কেননা বাঙালী সন্তান হচ্চে মায়ের আদরে সন্তান; এবং নাটকে নভেলে সতীত্বের অত্যুক্তিপূর্ণ চিত্র আঁকলেও পাঠকের মনকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়া যায়, কেননা বাঙালী স্বামীর প্রধান গৌরব হচ্চে স্ত্রীর কাছে পূজা আদায় করে'। এই মনের অভ্যাসের অনুবর্ত্তনে লোককে উত্তেজিত করা খুব সহজ ব্যাপার কিন্তু সেটা নিত্য সাহিত্যের যোগ্য বিষয় নয়। স্থানিক সাময়িক কোনো বিশেষ হৃদয়গত অভ্যাসকে আঘাত করে' যে একটা সস্তারকমের হৃদয়াবেগ উৎপন্ন করা যায় কোনো বড় শক্তিশালী লেখক সেই সব খেলো জিনিষ নিয়ে কখনো সাহিত্যসৃষ্টি করেন না।

মোলিয়ারের "লা বুর্জোয়া জঁতিয়ম" নামক নাটকের অনুবাদ "হঠাৎ নবাব" টাই ধরা যাক্। অকস্মাৎ কেউ অনেক টাকা পেলে তার কেমন মনের বিকার হয় এটাই এর মূল কথা নয়। কিন্তু এতে দেখানো হয়েচে যে একজন 'হঠাৎ নবাব' ধনীব্যক্তির চালচলন লক্ষ্য করে' তার অনুকরণের যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করে সেটা কি জিনিষ। সেই অনুকরণের চেষ্টা মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার—সে একজন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিকৃতি নয়। তাই এই অনুকরণ প্রায়ই অসঙ্গত আকার ধারণ করে, তাই মানুষের পক্ষে এ একটা চিরকেলে হাস্যরসের বিষয়। সকল দেশেই সকল কালেই এই হাস্যরসের উপাদান মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়।—অন্তরের মধ্যে যে জিনিষটাকে পাওয়া যায় নি, বাইরের উপকরণ দিয়ে সেইটেকে কৃত্রিমভাবে খাড়া করে' লোককে ভোলাবার অপরিমিত প্রয়াস আমরা নানা জায়গায় নানা প্রকারেই দেখে থাকি—আর তাই নিয়ে হাসাহাসি চলে।

"হঠাৎ নবাব" নাটকটাকে এই হিসাবে অত্যুক্তিপূর্ণ বলা যেতে পারে, যে তাতে অল্প পরিসরে অনেকখানি হাসির উপাদান ঘনীভূত করে' দেখানো হয়েচে। পূর্ব্বেই বলেচি বাস্তব সংসারে এই সকল হাস্যকর ব্যাপার বিরল বিকীর্ণ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়। মোলিয়ার তাকেই বেছে নিয়ে নিবিড় করে' সাজিয়ে তুলেছেন। এই সাজিয়ে গড়ে তোলাতেই শিল্পীর বাহাদুরী। করুণ রসকে ব্যক্ত করতে হলেও শিল্পীকে এমনি ঘণীভূত চিত্র আঁকতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রে বিচার করে দেখা দরকার যে যা আকস্মিক, যা উপরে উপরে ভাসচে, তাকে অবলম্বন করা হয়েচে, না, স্বভাবের গভীরতর লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করা হয়েচে।

## রুশের বর্ত্তমান অবস্থা।

গত পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনে মাদাম ভ মজিয়ালি নামক একটি রুশীয় মহিলা আসিয়াছিলেন, মাঘ সংখ্যায় তাঁহার সংবাদ দিয়াছি। তিনি রুশীয় হইলেও গত কয়েক বৎসর হইতে ফ্রান্সেই অবস্থান করিতেছেন। গত ২রা জানুয়ারী কলাভবনে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিয়ে প্রকাশিত হইল :—

ভৌগোলিক অবস্থানে ও মানস প্রকৃতিতে রুশ পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনসেতু স্বরূপ, এবং বিশ্বমানবতার অভিব্যক্তিতে রুশেরও একটি বিশেষ স্থান আছে। রুশের লোকেদের মধ্যে চিত্তের যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাহার কারণ এই যে

রুশচিত্তে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তার একত্র সমাবেশ হইয়াছে। রুশীয়রা যেমন বহির্জগতে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, তেমনি অন্তরের গভীর লোকেও প্রবেশ করিতে জানে। সে জীবনের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও যেন তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন।

মস্কো সহরটি রুশের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। মস্কোবাসীদের এই প্রদেশটুকুর জন্য একটি বিশেষ মমতা আছে। এখানকার শিক্ষাদীক্ষা গণতন্ত্রমূলক। এখানকার ব্যবসায়িশ্রেণীই দেশভক্তিতে অগ্রণী, তাহারা ধনী হইলেও সাহিত্যে ও শিল্পে অনুরাগী এবং তজ্জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিয়া থাকে। এখানে বলশেভিকদের আধিপত্য নাই। শিক্ষার জন্য রুশীয়দের খুব আগ্রহ, সকল শ্রেনীর ছাত্রছাত্রী দলে দলে এই সহরে থাকিয়া পড়াশুনা করে এবং বিদ্যালাভের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে।

রুশীয়েরা রঙ্গমঞ্চের বিশেষ পক্ষপাতী। ভাল নাটকের অভিনয় দেখিতে রুশীয় যুবকদের অসামান্য আগ্রহ আছে। নাট্যকলা ও শিল্পকলার মধ্য দিয়া সকল শ্রেণীর লোক তাহাদের মনের ক্ষুধা মিটাইয়া থাকে। রুশনাট্য অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ।

রুশীয়দের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব যে, তাহারা সকল কর্মে নিষ্ঠাবান্ এবং তাহাদের প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস আছে। এবিষয়ে ভারতবাসীদের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এই সাদৃশ্যের কারণ কি? ভারতবর্ষ ও রুশ উভয় প্রদেশেই দিগন্তপ্রসারিত সমতল প্রান্তর আছে। ভারতবর্ষের রৌদ্রদাহ প্রখর, রুশের সূর্য্য উত্তাপহীন। দারুণ উষ্ণতা ও শৈত্যের জন্য উভয় দেশবাসীকেই বৃক্ষমূলে অথবা গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে হয়। এইরূপে দিন যাপন করা ধ্যান ধারণার পক্ষে অনুকূল। ইতালী ও ফ্রান্সের লোকেরা বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে সুতরাং তাহাদের মনঃস্থির করিবার অবসর হয় না। রুশীয়েরা দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে এবং সকল দেশের সাধুসন্ন্যাসীদের ভক্তি করে। তাহারাও তীর্থযাত্রায় বাহির হয় এবং এদেশের মত মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া দেবতাকে প্রণাম করে। সেখানেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা বর্ত্তমান। রুশের ধর্ম্মমত খুব উদার, রুশ ইতিহাসে ধর্ম্মের জন্য কখনো যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই। রুশে তাতার, মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান, সকল ধর্ম্মাবলম্বীই স্বাধীনভাবে বাস করিতেছে। রুশীয়দের মহাকাব্য হইতে প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়।

রুশীয় আধিভৌতিক জগতের সহিত আপন চিত্তের যোগ স্থাপিত করিতে শেখে নাই। সে বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে উদাসীন। এই মায়াময় জগৎ হইতে মুক্তিলাভ করা তাহার ধর্ম্মের লক্ষ্য। তাহার মনে কোনো ভাবই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সে ক্রমাগতই তাহার মত ও বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করে।

টলষ্টয়ের জীবন ব্যাকুলতায় পূর্ণ ছিল। তিনি ধনী হইলেও সংসার হইতে দূরে নির্জ্জনবাসের ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু স্ত্রীর জন্য তাহা পারেন নাই। তাঁহার শেষ জীবনের রোজনামচাতে মানবাত্মার অতি করুণ ও বিষাদপূর্ণ কাহিনী বিবৃত আছে। তিনি ভগবানের জন্য ব্যাকুল ছিলেন কিন্তু কোন্ পথে চলিলে শান্তি মিলিবে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। জীবনের সঙ্গে তিনি কোনোরকম বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারেন নাই।

রুশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা কঠিন কারণ আমি বহুদিন হইতে ফ্রান্সে আছি। দারিদ্র্যের পীড়ন ও অরাজকতা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য যে সকল রুশীয় ফ্রান্সে পলাইয়া আসে তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। সেখান হইতে কোনো পুস্তক বা সংবাদপত্র আমাদের হাতে আসিবার উপায় নাই কারণ যাহা পাওয়া যায় তাহা কেবল বলশেভিকদের কাগজ পত্র। বন্ধুদের চিঠিও সেন্সরের হাত দিয়া আসে বলিয়া আমরা ঠিক খবর পাই না। পেট্রোগ্রাডের সংস্কৃতাধ্যাপক, আমার জনৈক বন্ধু, আমাকে লিখিয়াছেন, 'আমি দেশের এই দুর্দ্দিনে এখান হইতে নড়িব না। রুশদেশ পলাতকদের চায় না, যাহারা এখানেই বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিবে তাহারই দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবে।' এইরূপে

সেখানে দৃঢ় সংকল্প ও নবযুগের আশার বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া একদল লোক জীবন যাপন করিতেছে। রুশের জনসাধারণ তাহাদের দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও কোনো আধ্যাত্মিক নেতার আবির্ভাবের জন্য পথ চাহিয়া আছে। রাজনৈতিকদের আশ্বাসবাণীতে তাহাদের বড় বেশী আস্থা নাই।

রুশে এখন কাগজের টাকার প্রচলন, কিন্তু তাহার মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ৮০,০০০ রুব্‌লে একটি নেপকিন্ (ছোট গামছা,) পাওয়া যায়। আমার পরিচিত এক ব্যক্তি কয়েকটি পুরাতন পোষাক বিক্রয় করিয়া নয় লক্ষ রুবল সংগ্রহ করিয়াছিল। সেই অর্থে সে ঘুষ দিয়া রুশ হইতে গোপনে পলাইয়া আসিয়াছে। ধনী অপেক্ষা চাষী প্রজারাই বলশেভিকবাদের ঘোর বিরোধী। বাস্তুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারা এই সকল হাঙ্গামায় যাইতে নারাজ। মস্কোতে এখন দোকানে কেনাবেচা হয় না, যতটুকু হয় তাহা গোপনে, কর্তৃপক্ষের অগোচরে। আপনি যদি দাঁত তোলাইতে চান বা বই কিনিতে চান তো আট ঘণ্টা পরিশ্রম করুন, তবেই তাহার বিনিময়ে উক্ত কোনো একটি ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। রুশীয়েরা টাকা উঠাইয়া দিতে চাহে, কিন্তু দেখা যাইতেছে তাহা একেবারেই অসম্ভব।

---

# মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে'
যেদিন হাওয়া উঠ্‌ত ক্ষেপে'
ফাগুন বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগ্‌ত পুলক কি মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হ'ত কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে ;

তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে'-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল ক্ষেতে
সূর্য্য-ওঠার রাঙা-রঙীন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠ্‌ত দুলে'
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়
সেদিন আমার হ'ত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবী ;
তাইত হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবী!

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে'
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে জননীর কোলের পরে
জন্মেছিলি মর্ত্ত্যঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হ'তে তোরে
কে এনেচে হরণ করে',
ঘিরে তোরে রাখে নানান্ পাকে।
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাইত ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
"গেছিস্ দূরে, অনেক দূরে,"
কি যেন তাই চোখের পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভাল করে' পাইনি তাহা বুঝে ;
ফিরেছি তাই নানামতে
নানান্ হাটে, নানান্ পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার আঙন মাঝে
প্রভাত রবির শঙ্খ বাজে,
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্তমনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
হেথা হ'তে গেলেম দূরে
কোথা যে ইঁট-কাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্ব্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই ত মেশা,

আবর্জ্জনা জমে উপার্জ্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরাণ কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলক-ধাঁদায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে,
পথ বেড়ে' যায় ঘুরে' ঘুরে',
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে' যাই মুক্তি সুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে' দিই টুটে',
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েচেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না রইল ব্যবধান।
যে দূতগুলি গগন পারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েচে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কি ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা' নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে
চারদিকে এই যে-ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন ॥*

২৩শে ফাল্গুন
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# ভারতবর্ষের প্রভাব।

( আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয়ের "বিশ্বভারতী"তে ১৭ই নভেম্বর ১৯২১, তারিখে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। )

আজকের দিনে এদেশের অনেকে যে কথা বলে থাকেন, ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখলে মনে হয় সে কথা যেন সত্য— তার চার দিক অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সমুদ্রের বেড়া দিয়ে ঘেরা, যেন সে সব থেকে বিচ্ছিন্ন, কারও কাছে কিছু পায় নি, নিজেই নিজের সভ্যতা একলা গড়ে তুলেছে। কিন্তু এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নেই। পুরাতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে চতুর্দ্দিকের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে যোগ হয়েছিল, পৃথিবীর আর কোনও দেশের সঙ্গে তা হয় নি।

আরবদেশের উত্তরে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার ভূখণ্ডে এসিরিয়ার কাছে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে 'মিত্তান' নামে একটি প্রবল রাজ্য ছিল—এখানে ১৫০০খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের একটি প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে—এটি হিটাইট ও মিত্তানি রাজ্যের একটি সন্ধিপত্র; সন্ধির অন্যান্য কথার মধ্যে দুই রাজার একজনের পুত্রের সহিত অন্য রাজার কন্যার বিবাহের কথা আছে। এই সন্ধিলিপির শেষে যে সব ব্যাবিলোনীয়র দেবদেবীর দীর্ঘ তালিকা আছে তার মধ্যে আমাদের আর্য্য

---

* এই কবিতা বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'চাষা' নামক হস্তলিখিত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেবতা মিত্র বরুণ ইন্দ্র প্রভৃতির নাম, আমরা বেদে যে পর্য্যায়ে পেয়ে থাকি, সেই পর্য্যায়ে উল্লেখ আছে। মিত্র বরুণ এখানেও বহু-বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত ["না-সত্য-অন্-ন" (Na-Sa-at-ia--an-na দেবতা হয় ত অশ্বিনী কুমার দ্বয়।)]

মিতানি-রাজ্যের কতকগুলি রাজা ও নদীর নাম প্রাচীন এসিরিয় কিউনিফরম অক্ষরে পাওয়া গেছে সংস্কৃত এবং ইরানিয়ন ভাষার সঙ্গে তার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

নদী—Naharain ( নারায়ণ ? )

রাজাদের নাম artatama
Shutarna
Sa-us-Sa-tar
Du-Sh-ratta
Saush-Shatar (Kshatra ?)

খুব প্রাচীন কালে হিতাইতরা প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ছিল, প্রধাণত এদের সংঘর্ষে এসেই ঈজিপ্ট সাম্রাজ্য খণ্ড২ হয়ে যায়। এব্র হিম এঁদের কাছে জমি নিয়েছিলেন প্রাচীন হিব্রুলেখায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিছু দিন থেকে এদের সম্বন্ধে যে পর্য্যালোচনা হচ্ছে, তাতে কোনকোনও ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেছেন এরা আর্য্য জাতি। এখানকার ইষ্টক লিপিতে আর্য্য ভাষার কিছু কিছু অংশ যে পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই—কিন্তু তথাপি হিতাইতরা যে ইণ্ডো-ইয়োরোপিয়ান এমন কথা অধ্যাপক মহাশয় মনে করেন না।

Cunieform হরফের—কতকগুলি ভাবের ব্যঞ্জনার দ্বারা কথাকে প্রকাশ করা হয়েছে, অন্যগুলো শাব্দিক। খৃষ্টের জন্মের দুহাজার বছর কিম্বা তারও পূর্ব্বে ব্যাবিলোনিয়নদের নিকট থেকে হিতাইতরা কিউনিফরম শিক্ষা করেছিল। এ থেকে তারা চিত্রিত চিহ্নের সাহায্যে মনের মধ্যে এক একটা ধ্বনি-কে জাগিয়ে ছোট ছোট চিত্রপদাংশ জুড়ে জুড়ে লেখার একটা প্রণালী উদ্ভাবন করেছিল। এসিয়া মাইনরে ইতিহাস উদ্ধারের জন্য খনিত খাদের মধ্যে লিখিত ইষ্টক-লিপিতে যে সব অভিধানের সাহায্যে হিতাইতরা কিউনিফরমে অক্ষর লিখতে ও বানান করতে শিখত, তার ভগ্নাংশ কিছু কিছু পাওয়া গেছে। একজন অষ্ট্রীয়ান পণ্ডিত Hrozny, হিতাইতদের কিউনিফরম লেখার পাঠোদ্ধার সম্প্রতি করতে পেরেছেন। এ সম্বন্ধে এখন অনেক আলোচনা চলছে—এ আলোচনা সম্পূর্ণ হলে খুব বড় একটা কিছু আমরা পাব, আশা করা যেতে পারে।

---

## আশ্রম-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অপূর্ব্বানন্দ রায় চার বৎসর আশ্রমে বাস ক'রয়া ষোল বৎসর বয়সে গত ৭ই ফাল্গুন রবিবার টাইফয়েড রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। আশ্রমের নানা অনুষ্ঠানের সহিত সে যুক্ত ছিল—এবৎসর সে আশ্রমসম্মিলনীর ছাত্রপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই তরুণ বয়সে তাহার এ আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি।

হলাণ্ডের মিসেস ভ্যান ঈগেন মাসাধিক কাল আশ্রমে বাস করিয়া গত ২০শে ফাল্গুন স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। বিদায়ের পূর্ব্বে একদিন তাঁহার গৃহে বন্ধুবান্ধবদের সান্ধ্য সম্মিলনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতবিভাগের যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা তাঁহার কাছে যে কয়েকটি ইয়োরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন এই সভায় তাহা তাঁহার সহিত গান করিয়া শোনান। পূজনীয় গুরুদেব "মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন দিনের স্রোতে" গানটি গাহিয়াছিলেন। বীণকর মহাশয়ের বীণার ঝঙ্কারে সে দিন সন্ধ্যা ভরিয়া উঠিয়াছিল। ইহার তিন দিন পরে প্রাঙ্গণে আর একটি সঙ্গীত-সভা হয়। বীণকর মহাশয় সেদিন বেহালা বাজাইয়াছিলেন, ছেলেদের ও মেয়েদের কয়েকটি গানের পর মিসেস ভ্যান

ডীগের 'ডাচ' ভাষায় গান করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, "আমি যে গানটি গাহিলাম তাহা সমুদ্রের গান। হল্যাণ্ড সমুদ্র বেষ্টিত—সমুদ্রের অসীমতা ভগবানের আরাধনা মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলে। এখানকার এই উদার বিস্তীর্ণ প্রান্তরেও সমুদ্রের সেই ভাবটি আছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ, অজস্র আলোক, মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে লইয়া যায়। আপনাদের প্রীতি এবং আতিথ্য আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। আশ্রমের সকল কাজ জয়যুক্ত হউক এই কামনা করিয়া আমি আপনাদের সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।"

দীর্ঘকাল আশ্রম হইতে দূরে থাকিয়া গত ৬ই ফাল্গুন এণ্ড্রুজ সাহেব আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। গত ৮ই ফাল্গুন তিনি মালাবার দেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আশ্রমবাসী সকলের নিকট বিবৃত করেন। তার পর দিনই, ই, আই, রেলওয়ে ধর্ম্মঘট মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাকে এলাহাবাদে যাইতে হইয়াছে।

সুরুলের কৃষি বিদ্যালয়। ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতে শ্রীযুক্ত এল্ কে এলম্‌হার্ষ্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সুরুলে কৃষি বিদ্যালয়ের কাজ নিয়মিত ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ এলম্‌হার্ষ্ট তাঁহার স্বাভাবিক উৎসাহ এবং উদ্যম ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন। সুরুলে যাইবার পূর্ব্বে এলম্‌হার্ষ্ট সাহেব কৃষি ছাত্রদিগকে সিউড়ি এবং হেতমপুরের কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। ছাত্রেরা তন্নতন্ন করিয়া সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছে, নানা বিশেষজ্ঞের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগও তাহারা এই সূত্রে পাইয়াছিল। আশেপাশের গ্রামের অবস্থাও তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছেন। এখন নিকটবর্ত্তী সুরুল প্রভৃতি গ্রামকে আশ্রয় করিয়া সকলের সহিত মিলিয়া কৃষি ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ চিন্তা করিতেছেন। শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় সুরুলের কাজে যোগ দিয়াছেন। তিনি সুরুল গ্রামের অনাদৃত বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছেন এবং ইতিমধ্যে আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছেন।

গত ৯ই ফাল্গুন মিঃ এলমহার্ষ্ট "ভূমিলক্ষ্মীর বিত্ত অপহরণ" সম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় বক্তৃতা করেন।—মানুষ ভূমির বিত্ত লইয়া নিজের দেহ পরিপুষ্ট করিতেছে, তাহার আহার বল, বিলাস বল, সবই এই ভূমির ঐশ্বর্য্য হইতে। কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য অসীম নহে; ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মূলধনের উপর কেবলই চেক কাটিতে থাকিলে এমন দিন আসেই যখন ঐশ্বর্য্যের বেশী কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। প্লাবনের জলের পলি মৃত্তিকা দিয়া বছরের পর বছর প্রকৃতিদেবী নিজে যে সকল স্থলে এই হরণ পূরণের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন সে সকল স্থল ছাড়া অন্য সর্ব্বত্রই ৫০০ বৎসরের মধ্যে মানুষ ভূমিসম্পদকে নষ্ট করিয়া নিজে নষ্ট হইয়াছে—বক্তা নানা ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ঘটনা হইতে তাহা প্রতিপন্ন করেন। এই তথ্যটিকে স্বীকার করিয়া ভূমির হৃত সম্পদকে ফিরাইয়া দিবার কোনো প্রণালী উদ্ভাবন না করিতে পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। বারান্তরে এই বক্তৃতা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হইবে।

বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ বি, এস সি মহাশয় মিঃ এলমহার্ষ্টকে কৃষি বিদ্যালয়ের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সুরুলে গিয়া বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও ছাত্রদিগকে উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়মিত পড়াইতেছেন।

কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত শিলাইদা হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া সুরুলে আছেন। যতীনবাবু গত এক বৎসর গ্রামসংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ছাত্রদিগের সাহিত্য সভার নিয়মিত অধিবেশন হইতেছে। এই মাসে শান্তি, বাগান ও প্রভাত পত্রিকা গুলির জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক পত্রিকার পরিচালকগণ মনোরম করিয়া সাজাইয়া, হেঁয়ালী নাট্য অভিনয় করিয়া, সরবৎ ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া সকলকে যথাসাধ্য আনন্দ দিতে

চেষ্টা করিয়াছেন। পিয়ার্সন সাহেবের উৎসাহে দ্বিতীয় বর্গের ছাত্রগণ একটি ছোট ইংরেজি নাট্য অভিনয় করিয়াছিল।

গুরুদেবের সন্ধ্যার ক্লাশ প্রায় নিয়মিত হইতেছে। বলাকা পাঠ শেষ হইলে লোকসাহিত্যের "ছেলেভুলানো ছড়া" পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

যদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়া একটা তুলনা মূলক আলোচনা করা যায় তাহা হইলে তাহা যে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষনীয় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাজটি কেহ গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মূলগত সামঞ্জস্য অনেকটা ধরা যাইবে।

গুরুদেব সম্প্রতি 'গোরা' পড়িতেছেন। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও হইতেছে। গোরা পাঠ সমাপ্ত হইলে আলোচনার সারাংশ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

গুরুদেব ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাশে বিশ্বভারতীর ছাত্রদিগকে নিয়মিতভাবে আধুনিক কবিদিগের কবিতা পড়াইতেছেন এবং ছোট ছেলেদিগকে মুখে মুখে শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন।

অধ্যাপক লেভি ঢাকা, পাটনা সারনাথ, কাশী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিব্বতী ও চীন ভাষার ক্লাশ পুনরায় খুব উদ্যমের সহিত চলিতেছে।

সম্প্রতি চেকোশ্লাভেকিয়ার অন্তর্গত বোহিমিয়া প্রদেশের প্রাগ্ সহর হইতে মিষ্টার বারোশ্লাফ্ হেফ্ কোফ্স্কি নামে একজন শিল্পী আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও অধিবাসীদের চিত্র আঁকিবার জন্য এ দেশে কিছুকাল অবস্থান করিবেন। ছবির রং ফলানো সম্বন্ধে তিনি বহু বৎসর সাধনার পর কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রচলিত রং দিবার প্রণালী ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক। তাঁহার বর্ণবিন্যাস প্রণালী অনুসারে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের একটি ছায়াচিত্রের প্রতিলিপি তিনি অঙ্কিত করিতেছেন।

## জার্ম্মাণির পত্র

গুরুদেব গত বৎসর গ্রীষ্মকালে বার্লিনে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে Mr. Rathenau এবং তাঁহার ভগ্নী Mrs. Andreae'র সঙ্গে গুরুদেবের আলাপ হয়েছিল। Mr. Rathenau এখন জর্ম্মাণির Foreign Minister। ভ্রাতা এবং ভগ্নী উভয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যে গুরুদেব খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। Mrs. Andreae কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুদেবকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার সারমর্ম দেওয়া গেল:—

যখন বিগত বৎসরের দিকে ফিরে তাকিয়ে লাভ ক্ষতির হিসাব করি; যখন ভাবি কি করব—আমার এই ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে কেমন করে আমার দেশের অন্ধ, বাথিত নরনারীকে বোঝাব যে এই যে সুখ দুঃখ এরই আনন্দবেদনার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই আমরা প্রকৃতপক্ষে মানুষ হয়ে উঠতে পারি—তখন আমার অন্তরাত্মা এই বর্ত্তমান বৎসরের সেই পরম শুভমুহূর্ত্তের দিকে ফিরে চায় যখন আপনি আমাদের গৃহে এসেছিলেন। সে স্মৃতি আমার মনে চিরজাগ্রত হয়ে আছে। এই স্তব্ধ রহস্য-গভীর রাত্রিকালে আমি সেই অপূর্ব্ব বসন্তরজনীর স্বপ্ন দেখছি। আপনি তখন আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন এবং আমাদের সরল ভক্তিনম্র হৃদয় আপনার পায়ের কাছে নত হয়ে পড়েছিল। এখন বর্ষ শেষ হয়ে এলো; এই পীড়িত দেশে নব বৎসর যখন আমাদের দ্বারে অনেক দাবী বহন করে এলো তখন আপনার মাথার দিকে তাকিয়ে আমাদের অন্তর থেকে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে—"হে গুরু, তোমার শান্তি, করুণা নিয়ে এসো; দাও আমাদের তোমার সেই সত্য ও ভূমার প্রতি অটল নির্ভর। তোমার মত আমাদেরও হৃদয় প্রেমে সরস হউক, তোমার অমর আশার বাণী আমাদের শোনাও। অক্ষয় ও চিরন্তন সত্যের বার্ত্তা বহন করে তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াও। বস্তু-জগতের মায়া-বেষ্টন থেকে মুক্তিলাভ করে আমাদের আত্মা 'ভূমার আনন্দলোকে বিচরণ করুক। আমরা সকলেই New Testamentএ পড়েছি 'ভগবান যাকে ভালবাসেন তাকেই আঘাত করেন'—এ সত্য আমরা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বুঝি না। এই দুঃখের ভিতর দিয়ে চির-সার্থকতা, আত্ম উপলব্ধির ভিতর দিয়ে চরম-পরিপূর্ণতা আমরা কেমন করে লাভ করতে পারি সেই শিক্ষা আমরা তোমার কাছ থেকে চাই। আমরা সমস্ত বিরোধের মধ্যে কেমন করে ঐক্যকে লাভ করব তা' তুমি আমাদের বলে দাও। আমাদের ঘরে ঘরে প্রলয় অগ্নি জ্বলে উঠেচে; এই ধ্বংশের মধ্যে, এই রুদ্রালোকে নিত্যসত্যের মঙ্গল প্রকাশকে কেমন করে দেখতে হবে বলে দাও। তোমাকে আমরা চাই; সমস্ত ব্যথিত চিত্তের বেদনায় তোমার হৃদয় কাঁদে, সেই হৃদয়ের স্পর্শ আমরা লাভ করতে চাই।"

# শান্তিনিকেতন পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই আনা। মাঘ মাস হইতে পর বৎসরের পৌষ পর্য্যন্ত "শান্তিনিকেতনের" বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে "শান্তিনিকেতন" প্রকাশিত হয়। কোনও গ্রাহক সময় মত কোন সংখ্যা না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নহিলে হারানো পত্রিকার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৪। বিজ্ঞাপন দাতাগণ প্রতি মাসের ২রা তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন না পাঠাইলে সেই মাসে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন ছাপা হইবে না। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলেও উক্ত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপন দাতাগণের পক্ষে মূল্য অগ্রিম দেয়। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কমিশন দেওয়া হয়।

৬। বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রেরিত ব্লক হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে আমরা দায়ী হইব না।

## বিজ্ঞাপনের হার।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক। | সাধারণ | ১পৃষ্ঠা | মাসিক | | ৬৲ |
| | " | অর্দ্ধ পৃষ্ঠা | " | | ৩॥০ |
| | " | সিকি পৃষ্ঠা | " | | ২৲ |
| | " | অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা | " | | ১।০ |
| খ। | কভারের | ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার | ১পৃষ্ঠা | মাসিক | ৭॥০ |
| | " | " " | অর্দ্ধ পৃষ্ঠা | " | ৪৲ |
| | " | " " | সিকি পৃষ্ঠা | " | ২॥০ |
| | " | " " | অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা | " | ১॥০ |
| গ। | কভারের | চতুর্থ বা শেষ পৃষ্ঠার | ১পৃষ্ঠা | মাসিক | ৯৲ |
| | " | " " | অর্দ্ধ পৃষ্ঠা | " | ৪৷৵০ |
| | " | " " | সিকি পৃষ্ঠা | " | ২৷৵০ |
| | " | " " | অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা | " | ১৷৵০ |

৭। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠিপত্র পাঠাইতে হইবে।

৮। ডাকমাশুল সহ চিঠি না দিলে কাহারো চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শান্তিনিকেতন পোঃ
( বীরভূম )

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

১

৩য় বর্ষ } বৈশাখ, সন ১৩২৯ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা,

## মন্দির।

### ৬ই মাঘ ১৩২৮।

( মহর্ষি দেবের মৃত্যু দিনে )

গত ৭ই পৌষ যাঁর দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক উৎসব আমাদের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে,—আজ একমাস পরে তাঁরই মৃত্যুর স্মরণের সাম্বৎসারিক দিনে আমরা একত্রিত হয়েছি।

আমরা যারা জীবন পথের পথিক—তাদের তিনি তাঁর জীবনের যে দীক্ষা তা পাথের স্বরূপ দিয়ে গেছেন। সেই দান তাঁর এই আশ্রমে আকার ধারণ করেছে—এখানকার সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের মধ্যে তাঁর পূজার অর্ঘ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে যা দিয়েছেন তা আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে পাচ্ছি,—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যে অনন্ত জীবনের মধ্যে তিনি গেছেন; তার যাওয়ার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলে ও আছে—কারণ যাঁর যথার্থ কিছু দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর যবনিকার অন্তরালে তিনি অন্তর্হিত হন না।

মৃত্যুতে অন্তর্ধান ঘটেনা, দূরত্ব ঘটেনা, মানুষ যেখানে অমৃতকে লাভ করেছে সেখানে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে গেছে, এইটি আজ স্মরণ করবার দিন।

আমার শয়নগৃহে যে ধূপ সন্ধ্যার সময় জ্বালা হয়, ক্রমে সে নিবে যায়, যখন রাত্রে শুতে যাই তখন আর কিছুই থাকে না। কালও ছিল না, পাত্রটি ভস্মে আচ্ছন্ন হয়েছিল। আজ প্রত্যূষে ঘুম ভেঙ্গে দেখি ধূপের গন্ধে সব ঘর ভরে উঠেছে, ধূপপাত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ভস্ম নেই। এরকম কখনও হয়নি।—এতে আমার মনে এই কথাটি লাগল। আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকালে তপস্যার যে অগ্নি বিশুদ্ধরূপে জ্বলেছিল, যার গন্ধে দিগদিগন্ত আমোদিত হয়েছিল—কখন্ সে ভস্মাচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রত্যেক দেশেই তার সাধনার শ্রেষ্ঠ সত্য কোনো না কোনো সময়ে মলিন হয়ে আসে। শতাব্দীধরে সে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেও পারে—কিন্তু সেই যে আগুন যাকে তিরোহিত মনে হয়েছে, ভস্মই যার প্রধান জিনিস

বলে' মনে হয়েছে—হঠাৎ দেখি সে জ্বলে উঠে সকল দিক আমোদিত করছে। এমনি করে সকল দেশের সত্য সাধনার ধন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েও কোনও না কোনও মানুষের চিত্তে জাগ্রত হয়; রুদ্ধদ্বার চারদিকে, একটা কোথাও দরজা খোলা পেয়ে অন্তরে এসে আঘাত করে। আজকে যাঁর স্মরণের দিন, তাঁর জীবনে এইটি বিশেষ করে দেখেছি।

উপনিষদের ঋষিরা যে সত্যকে জ্বালিয়েছিলেন, নানা আবরণের মধ্যে তার দীপ্তি প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন কালের জ্ঞানসম্পদের প্রতি মুখে শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও আমাদের জীবন থেকে তা দূরে সরে গিয়েছিল।

অথচ এই জ্ঞানের ধারাটি বিলুপ্ত হয়নি—নানা লোকের মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা নদীর মত তা গূঢ়ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। হঠাৎ এই একজনকে দেখলুম, যিনি অকারণে কিছুতেই বোঝা যায় না কেন—যা তাঁর চারদিকে কোথাও ছিল না, যাকে জানতেনও না, তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। কোথা থেকে তাঁর অভাব বোধ এল—সে কি ব্যাকুলতা! —আমাদের ইতিহাসের মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, ভারতবর্ষের সেই চিরকালের সাধনার ধন খোঁজবার প্রেরণা তাঁর হঠাৎ এল।

আমাদের জাতীয় অভ্যাস, ব্যক্তিগত অভ্যাস, ক্রমে উচ্চ হয়ে আমাদের কারাগার হয়ে ওঠে। চিরাগত অভ্যাসের দোষ এই—মানুষের চিত্তকে আলস্যের দ্বারা সে জড়ীভূত করে দেয়। অভ্যাস হচ্ছে নানা লোকের চিন্তায় আচারে খেয়ালে তৈরি করা পাথরের দুর্গ, আমাদের অলস চিত্ত এর মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়, এই আশ্রয়ের ভিতর বসে সে ভাবে, 'পেয়েছি'।—কিন্তু এই দেওয়াল, চিত্তকে সত্যের সঙ্গে অব্যবহিত ভাবে যুক্ত না করে বিচ্ছিন্ন করে। এই অভ্যাস প্রচণ্ড আঘাতে যখন ভেঙ্গে যায়, তখনি আমরা সত্যের মুখোমুখি হতে পারি। মহর্ষির মনও বাল্যকাল থেকে দেশের, পরিবারের, আচরণ পদ্ধতি এবং অভ্যাসের দ্বারা জড়ীভূত ছিল। তাঁর চিত্ত স্বভাবত ভক্তি প্রবণ ছিল; তাঁর দিদিমা প্রভৃতি যে অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকতেন তার সঙ্গে তাঁর প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ আজন্মকাল থেকে দৃঢ় হয়েছিল—কিন্তু এমন সময় দিদিমার মৃত্যু যখন তাঁকে আঘাত করলে তখন তিনি বুঝলেন যে, যে সব অভ্যাসের দ্বারা তিনি পরিবৃত, তা তাঁকে সেই সত্যের পরিচয় দিচ্ছিল না যা মৃত্যুর ক্ষতির মধ্য দিয়ে অমৃতের পরিপূর্ণের অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়।

মৃত্যুর আঘাত অমৃতের অভিজ্ঞতায় সচেতন করে তুলবে এই তার প্রধান কাজ। কিন্তু মৃত্যু-শোকও জড়তার দ্বার না ভাঙতে পারে, যদি আমাদের আবরণ কঠিন ও আমাদের প্রাণের তেজ কঠিন থাকে।

মহর্ষি শিশুর মত জাগ্রত হয়ে তাঁর ক্ষুধার অন্নের জন্য চারদিকে চাইলেন, অনেক খুঁজলেন, কোথাও অমৃতকে পেলেন না; মনে হল মৃত্যু সবশেষে নিয়ে গেল, তার ঊর্দ্ধে কিছুই নেই। তবুও তিনি অনুভব করলেন সত্য রয়েছেন, কিন্তু কোনও বাধাবশত তাকে পাচ্ছি না।

তিনি শাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে পথ খুঁজতে লাগলেন, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করলেন, নানা পণ্ডিতকে নিয়ে নানা সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। হঠাৎ একদিন একটি ছিন্ন পত্র উড়ে এল ঈশোপনিষদের বাণী নিয়ে:—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাম্ জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্—"

ঈশ্বরের দ্বারা সবকে আচ্ছন্ন করে দেখবে—যা কিছু আছে যা কিছু চলছে, ত্যাগের দ্বারা লাভ করবে, লোভ করবে না। এ ছিন্ন পত্রের অর্থও তখন তিনি জানতেন না—পণ্ডিতের কাছে গেলেন এর অর্থ বুঝে নিতে। তখন থেকে উপনিষদের সাধনা তাঁর জীবনকে পরম আশ্রয় দিয়ে এসেছে।

আমাদের ঋষিরা যে মন্ত্র দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তাকে প্রমাণ করবার ভার আমাদের প্রত্যেকের উপর আছে—যতক্ষণ সে শুধু পুঁথির মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তা হয় না। আমাদের দেশে এমন কথাও শোনা যায়—এ সব বড় ভাব, বড় কথা, মুনি ঋষিদের জন্য, সংসারীর পক্ষে ওসব নয়। আমাদের সাধকেরা, যে সত্যকে জীবনে লাভ

করেছিলেন তাকে এর চাইতে আর কোনমতে বেশী তিরস্কৃত করা যায় না। তাঁরা বলেছেন তাঁকে না পেলে "মহতী বিনষ্টিঃ"— এ যদি তোমার জীবনের ভিতর দিয়ে না জানলে তবে সমস্ত জন্ম ব্যর্থ হয়ে গেল, এত বড় বিনাশ আর নেই। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে বিশ্বাস কর, অভ্যাসের দ্বারা জড়িত হয়ে থেকো না, দুর্ব্বলআত্মাকে আলস্যে মগ্ন করে এত বড় বাণীকে অপমানিত করতে দিও না।

আমাদের দেশের সত্যকে নিজের জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—চন্দন সিন্দুর দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখে তাকে শুধু মুখের পূজা দেননি। পাপতাপ সুখদুঃখের দ্বারা তরঙ্গায়িত এই সংসারের মধ্যেই সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" কে জীবনে পাওয়া যায়—যদি কিছু বড় জিনিস জীবনে পেয়ে থাকি, তাঁর সংস্পর্শে এই বিশ্বাসকে পেয়েছি।

সত্যের জন্য যাঁদের ব্যাকুলতা আছে তাঁরা তাকে নিজের চারিদিকে পান, তাঁদের আর কিছুর দরকার হয় না। অন্যেরা বাইরের জিনিসকে সত্যের পরিবর্ত্তে নেয়। সত্যের সাধনা না করে আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা তাকে পাবার চেষ্টা, ঘুষ দিয়ে লাভের চেষ্টার মতই মানুষের একটা বড় মোহ। একান্ত ভাবে আকাঙ্ক্ষা না জাগলে সেই আকাঙ্ক্ষিত পরম ধন পাওয়া যায় না। শুধু মুখের কথায় নয়--তাঁর ধন প্রাণ, দীর্ঘজীবনের সব শোক দুঃখ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে, তাঁর সেই পরম আশ্রয় শিবম্, শান্তম্ এর যোগ কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হতে তিনি দেননি; 'সত্যং' তাঁর কাছে তাঁর ঘরের দেওয়ালের মতই সত্য ছিলেন। সেই পরম পুরুষকে জীবনের সব ক্ষেত্রকে পূর্ণ করে যেমন তিনি দেখেছিলেন—তেমনি ভারতবর্ষের সেই বড় সাধনা ইতিহাসের নানা যবনিকায় যা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, মনকে নির্ম্মল করে, জীবনকে বিশুদ্ধ করে তাকে প্রকাশ করা—এও তাঁর জীবনের সাধনার বস্তু ছিল। কোনও সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়ে তিনি এ চেষ্টা করেন নি, তিনি জানতেন সম্প্রদায় নানা বাধাগ্রস্ত—নানা স্থূলতা, নানা ক্ষুদ্রতা সেখানে সত্যকে অস্পষ্ট ও বিকৃত করে তোলে। শেষ জীবনে বার বার তাঁর মুখ থেকে শুনেচি এই শান্তিনিকেতনেরই মধ্যে তাঁর জীবনের সার্থকতা নিহিত। এই শান্তিনিকেতনে যেখানে কোনও সম্প্রদায়ের নূতন বা পুরাতন আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়ে ওঠেনি, যেখানে উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত আলোক—এইখানে তিনি কিছু পেয়েছেন, কিছু দিয়েছেন। "অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও" এই প্রার্থনা এই আশ্রমের অন্তরে তিনি দান করে গেছেন—যে প্রার্থনা বহুকাল থেকে চলে এসেছিল, যা মানুষ বিস্মৃত হয়েও হয় না—চিরকালের সেই প্রার্থনা তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের দান করে গেছেন।

গাছ, মাটি থেকে বাতাস থেকে, সূর্য্যের আলো থেকে খাদ্য ও তেজ আহরণ করে আনে, সে তার নিজের জিনিস নয়—কিন্তু তাকে নিজের জীবন দিয়ে ফলাতে হয়। তিনি এই ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁর জীবনে ফলিয়ে গেছেন, তাই এই মন্ত্রটি আজ এত সহজগম্য হয়েছে। তাঁর মুখ থেকে যা পেয়েছি, তাঁর মৃত্যুর দিনে তা উচ্চারণ করে আজকের কাজ শেষ হোক্—

"অসতোমা সদ্গময়—"।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# প্রথম চিঠি

১

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেচে প্রবাসে।

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল। মন বল্লে "ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।" কিন্তু সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আস্‌চে বলে একজনের ছুটি চোখ বেয়ে জল পড়ে তার জীবনে এমন সে আর কথনো দেখেনি।

পথে চলবার সময় তার কাছ পড়ন্ত রৌদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মত একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে সেই কথা মনে করে, বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠ্‌ল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেচে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মত পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোট ছোট ঝরণা কা'কে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায়, লুকিয়ে চুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিটিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেচে, "তুমি কবে ফিরে আসবে? এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।"

এই আসা যাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল একথা কে জান্‌ত? সেই ছুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখ্‌লে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে' উঠ্‌ল।

ভোর বেলায় উঠে' চিঠি খানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে, আর কানে যেন সে শুন্‌তে পায়, "তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে?"

৩

এমন সময় সূর্য্য উঠ্‌ল। পূর্ব্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে দেবদারুর শিশির-ভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিলমিল্ করে উঠ্‌ল।

হঠাৎ চারিটি বিদেশিনী মেয়ে ছুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কি জানি কি ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চাল চলনে।—বড় মেয়ে ছুটি কৌতুকে মুখ একটু খানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোট মেয়ে ছুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপ্‌তে পারলে না; ছুজনে ছুজনকে ঠেলা ঠেলি করে খিল খিল করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে—"আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি?"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল; একলা ঘরে বসে চিঠিখানি খুলে পড়লে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো এসো, শীঘ্র এসো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

## গান।

ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী
আমের মঞ্জরী
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে
পড়চে কি ঝরি ?
আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি।
পূর্ণিমা চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়,
(ঐ) দখিণ বাতাস গন্ধে পাগল
ভাঙল আগল
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি ॥

২৮শে ফাল্গুন
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায়
একটি ধারে।
আমি শুনব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায়
তার বাঁধিব বারে বারে ॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি
সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মত
উঠ্‌বে পূরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা
উঠ্‌বে ফুটে সারে সারে ॥

ফাল্গুন পূর্ণিমা।
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# ভারতবর্ষের প্রভাব।

(আচার্য্য সিলভ্যাঁলেভির, 'বিশ্বভারতী'তে ১৯২১ সালে ১১ই হইতে ২১শে নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।)

১৮।১১।২১

অধ্যাপক আজ পূর্ব্বদিনের হিতাইতদের সম্বন্ধে আলোচনার অনুবৃত্তি করেছেন। হিতাইতরা আর্য্যজাতি কি না সে সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। এসিরিয়ন ও ব্যাবিলোনিয়নরা যে অক্ষর ব্যবহার করত, পাশ্চাত্যরা তার নাম রেখেছেন কিউনিফরম। এ শব্দটি ল্যাটিন-cuneus থেকে এসেছে; এরমানে হচ্ছে "wedge"—পেরেকের মত মোটা আরম্ভ থেকে এর সব অক্ষর ক্রমে সরু হয়ে গেছে বলেই বোধ হয় তাঁরা একে 'কিউনিফরম' বলেছেন। প্রাচীনকালে দুরকম অক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—এক রকম ভাবের চিত্র, অন্যটা শব্দ বিশেষ প্রকাশ করে। কিন্তু হিতাইতদের যে সব লেখা পাওয়া যাচ্ছে—সে গুলো বিশুদ্ধ নয়, তারা যুক্ত, এই দুই রকমের সম্মিলন থেকে তারা হয়েছে। হিতাইতদের শিলায় খোদিত Hieroglyphics এর পাঠোদ্ধার করেছেন,—১৯১৪ খৃঃ অঃ এক জন অষ্ট্রীয় পণ্ডিত—Hrozny। এ নিয়ে পণ্ডিত সমাজে খুব আলোচনা চলেছে।

হিতাইতরা তাদের 'ভাবলিপি' কতকটা আ্যাসিরিয় শব্দচিত্র এবং কতকটা নিজেদের বিশেষ বিশেষ অক্ষর যোজনার দ্বারা করেছে—ইতিহাসে অন্যত্রও এর নিদর্শন আছে। জাপানীরাও প্রাচীন কালে এই কাজ করেছে। জাপানী তার 'কা' 'কি' প্রভৃতি ভারতবর্ষের কাছে পেয়েছে। চীনদেশে দুরকমের হায়ারোগ্লিফিক প্রচলিত ছিল, এক রকম সর্ব্বসাধারণের জন্য, অন্যটা বিশিষ্টদের জন্য। জাপানী চীনের এই সব কথায় ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া প্রত্যয় যোগ করে নিজের ভাষা লেখার পদ্ধতি বের করেছে।

অ্যাথিয় রাজাদের কোষাগারের দপ্তরের মধ্যে প্রাপ্ত নানা বিশয় নাম এবং সেই সব ভাষার শব্দের একটি তালিকা জার্ম্মানীর বিখ্যাত পণ্ডিত Detitsch ১৯১৪ খৃঃ প্রক করেন। এর মধ্যে কতক শব্দ যা পাওয়া গেছে তা আর্য্য। তার একটি কথা হচ্ছে দানুতে (বহুবচনের রূপ), দ মানে "giving" দান করা। তেমনি সংখ্যাবাচক শব্দও পাওয়া গেছে এক, তিন পাঁচ প্রভৃতি।

একার চেকোশ্লাভাকিয়ার হোশনি প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন—হিতাইতদের ভাষা ওইয়োরোপীয় সংস্কৃত গ্রীক প্রভৃতির সম-জাতীয়। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে, প্রমাণ যে সব আছে তাতে এঁদের অনুমানকে কাল্পনিক বলা যেতে পারে। আর্য্য ভাষা সাদৃশ্য দেখে যে অর্থ সেই সব শব্দে তাঁরা আরোপ করেছেন তা তাদের মোটেই নয়, কাজেই তাঁদের এই অনুমান অগ্রাহ্য।

হিতাইতদের অনেক কথা যে আর্য্যভাষা থেকে পাওয়া তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে তাঁরা আর্য্য ছিলেন। এসিয়া মাইনর তৎকালের সভ্য জাতিদের মিলনের ক্ষেত্র ছিল। এখানে যেমন সংস্কৃত দেবতার নাম পাওয়া গেছে, "শেস" প্রভৃতি পণ্ডিত দেখিয়াছেন তেমনি গ্রীক প্রভৃতি আর্য্য ভাষার সঙ্গেও তাদের অনেক কথার ঘনিষ্ট যোগ আছে।

তা হলে বলতে হবে, আর্য্য সভ্যতার দুই প্রবাহ, এক-ধারা পূর্ব্বে অন্যধারা পশ্চিমে যাবার সময়, এসিরিয়া ব্যাবিলন ককেশস্ প্রভৃতি যে সব দেশ দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে তাদের যোগ হয়েছে। কিছু তারা নিয়েছে কিছু দিয়েছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১২০০ শতাব্দীতে এই দুই ধারার, এসিয়ামাইনরে প্রাচীন জাতিদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ যোগ হয়েছিল তার প্রমাণের অভাব নেই।

ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি যে খৃষ্ট পূর্ব্ব সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে প্রবেশ করেছিলেন, অধ্যাপক মহাশয়ের মতে তা মনে করার মত প্রমান নেই।

খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী মানব ইতিহাসের এক আশ্চর্য্য সময়। হঠাৎ সে সময়ে আর্য্য জাতির মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। ফুলের মত ফুটে উঠে তার সভ্যতা চারিদিকে তখন ছড়িয়ে পড়ছে, তার একটি পরিণতি বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকেরা আইয়োনিয়াতে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেচে। আর্য্য জাতির এক শাখা,—ইট্রসিয়রা, রোমে গিয়ে বাস করছে। গ্রীক অক্ষরে এই সময়ে লেখা ১৫০০ শ্লোক মমির মধ্যে পাওয়া গেছে। ইউফ্রেটিসের ধারে ধারে আর্য্য জাতির একটি বিপুল প্লাবন তখন পূর্ব্বদিকে গড়িয়ে চলেছে; সমস্ত পৃথিবীতে অকস্মাৎ সভ্যতা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। ইতিহাসে এ একটা মস্ত ঘটনা।

১৯।১১।২১

মিতানি রাজ্য সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনার দরকার আছে। বৈদিক যুগের একটা ইতিহাস এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। মানচিত্রে ইউফ্রেটিস নদীর বাঁকের মধ্যে এই জায়গাটি পার হয়ে সেকালে লোকে ইয়োরোপ থেকে এসিয়া মাইনরে আসত—সমুদ্র পথে বেশীদূর কোথাও যাওয়া তখনও সম্ভবপর হয় নি—ডাঙ্গাপথে ক্রমে ক্রমে আর্ম্মিনিয়া মিতানি হয়ে পারস্য উপসাগরে আসবার সহজ পথ মিতানির ভিতর দিয়ে ছিল—ক্রমে সেখান থেকে বোলান পাস্ পার হয়ে ভারতবর্ষে আসা যেত।২২০ খৃষ্টাব্দে যে বংশ চীনদেশে রাজত্ব করতেন তাঁদের কথা প্রসঙ্গে রোমক সাম্রাজ্যের পথের বর্ণনা আছে—মরুভূমি পার হয়ে এই পথ মিতানির ভিতর দিয়ে গেছে। এই জায়গাটি সকলের মিলন কেন্দ্রের মত ছিল, এখানে সকলকে মিলতেই হত। পশ্চিম পূর্ব্বের এই চৌমাথা পথ, বৈদিক ভারতীয়দের আগমনের প্রবাহ পথ নিঃসন্দেহ একদিন ছিল। এসিরিয়ানরা ভারতীয় আর্য্যদের কাছে কিছু পেয়ে থাকলে এখানেই তা পাবার সম্ভাবনা ছিল। আরও অনেক প্রাচীন যাত্রীদের সঙ্গে এঁদের মিলন হয়ে থাকবে। বৈদিক ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সংস্পর্শেই এই রকম করে এসেছিল এবং নিঃসন্দেহ নানা দিক থেকে তাদের আদান প্রদান হয়ে থাকবে। আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ার ঘনিষ্ট সংস্পর্শে ভারতবর্ষ কি করে এসেছিল, এই আলোচনা থেকে কতকটা আমরা বুঝতে পারি।

২০।১১।২১

ভারতীয় ও ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে কি না, সে বিষয় নিয়ে অনেক দিন থেকে আলোচনা চলছে। সেই আলোচনা প্রথম আরম্ভ করেন James keoxnedy. তিনি ১৮৯৬ সালে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে "Early commerce of India with Bebylonia" নামে একটী প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন যে খৃঃ পূঃ ৭৮০ অব্দে ভারতবর্ষ ও ব্যাবিলনের মধ্যে বাণিজ্যের যোগ ছিল।

একটী উদাহরণ দিলে ভারতের ব্যাবিলনের উপর প্রভাব বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে। হেরোডোটাস্ তাঁর বইতে "sindon" বলে এক রকম কাপড়ের উল্লেখ করেছেন। আসুরবাণিপালের গ্রন্থশালাতেও (৬৬৮-৬৩৬ খৃঃ পূঃ) এ শব্দটীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। এ কাপড় ভারতবর্ষ থেকে জলপথেই ব্যাবিলনে যেত, স্থলপথে যদি পারস্যের মধ্যে দিয়ে যেত, তবে "সিন্দন" শব্দটীর "স" "হ" রূপ ধারণ করত।

এবার ভারতের উপর প্রভাবের কথা বলব। ঋগ্বেদে ৮ম মণ্ডলে ৭৮ সূক্তে ২য় মন্ত্রে "মনহিরণ্য" শব্দ পাওয়া যায়। এখন "মন" শব্দটী সংস্কৃত বলে মনে করলে, এর কোন মানেই হয় না। এটী মূলে আসিরীয় শব্দ, একে এখানে আসিরীয়ভাবে 'পরিমাণ' অর্থে ধরতে হবে। এ রকম দৃষ্টান্ত নানাদিকে আছে। ভারতীয়রা যেমন বিদেশীয়দের দান করেছে তেমনি গ্রহণ করতেও তাদের কুণ্ঠা ছিল না।

শতপথ ব্রাহ্মণে যে জলপ্লাবনের কাহিনী আছে সেটী আসিরীয় প্রলয় প্লাবনের অনুকরণ বলে মনে হয়। কারণ যদিও আসিরীয় সাহিত্যে এ কাহিনী নানারূপে দেখা যায়,

বৈদিক সাহিত্যে একবার মাত্র একে দেখতে পাই। এই রকমে দুই দেশের সভ্যতার আদান প্রদানের ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে আসে।

২১।১১।২১

আজ আমরা পারস্যের সঙ্গে ভারতের যোগের কথা বলব। এইবার আমরা ঐতিহাসিক যুগের গণ্ডীর মধ্যে আসছি।

পারস্যের সঙ্গে ভারতের যে যোগ তার আরম্ভ হচ্ছে সাইরাসের সময় থেকে (৫৪৯-৬২৯ খৃঃ পূঃ)। তিনি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কপিশ (Kapissa) বলে এক নগর অধিকার করে ধ্বংস করেন। এর উল্লেখ আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই।

তার পর ভারতীয়রা পারসিকদের সংস্পর্শে আসে দারিয়াসের সময়ে। ব্যাবিলন জয় করে তিনি Archosia অধিকার করেন। এটীকে অনেকে সরস্বতী বলে থাকেন। তাঁর বড় কাজ হচ্ছে—সিন্ধুনদী আবিষ্কার করবার জন্যে একটি অভিযান পাঠান। সে অভিযানের নায়ক ছিলেন—Seylex বলে এক গ্রীক।

ডারিয়াসের অনেক অনুশাসন আবিস্কৃত হয়েছে, অনেকে মনে করেন তারই অনুকরণে অশোক তাঁর লিপি বার করেন। তবে দারিয়াস কেবল রাজাদের কথাই বলেছেন, অশোক ন্যায় ধর্মের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর অনুশাসনে আমরা গান্ধার ও হিন্দুকুসের উল্লেখ পাই।

এবার আমরা বভেরু জাতকের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব বভেরু জাতক থেকে আমরা জানতে পারি যে ভারতথেকে কতকগুলি বণিক প্রথমে কাক ও পরে ময়ূর বিক্রয়করতে বভেরু রাষ্ট্রে যায়।

১৮৭০ সালে প্রথমে পণ্ডিত Minayeff বলেন যে বভেরু অর্থে ব্যাবিলনকেই বোঝায়। জাতকের লেখক এশব্দটী বোধ হয় পারসিকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কারণ পারসিক ভাষায় "ল" স্থানে "র" হয়।

অনুমান ৪৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীসে ময়ূরের কথা শোনা যায়। সে সময় Pericles এর এক বন্ধুই প্রথম ময়ূর গ্রীসে আমদানি করেন— সম্ভবত পারস্য থেকেই। প্রাচীন আসিরীয় সাহিত্যে ময়ূরের কোথাও উল্লেখ নেই। সীসীরোর সময় (ক খৃঃ পূঃ) কেবল ধনী গ্রীকরা ময়ূরের মাংস আহার করতে পারত। অশোকের সময়েও ভারতে ময়ূরের মাংস আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হত।

মনে হয় পারস্য থেকেই ক্রমশঃ ময়ূর গ্রীসে প্রচলিত হয়েছে।

---

## মাটির গান।

ফিরে চল্ মাটির টানে ;<br>
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে<br>
মুখের পানে<br>
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেচে,<br>
হাসিতে যাঁর ফুল ফুটেচে রে,<br>
ডাক দিল যে গানে গানে।<br>
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে<br>
কোল রয়েচে পাতা,<br>
জন্মমরণ ওরি হাতের<br>
অলখ সুতোয় গাঁথা।<br>
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা<br>
সাগর পানে আত্মহারা রে,<br>
প্রাণের বাণী বয়ে আনে॥

২৩শে ফাল্গুন<br>
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# আশ্রম-সংবাদ

পূজনীয় গুরুদেব প্রায় একমাস কাল শিলাইদহে কাটাইয়া গত ২৭শে চৈত্র আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি এফ অ্যাণ্ড্রুজ ও তাঁহার সহিত শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আচার্য্য লেভি ও তাঁহার পত্নী নেপালযাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত বিশ্বভারতীর ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। নেপালে অনেক প্রাচীন মূল্যবান্ পুঁথি আছে সেগুলির উদ্ধার করিবার বাসনা লেভি সাহেবের আছে।

ফরাসী—সুইট্জারলাণ্ডের অধিবাসী শ্রীযুক্ত বেনোয়া আশ্রমে বাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। ইনি নানা ভাষাবিদ অভিজ্ঞ অধ্যাপক, ইঁহাকে পাইয়া বিশ্বভারতী বিশেষ লাভবান হইয়াছে।

আগামী ২৭শে এপ্রিল হইতে ২৬শে জুন পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বিশ্বভারতী বন্ধ থাকিবে।

আশ্রমে দিন দিন বাড়িঘর ও লোকজনের বাস বাড়িতেছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো আশ্রমে জ্বালা হইত তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া একটি নূতন এঞ্জিন ও ডাইনামো আসিয়াছে। ইহাতে সাতশত বাতি জ্বলিতে পারিবে।

এণ্ড্রুজ সাহেব প্রায় একমাস কাল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন।

গত ৭ই ও ৮ই চৈত্র ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আশ্রমবাসী সকলের নিকট জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন ই, আই, আর এর এজেণ্ট ধর্ম্মঘটকারীদের যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আশাতিরিক্ত এবং তাহা গ্রহণ করিলে সবদিক দিয়া কল্যাণকর হইত। এখন ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে হিংসা বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তপাত নিবারণের সাধ্য কাহারও থাকিবে না। রাষ্ট্রনীতি নির্ম্মম, সহস্র সহস্র নিরপরাধ নরনারীর সমস্ত সুখ দুঃখ কল্পিত তুচ্ছলাভের আশায় বলিদান দিতে সে কুণ্ঠিত নহে, এইটিই আমাদের উৎকণ্ঠার বিষয়:—"আমাদের আশ্রমের তপস্যা সত্য হোক, সমস্ত বিরোধ বিক্ষোভের উপরেও আজিকার দুর্দ্দিনে এখানকার ক্ষমা কল্যাণ এবং শান্তির ধারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অব্যাহত হোক, তাঁহার চরণে এই আজ আমাদের একান্ত কামনা যেন হয়!"

গত সাহিত্য-সভায় ছাত্রগণ একটি হাস্যকৌতুক অভিনয় করিয়াছিল। তাহাতে গুজরাটি পার্শি, বার্ম্মিজ ছাত্রগণও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। অভিনয় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

প্রসাদ বিদ্যালয়—আশ্রমসন্নিকট হিন্দুমসলমানপ্রধান ভুবনডাঙা গ্রামে "প্রসাদ বিদ্যালয়" নামে যে পাঠশালা আছে তাহাতে দুইবেলাই পড়ানো হইতেছে। সকালে ও বিকালে পড়াইবার জন্য দুইজন শিক্ষক আছেন। দুই বেলায় গড়ে ২১।২২ জন ছাত্র উপস্থিত থাকে। ইহার জন্য একটি তহবিল আছে নিম্নশ্রেণীর হিত-সাধন সমিতি ও ইহার জন্য মাসিক দুই টাকা সাহায্য পাঠাইয়া থাকেন।

আশ্রমের নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল গ্রামের সুরুৎ বিদ্যালয় আজকাল নৈশবিদ্যালয় হইয়াছে। সারাদিন সাঁওতাল বালকেরা কাজকর্ম্মে এরূপ লিপ্ত থাকে যে দিনের বেলায় তাহারা সময় পায় না সেইজন্য রাত্রিকালে তাহাদের পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মাঝে মাঝে বালকদিগকে ছায়াচিত্র দেখান হইয়া থাকে। আশ্রমে আসিয়া সাঁওতাল বালকগণ মাঝে মাঝে ফুটবল খেলিয়া যায়।

গত ২৩শে চৈত্র স্বর্গীয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার পিতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গ্রামের বালকদিগকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত অর্থ পাঠা-

হইয়াছিলেন। সে দিন দুই বিদ্যালয়ের ৪৮জন ছাত্র লুচি মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিল।

গত ১৪শে ফাল্গুন অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকার সময় পূজনীয় গুরুদেবের গৃহে বিশ্বভারতী সম্মিলনের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে যে আলোচনায় নিযুক্ত আছেন সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বাংলা ভাষার মঙ্গল গ্রন্থমালা যে মূলতঃ বৌদ্ধ দর্শনের নিকট ঋণী ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত একথা ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মমঙ্গলের জগৎ সৃষ্টির ধারণা ও বৌদ্ধ দর্শনের জগৎ সৃষ্টির ধারণার মধ্যে যে ঐক্য আছে বক্তা তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার আলোচনা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গুরুদেব তাঁহার সংগৃহীত ধর্ম্মমঙ্গলের গানের কয়েকটি এই সভায় পড়িয়া শোনাইয়াছিলেন।

গত চতুর্দ্দশীতে মহাত্মা গান্ধীর কারাবাসের খবর আসাতে অধিবেশন বন্ধ রাখা হইয়াছিল। পরের সভাতে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম শ্রীযুক্ত মৌলভী জিয়াউদ্দীন পারসীক কবি সাদির একটি কবিতা আবৃত্তি ও তাহার অনুবাদ করিয়া শোনান। পরে সৈয়দমুজতবালী ওমার খৈয়াম সম্বন্ধে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি Fitzerald এর অনুবাদ হইতে বাংলা অনুবাদ করাতে কবির উপর যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে Fitzerald ওমারের কবিতার প্রকৃত অনুবাদ করেন নাই। তাঁহার কবিতাবলী হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া আপন ইচ্ছামত সাজাইয়া নিজের ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে কবিকে নাস্তিক বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক অথচ ওমার নাস্তিক ছিলেন না। এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় বলেন—এই সকল অনুবাদকে ভিত্তি করিয়া অনেক দার্শনিক আলোচনা চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়ত কবিকে মিথ্যার আবরণে ক্রমশঃ আবৃত করা হয়। মূল গ্রন্থের অনুবাদ আজও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত না হওয়া আক্ষেপের বিষয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী "পূর্ব্বমেঘের প্রথম শ্লোক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সঙ্গীত বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীগণের চেষ্টায় গত ১৩ই চৈত্রের অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল।

## কলাভবন।

মান্দ্রাজ Y. M. I. A (1921 club) গত মার্চ মাসে এবৎসর প্রথম ভারতীয় শিল্পকলার একটি প্রদর্শনী খুলেছিল। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন Mrs annie Besant, Mr cousins এবং Mrs adiar। কলিকাতা I. S. O. A র তরফ থেকে এবং আশ্রমের কলাভবনের তরফ থেকে চিত্রকলা প্রদর্শিত হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে ক্লাবের সভ্যগণ বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদার মহাশয়কে বিশেষ ভাবে সেখানে আহ্বান করেছিলেন। প্রদর্শনী ১লা মার্চ থেকে ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত খোলা হয়েছিল। প্রত্যহ সায়াহ্নে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। (১লা মার্চ) প্রদর্শনী খোলা উপলক্ষ্যে Lady Emily Lutyens (বঙ্গের হবু-লাটের ভগ্নী এবং দিল্লীর রাজকীয় স্থপতী Sir Edwin Lutyens এর পত্নী) একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তারপর Mrs Besant ও Mr cousins তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। (২রা মার্চ) দ্বিতীয় দিন Mrs annie Besant "what is an artist ?" (৩রা মার্চ) তৃতীয় দিন Mrs cousins "Beauty in Daily life" (৪ঠা মার্চ) Mr W. Hadaway "Art crafts of South India" (৫ই মার্চ) শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার "The Neo-Bengal School of Painting (৬ই মার্চ) Mr Jinarajadsa "Artistic Discrimination" এবং শেষে (৭ই মার্চ) Mr cousins "Indian Influence" in art beyond India বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

Mr cousins প্রদর্শনীর চিত্রকলা বিভাগের এবং

Mr adiar প্রদর্শনীর কারুশিল্প বিভাগের তত্ত্বাবধান করেন। চিত্র বিভাগটি তিনটি হলঘরে সাজান ছিল। একটিতে প্রাচীন তাঞ্জোর একটিতে বঙ্গীয় আধুনিক চিত্রকরদের, চিত্র এবং অপর কোঠায় প্রাচীন মোগল, রাজপুত প্রভৃতির চিত্র (কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্য) সাজান হয়েছিল। এই চিত্রশালাটি Mr cousins বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে সাজিয়েছিলেন। Mrs adiar ও তাঁর কারু বিভাগটিতে মান্দ্রাজের প্রাচীন ধাতুমূর্ত্তি ও নানা প্রকারের অলঙ্কার বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার সুচারুরূপে সাজিয়ে তুলেছিলেন। মান্দ্রাজ আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল Mr. U. Hadaway তাঁকে এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। প্রদর্শনী ছোট হলেও মোটের উপর খব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অল্পদিন যাবৎ খোলা থাকলেও অনেক বিশিষ্ট দর্শকের সমাগম হয়েছিল এবং তার ফলে কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের অনেক ছবি বিক্রি হয়েছিল।

Mrs annie Besart এর স্থাপিত গিণ্ডি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রদর্শনীতে কলাভবনের ছাত্র শ্রীমান অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "স্বাধীনতা" নামক একটি চিত্র দেখে মুগ্ধ হয়। তারা ছবিটি তাদের বিদ্যালয়ে রাখা উপযুক্ত বিবেচনা করায় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা এবং বন্ধুরা সকলে মিলে চাঁদাকরে ছবিটি কিনে দিয়েচেন। বিদ্যালয়ে চিত্রটির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষ্যে বিশেষ একটি সভা হয়। Mr cousins একটি বক্তৃতা দেন এবং তাঁদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের এবং বিশেষভাবে চ্যান্‌সেলার হিসাবে গুরুদেবের যে যোগ আছে তা উল্লেখ করেন। অসিতবাবু এই সভায় বিশেষভাবে আহূত হন, তাঁকে আশ্রম ও কলাভবন সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছিল।

* * * * *

কলাভবনের ছাত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুপ্ত গত মাসের এবং এ মাসের "শান্তিনিকেতনের" জন্য স্বরচিত দুইটি ব্লক উপহার দিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

## বৈদেশিক সংবাদ।

বিদেশ হইতে যে সকল চিঠি পত্র আসে তাহার কিছু কিছু প্রকাশ করিতে আমাদের পাঠকদের অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন নিম্নে দুইটি পত্র এবারে দেওয়া গেল।

28. 11. 21.
Wendsbek
*Konigstr.* 41.

My dear master.

Since the day we received your son's letter telling us abcut your plans concerning shantiniketan we have thought of nothing but this great scheme of yours. You know that our hopes for the Salvatiou of the west have long been resting in you and how ardently we wished you to come to our conntry, because we are convinced that here you would find the most fertile soil. I firmly believe that of all the nations of Europe the soul of Germany is most akin to that of India and that these two countries must join in their work. The Germany of Bismark lies thrown down but the true Germany and the Germany of Kant and Goethe and Schiller and Kleist lives and in this Germany you will find your ally.

While I am writing this letter my husband is writing to you at the same time and perhaps you have read his letter before you read mine and heard from him what has occupied our mind, these last weeks. So I will not repeat

what he has said, but only add that if this idea of his should meet your desires, if we could come and help you in carrying out your plans in Shantiniketan, it would seem to me as the fulfilment of our life, which could give a meaning *to all our aspirations. I know that this* call of yours, if it should come, would summon us to hard work, not to a flower's or bird's existence spent in singing hymns under palm trees, I know the value of what we should have to give up and perhaps leave behind us for ever, and yet that which is to be gained not for ourselves but for those we love is worth a thousand times more, and so I should gladly answer; Here I am, my master.

Meanwhile I spend my time in spreading your message among my people. I am glad your letter arrived just in time to tell me about the alteration and additions in the manuscript, I was just going to give my translation to print. So I wait till the book arrives, I hope the German edit ion can yet come out before May. I wrote to your son that we should be very glad if you would send us a photo of yours for the first volume of the collective edition if you have one at hand; may I repeat the request without appearing to be obstrusive ?

The other day, my sister, who is teacher in an elementary school, told me a little incident which happened in her class. She sometimes in the morning reads some of your Gitanjali songs to her pupils, and when she read, "This is my prayer to Thee my lord" the children asked her to let them write it down in their copy books. So she gave it to them and some days after, when the girls were having their Quaker-meal and one of them broke her bowl, she swallowed her tears saying earnestly; "Give me *the strength to raise my mind high* above *daily trifles.*" And when my sister afterwards asked her, "So you know the psalm by heart ?" She said. "Oh yes, at night when I am in bed I always repeat it to myself." I know this little incident will make you glad and hopeful as it did me.

Please give my friendliest greetings to you dear son and daughter and Mr. Pearson and tell them how much I am looking forward to welcome you here and accept once more the assurance of my most ardent devotion.

Ever yours

Helene Meyer Frandt.

***London, June 24th, 1920***

Dear master,

Let my words remind you of Russia, where the lovely poetical images which you evoke, bring beauty and solace to human life and your personality is surrounded by a halo of admiring respect. You bring into contemporary life that lofty spiritual joy, which gives strength to the seekers of a radiant future.

Please accept the heartfelt greetings of a Russian artist.

Your very sincerely

N. Roerich.

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩২৯ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

## নববর্ষ

( ১লা বৈশাখ ১৩২৯, মন্দিরের উপদেশ )

আজ আমাদের নববর্ষের উৎসবের দিন। যিনি চিরনবীন তিনি গ্রহতারালোকিত মহারথে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, চির-জীবনের পথে সংসারকে নিয়ত বহন করে নিয়ে চলেছেন। আজ আমরা সেই অমৃতস্বরূপের আশীর্ব্বাদ অন্তরে গ্রহণ করে জীবনকে মৃতসঞ্জিবনীরসে অভিষিক্ত করব।

আমরা আজ বাইরের জগতের দিকে চেয়ে নূতনের উৎসবকে দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃতিতে পুনঃ পুনঃ নূতনের আবর্ত্তন হচ্ছে। পৃথিবী যেখান থেকে সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ সুরু করেছিল আজ বৎসরান্তে সেখান থেকেই আবার তার যাত্রার আরম্ভ হল। এই আবর্ত্তনের মধ্যে বিচ্ছেদ নেই। যে সব ফুল গত বৈশাখে ফুটেছিল আজ আবার সেই চাঁপা-বেল-জুঁই, নূতন ঋতুতে নব আনন্দের সরসতায় আবির্ভূত হল। তাদের ক্লান্তি নেই, অবসাদ হয় না, তারা বিনষ্ট হয় নি; তারা মহাপ্রাণের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত ছিল, তাই আবার ফিরে এল। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের ললাটে জরার বলীরেখা নেই—আজ চারিদিকে শুনতে পাচ্ছি নূতনের জয়ধ্বনি।

কিন্তু মানুষের জীবনে নবীনতার অর্থ আরো গভীর। পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তার জীবনলীলার পরিচয় নয়। আমরা বাইরের বিশ্বে চেয়ে দেখি, গাছের মধ্যে তার প্রকাশ একটা পূর্ণতায় এসে ঠেকেছে, তাই সে ক্রমাগত একই ফুলকে জন্ম দিচ্ছে ফোটাচ্ছে, একই ফলকে ফলাচ্ছে। এর চেয়ে বেশী তার কাছে দাবী নেই। কিন্তু মানুষের প্রাণপুরুষের বিশ্রাম নেই, সে তার গন্তব্যে এসে পৌঁছায়নি। সে যে অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবতাকে পূজা করবে তার আয়োজন এখনও বাকী আছে, তার উপকরণ এখনো সংগ্রহ হয়নি, তার রচনা এখনো অসমাপ্ত। যদি তার আত্মপ্রকাশ কোনো একটা ক্ষুদ্র সীমায় এসে পূর্ণ হতে পারত, তবে প্রকৃতিতে আজকার গাছপালার উৎসবের মতই তার উৎসব এমনি সুন্দর হতে পারত—তার ফুলের সাজি তার ফলের ডালি এমনি সহজে ভরে উঠত। সে বলত, "আমার উদ্যোগ সারা হয়ে গেছে—এখন থেকে

শতাব্দীর পর শতাব্দী একই চক্রপথে বিনা চিন্তায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে প্রবৃত্ত থাকব।” কিন্তু আমাদের অন্তর যে তাতে সায় দেয় না, আমরা ত কিছুতেই বলতে পারি না একটা জায়গায় এসে ঠেকে গিয়েছি। আমাদের মন বলে, “জীবন বীণার সব তার এখনো চড়ানো হয়নি, সব সুর এখনো সাধা হল না। আমাকে যে দেয়ালি উৎসব করতে হবে; একটা একটা বাতিতে ত আমার কুলাবে না; দিকে দিকে মহলে মহলে যে আমাকে অন্ধকার দূর করতে হবে।” তাই আমরা যে নবীনতার সাধনা করব সে ত পুনরাবৃত্তির দ্বারা নয়, সে অসীমের আবরণ উদ্ঘাটনের দ্বারা। তাইত আমাদের উদ্যোগের আর বিরাম নেই। মানবের অন্তরে যে তপস্যার হোমাগ্নি জ্বলেছে তাতে নিয়তই আহুতি দিতে হবে, বেদনা দাহনের শান্তি নেই। তাই আমাদের নববর্ষের উৎসব হচ্ছে তপস্যার হোমহুতাশনে নূতন আহুতি দান।

তবে আজ বর্ষারম্ভের দিনের প্রভাতে এই যে শান্তি এই যে সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির কর্ম্মের অভ্যন্তরে এই যে গভীর বিরাম এর সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? আছে যোগ। চারিদিকের প্রকৃতিতে আমরা পূর্ণতার যে রস পাচ্চি এর থেকে সরল ভাষায় আমরা অসীমের একটা পরিচয় পাই। সেটি যদি না পেতুম তাহলে আমাদের চিত্ত পরিপূর্ণতার সাধনায় আস্থা লাভ করতে পারত না। তানপূরার চারটি তারে চারটি মূল সুর বাঁধা সারা হয়েচে সেই মূল সুর কয়টি কানের কাছে বার বার ফিরে ফিরে আস্‌চে। সেই জন্যেই গানে আমাদের নতুন নতুন যে তান লাগাতে হবে সেই তানগুলি মূল সুরের বাঁধন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় না। আমাদের চারিদিকে গাছপালার মধ্যে অসীমের যে সহজ সুর রয়েচে, যে সুরের কেবলি প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে আবৃত্তি হচ্ছে, সেই-গুলি আমাদের সাধনাকে আনন্দ লোকের পথ নির্দ্দেশ করে আমাদের জীবন সঙ্গীতকে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে নিরস্ত করে।

যা সহজে পেয়েচি এই আমার সমস্ত সম্পদ নয়, ত্যাগের দ্বারা তপস্যার দ্বারা আমাদের সম্পদকে নিত্যই নূতন করে আবিষ্কার করতে হবে। প্রভাত সূর্য্যের আলোক-অভিঘাত আমাদের দ্বারে এসে পৌঁচেচে, তার বাণী এই:—হে যাত্রী, এখানে নিদ্রা নয়, অবসাদের জড়তা নয়, গম্যস্থান এখনো বহু দূরে। কঠিন পথে চলতে হবে। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে কণ্টকের উপর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। শ্যামল বসুন্ধরার অঞ্চলে যে মর্ত্ত্যলোকের তপস্বীরা তাদের আসন পেতেছে তাদের কাছে নববর্ষের এই বার্ত্তা এসেছে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

মানুষ কি এই বাণী শুনতে পায়নি? সে যে ইতিহাসের আরম্ভ থেকেই এই বার্ত্তাকে মেনে নিয়েছে, তাই সে বেঁচে গেছে। সে বলেছে—“আমি থামব না, ক্ষুধা তৃষ্ণাকে মানব না, রোগ দুঃখের মূল উচ্ছিন্ন করব, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে নব নব জ্ঞান লাভ করব। সুদূর লক্ষ যোজন দূরে যে গ্রহনক্ষত্রে আলোর হৃৎস্পন্দন হচ্ছে তাদের নাড়ীর পরিচয় পাব,—যা প্রয়োজন, যা অপ্রয়োজন, সমস্ত বস্তুকেই জেনে নেব। মানুষ তাই যাত্রা করেছে, তার নিদ্রা নেই, আরাম নেই, সে জ্ঞানের, কর্ম্মের, বিত্তের তপস্যা করে চলেছে।

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে একদিন ভারতের ব্রহ্মবাদী গুরু বলেছিলেন, “অন্নং ব্রহ্ম।” অর্থাৎ এই অন্নময় স্থূল বস্তুজগতেও অসীমের প্রকাশ আছে। যারা অন্নময় জগতে অসীমের সাধনা করতে প্রবৃত্ত হয়েচে তারা কেবলই বস্তুর বাধাকে অতিক্রম করে করে শক্তি সম্পদের অসীমতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেচে। অন্নজগতের অসীমের তাপসদের কাছে অন্নজগতের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার তার নতুন নতুন মহল কেবলি উদ্ঘাটিত করে দিচ্চে। তারা বলেনি আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ অতএব আমাদের আকাঙ্খাকেও সীমাবদ্ধ করতে হবে। তারা কোনো বিঘ্নকে কপালের লিখন বলে স্বীকার করে নেয়নি। তাদের ললাটে যে অনন্তের জয়তিলক আঁকা রয়েছে, কোথাও তাদের অধিকারের শেষ নেই, এই কথা মেনে তারা কোনো দারিদ্র্যকে কোনো রোগতাপকে চরম বলে, বিধি নির্দ্দিষ্ট বলে গ্রহণ করে নি। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি আধিব্যাধিকে ভাগ্যদোষের দোহাই দিয়ে শিরোধার্য্য করে

নিলে তাতে মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা হল, কারণ বিধাতা যে মানুষকে বলেছেন, 'তুমি মৃত্যু দণ্ডকে এত সহজ মেনে নেবে না, তোমাকে সকল আঘাতের উপর অভাবের উপর জয়ী হতে হবে।'

তাই আজ পশ্চিম মহাদেশে মানুষ কেবল মাত্র রোগের চিকিৎসার কথা ভাবচে না, সে রোগের গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাতে চেয়েচে। তারা শুধু বড়ি পাঁচনের কথা ভাবে নি তারা বলুচে রোগের যেখানে উৎপত্তি সেইখানে গিয়ে তাদের আক্রমণ করব। দূরত্বের ব্যবধানকে তারা সীমা পিঞ্জরবদ্ধ জীবের অবশ্যস্বীকার্য্য বলে গ্রহণ করে নি। একদা মানুষ নিজের দুই খানি পা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল—কিন্তু তার মনের ভিতরে এই মন্ত্রটি আছে যে, অন্নং ব্রহ্ম, সেই জন্যই অন্য জন্তুর মত কেবল মাত্র বিধিদত্ত নিজের পায়ের উপরেই সে ভর করে দাঁড়াল না। গোরুকে হাতিকে ঘোড়াকে উটকে নিজের বাহন করে নিজের পদবৃদ্ধি করে চল্‌ল। তাতেও থাম্‌ল না, বাষ্পকে তড়িৎকে লাগাম দিয়ে বাঁধল,—স্থলে জলে জলতলে আকাশে কোথাও সে অসাধ্যকে স্বীকার করলে না, অন্নজগতে অসীমকে নিরন্তর লাভ করতে লাগ্‌ল।

কিন্তু অপরদিকে আমাদের একথা মনে হতে পারে যে মানুষ তো নানা তপস্যার দ্বারা অন্নজগতের ঐশ্বর্য্যকে লাভ করতে থাক্‌ল কিন্তু তাতে হল কি? এর ফলে কি ধনী নির্ধনকে কষ্ট দিচ্ছে না, শক্তিমান্‌ দুর্ব্বলকে আঘাত করছে না? পৃথিবী কি কলকারখানায় কণ্টকিত কলুষিত হয়ে উঠচে না, যন্ত্র কি মানুষের লোভের বাহন ক্রোধের বাহন হয়ে মানুষকে দেশে দেশে দলিত করচে না? তা তো করচে। তার কারণ, অন্নই ব্রহ্ম এই কথাটা তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। শিষ্যের প্রশ্নের শেষ উত্তরটাকেও আমাদের জানতে হবে—সে হচ্ছে, আনন্দই ব্রহ্ম। সেই আনন্দ লোকের ব্রহ্মকে সাধনা করতে হলে তারো ত কোথাও সীমা মানলে চলবে না। এই সাধনার বাধা যে আমাদের রিপু। সেই রিপুর সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করে তাকে অন্নবন্ন ঠেকিয়ে রাখাই ত আমাদের তপস্যা নয়,—তার সম্বন্ধেও অসাধ্য সাধন করতে হবে—তাকে সমূলে বিনাশ করা যায় এই শ্রদ্ধা মনে রাখতে হবে—সেই শ্রদ্ধার অসীমতাকে মেনে নিয়ে ফলের অসীমতাকে পাবার সাধনা করতে হবে।

আনন্দ ব্রহ্মের সাধনা কি অন্নব্রহ্মের সাধনাকে অস্বীকার করে তবেই সম্ভবপর হয়? সত্যের এক দিককে বাদ দিলেই কি সত্যের অন্যদিককে লাভ করা যায়? অন্নলোকের ব্রহ্ম এবং আনন্দলোকের ব্রহ্ম এই উভয়কে একত্র করে জানলে তবেই কি মানুষ পরিপূর্ণ সত্যকে লাভ করে না? এবং সত্যের এই পরিপূর্ণতা ছাড়া আর কিছুতেই কি বাঁচাতে পারে? ভারতবর্ষ অনন্তকে আনন্দ লোকেই উপলব্ধি করতে চেয়েচে, তাতে অন্নলোকে তার পরাভব ঘটেচে, সে আজ রোগে দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে মরতে বসেচে। য়ুরোপ অনন্ত অন্নলোকে সাধন করতে প্রবৃত্ত,—জলে স্থলে আকাশে তার অধিকার বিস্তৃত হচ্ছে—বিশ্বের শক্তিরূপকে প্রতিদিনই সে বিরাটতর করে জানতে পারচে। এমন কিছু আশ্চর্য্য নয় যে একদিন আমরা খবরের কাগজ খুলেই জানতে পারব যে পশ্চিমের মনীষীদের সাধনার ফলে পরমাণুর মধ্যে যে বন্দিনী শক্তি ছিল সে কারামুক্ত হয়ে মানুষের তপস্যার সহচরী হল। কিন্তু বস্তুবিশ্বকে জয় করবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরের দুঃখ তো ঘুচল না, শান্তি লাভ তো হল না। আধিভৌতিক জগতে বাইরের বাধাকে অপসারিত করে মানুষ যেমন বস্তু-বাধা থেকে মুক্তিসুখ অনুভব করছে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে অন্তরের বাধাকে দূর করে দিয়ে ব্রহ্মের আনন্দরূপ উপলব্ধি করতে হবে, তবেই ত সকল মানসিক অশান্তির ও অবসাদের অবসান হতে পারবে। আমাদের তখনই যথার্থ ব্রতের পারণ দিন আসবে যে দিন বাহিরে অন্নের ভাণ্ডার ও অন্তরে আনন্দের ভাণ্ডার মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের বাহ্য অন্তর দুইস্বরূপকে পূর্ণ করে দেখাবে।

সমস্ত মানবের যজ্ঞকে আমরা যদি আজ এক ক্ষেত্রে দেখি তা হলে জানতে পারব যে, এই এক যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ

অংশের নির্ব্বাহ ভার বিশেষ ভাবে এক এক জাতির উপর রয়েচে। সেই অংশগুলিকে যতক্ষণ অমরা মিলিত করে না দেখতে পারি ততক্ষণ তার অসম্পূর্ণতা আমাদের আঘাত করে। কিন্তু যখন তাদের আমরা সজ্ঞানে মিলিয়ে দেখি তখন আমাদের অগৌরব দূরে যায়। আনন্দই ব্রহ্ম এই মন্ত্রই যদি ভারতের সাধন মন্ত্র সত্য হয় তাহলে পৃথিবীতে এই অমৃতরসের পরিবেষণ ভার কি ভারতবর্ষকে নিতে হবে না? আলোক শিখার পরিচয় এই, যে তার দীপ্তি তার প্রদীপকে ছাড়িয়ে চলে যায়, তেমনি অমৃতের পরিচয় এই যে, সে তার আপন আধারের মধ্যে কিছুতেই বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। ভারতবর্ষ অমৃতের অধিকারী এই গর্ব্বোক্তি যদি সত্য হয় তবে এই অধিকারকে সমস্ত মানুষের অধিকার করে তোলবার চেষ্টাতেই সেই গর্ব্ব সার্থক হবে।

বুদ্ধদেব যখন তপস্যায় ক্লান্ত, তখন সুজাতা পায়সান্ন প্রস্তুত করে তাঁর ক্লান্তি দূর করেছিলেন। আজ পশ্চিমের তাপসদের আত্মার ক্ষুধা মেটাবার অন্ন কি আমরা সংগ্রহ করেচি? তাদের তপস্যাও যে আমাদের তপস্যা। পশ্চিমের সাধনাকে আমার বলে স্বীকার করব না—একথা বলবার মত মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা আর নেই। আমাদের দিক থেকে তাকে পূর্ণ করে তুলতে হবে এই কথাই আমাদের বলবার কথা। পশ্চিম তার অন্নব্রহ্মের সাধনায় অভাবনীয় শক্তির অধিকারী হয়ে উঠ্‌চে—আমরা আনন্দ ব্রহ্মের সাধনা যদি নিষ্ঠাপূর্ব্বক করি, রিপুর বাধাগুলিকে যদি মূল ঘেঁসে উচ্ছেদ করতে পারি তাহলে আধ্যাত্মলোকে মানুষের জন্যে যে পরমাশ্চর্য্য সম্পদের উদ্ঘাটন হতে পারে কোনো খানেই তার সীমা নেই। কেন না ব্রহ্মের "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়াচ"—জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার স্বাভাবিকতাই চচ্ছে অনন্ত স্বরূপের ধর্ম্ম—বাহ্য প্রকৃতিতে যেমন অনন্তের সাধনায় এই জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম্মের স্বাভাবিক উৎসকে সন্ধান ক'রে বাহির করা হচ্ছে, আমাদের অন্তর প্রকৃতিতেও তেমনি ব্রহ্মের সাধনায় এই জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম্মের স্বাভাবিক উৎসকে সন্ধান করে পাওয়া যায়। রিপুর আক্রমণে ও আবরণেই এই স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে, তখন আমাদের কর্ম্ম ভয় ক্রোধ লোভের উত্তেজনাতেই কৃত হয়, সুতরাং সেই কর্ম্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে প্রকাশ করি না—সেই কর্ম্মের মধ্যে চিরদাসত্বের গ্লানি—সেই কর্ম্ম কিছুতেই আমাদের আনন্দের মধ্যে নিয়ে যায় না। যতই না নিয়ে যায় ততই বিরোধ বিদ্বেষ অশান্তি। তাই উপনিষৎ বলেচেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌," আনন্দ যদি ভোগ করতে চাও তবে ত্যাগ কর, লোভ কোরো না।

হে ভারতবর্ষের তপস্বী, অন্তরকে পবিত্র কর, অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত হও। "ভূমৈব সুখং" এই সত্যকে গ্রহণ কর। সেই ভূমা সকল দেশকে গ্রহণ করে' সকল দেশকে অতিক্রম করে' সকল মানুষের ইতিহাসকে অধিকার করে বিরাজ করেন। "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ"—তিনি বিশ্বের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত, "সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত"—তিনি শুভবুদ্ধিদ্বারা আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

# "বলাকা"

### ( ব্যাখ্যা ও আলোচনা )

( বিশ্বভারতীর সাহিত্যক্লাসে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যাপনার সময়ে গৃহীত নোট হইতে )

## ভূমিকা

এই কবিতাগুলি প্রথমে "সবুজপত্রে"র তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে ৪।৫ টি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখে ছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে

ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিক ভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে "বলাকা" বলা হয়েছে। হংস শ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।

## বলাকা (১)

এই কবিতার মূলগত ভাবটি এই—যৌবনের যে একটি প্রবলতা সে সমস্তকে ভেঙ্গে পরখ করে প্রত্যক্ষ করে দেখতে চায়। শাস্ত্র বাক্য আপ্তবাক্য এ সব তার জন্য নয়। প্রবীনতা চায় যে কোনো মতে পরের অভিজ্ঞতার বলে বিঘ্ন ব্যথাকে এড়িয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তারা আবার তাদের প্রবীনতার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বাঁধা বুলি না মেনে প্রত্যক্ষের দ্বারা সব কিছু অনুভব করার মধ্যে বেদনা আছে। কারণ তাতে পরের অভিজ্ঞতার কর্ণধারত্ব নেই এবং বাঁধাপথের নির্বিঘ্নতাও নেই—কিন্তু এই তো যৌবনের ধর্ম্ম।

যৌবনই বিশ্বের ধর্ম্ম, জরাটা মিথ্যা। যৌবন জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।

এই কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লিখিত।

## বলাকা (২)

"সর্ব্বনেশে" একটি রূপক বা Symbol নয়। অন্তরে বা বাহিরে যদি সর্ব্বনেশে আসে তবে তার কেমনতর অভ্যর্থনা হবে? গ্রহণ না পলায়ন? এটাই চিন্তনীয় ছিল। দুঃখ-কালেই অন্তরের ও সমাজের প্রচ্ছন্ন সম্পদ দেখা দেয়। দুঃখের দিন ছাড়া অপ্রত্যক্ষ অন্তর সম্পদ আপনাকে প্রকাশ করে না। গত যুদ্ধকালে কত আখ্যাতনামা হীন দীন জন নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়েছে এবং নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করেচে।

(৩য় শ্লোক) জ্ঞাত বস্তুর অভ্যাস অজ্ঞাতের ডাককে বাধা দেয়। আজ দুঃখের মরণের আহ্বানে নিরুদ্দেশের আহ্বানে জ্ঞাতঅভ্যাসের মূলচ্ছেদ হল। অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় (মূল)কেই "ভিত্" বলা হয়েছে। ব্যক্তির ও মানবের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ আহ্বানের যুগ আছে। তখন বাহির ও ঘরের বিরোধ বাধে।

(৫ম শ্লোক) তরুণী যেমন পিতার ঘর ছেড়ে পতিগৃহে গিয়ে নিজ যৌবনের সার্থকতা লাভ করে তেমনি আজ আমার অন্তরাত্মাকে পরিচিত ভূমি ছেড়ে অজানার দিকে আনন্দ যাত্রা করতে হবে। এতে দুঃখ আছে, তবু এ সর্ব্বনাশ নয়, কারণ এ পতিগৃহে যাত্রার মত।

[আলোচনা। ইয়োরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্ত্তা এই কবিতা লেখবার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে যেন এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল। আমার যেন একটা নূতন অভিযান, adventure আরম্ভ হবে। হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করে সর্ব্বনেশের জন্য অর্ঘ্য রচনা করতে হবে। কেবল মতামত নয়, প্রাচীন মতামত সংস্কার প্রভৃতি যা কিছু প্রিয় সব পিতৃগৃহের মত ত্যাগ করে নব রক্তপট্টাম্বরে পতিকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ সর্ব্বনাশের যে যুগসন্ধিক্ষণ এসেছে।]

## বলাকা (৩)

৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২৮

"আমরা চলি সমুখ পানে"—

এই কবিতায় আমার আগের দুটি কবিতার ধারাটিই চলে এসেছে। 'বলাকার' প্রথম কবিতাতে এই ভাবটিই ছিল—যৌবনের জয়ধ্বনির কথা, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পূর্ব্ব-

যুগের গণ্ডী ভেঙে ফেলে মুক্তি লাভ করে নূতন করে জীবনকে গড়ে তোলার কথা।

প্রতিযুগের যুবাদের উপর এই ভারটি রয়েছে, তারাই প্রলয়ের ভিতর দিয়ে চিরন্তন সত্যের নূতন পরিচয়কে লাভ করবে। এবারকার যে নবযুগের কথা বলা হয়েছে, এযুগ সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষকে যে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেই অন্ধকার রাত্রি অবসান প্রায় আর নবযুগের প্রভাত আসন্ন একথা আমার মনে হয়েছিল, সেই ভাবের আবেগে এই কবিতাগুলি লেখা। মনে হতে পারে বুঝি লাইন মিলিয়ে কতকগুলি কবিতা লেখবার উদ্যোগেই এগুলি লেখা হয়েছে, কিন্তু তা নয় আমার ভিতরে একটা তাগিদ এসেছিল তারই প্রেরণায় এগুলি রচিত হয়। অনেক সময়ে কোনো কোনো রচনাকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রকাশ বলে আপাতত মনে হয়, পরে দেখা যায় তা ঠিক নয়। ভিতরে ভিতরে একটা বিশ্বব্যাপী সত্যের তাগিদ নানা ছলে নিজেকে প্রকাশের উপলক্ষ্য খোঁজে। নিজের জীবনের যে ঘটনাগুলি নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অঙ্গীভূত সে-গুলোকে উপকরণরূপে ব্যবহার করে' মনের কোন্ একটা নিগূঢ় অনুভূতি নিজেকে ব্যক্ত করে।

"অন্তর্য্যামী" কবিতাতে ও সেই কথাই বলেছি। তাতে লিখেছি যে, হাটে যাবার সঙ্কল্প করে রাস্তায় বেরিয়েছিলুম, শেষে দেখি নিজের অগোচরে সেই সঙ্কল্প কোন্ এক অজানার মধ্যে যাবার উপলক্ষ্য হয়ে উঠ্‌ল। এযেন তার-হীন টেলিগ্রাফযন্ত্রে কান পেতে আছি ঘরের খবর পাবার জন্যে—হঠাৎ দেখি সেই ঘরের খবরকে ছাপিয়ে দিয়ে একটা আকাশের বার্ত্তা এসে হাজির। বলাকার এই কবিতাগুলিকে সেই রকম কোন একটা উড়ো পথে কবির মনে পৃথিবীর কোন্ একটা গভীর বেদনার বার্ত্তা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(কবিতা পাঠ)

—এই কবিতায় ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের কথা নেই কিন্তু এতে সমস্ত মানুষের সাধনার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতকে সন্ধান করবার জন্য পৃথিবী জুড়ে প্রলয় ব্যাপার চলছে। একদল গতযুগের আইডিয়ালকে আঁকড়ে ধরে, তাকেই বিশ্বাস করে পড়ে আছে। তারা পুরাকালকে আশ্রয় করেছে বলে যে তাদের বিপদ নেই তা নয়, ভাবী কালকে বাধা দিতে গিয়ে তাদেরও লড়তে হয়। কার্য্যত: কিছু না করলেও তারাই বেশী লড়াই করে। তাই আজ যারা পূর্ব্বকার ন্যাশানালিজিমের ভাবকে আঁকড়ে রয়েছে তারাও ঘরছাড়া, তাদের আশ্রয় নেই। তারা স্বাজাত্যের অপদেবতার মন্দিরটাকে রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পূর্ব্বতন ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ মানুষকে কম দুঃখ দেয় না। এই একটি দল ছাড়া আর এক দল আছে যারা নবযুগের বাণী বহন করছে। তারা ঘরছাড়ার দল। নৈরাশ্যের তাড়নায় তারা বার হয় নি। আলোকের পথে তাদের অভিযান, বাধা বন্ধ ছিন্ন করে নূতন যুগের অভিমুখে তাদের অভিসার যাত্রা। সেই যাত্রার মুখে তাদের বিঘ্ন বিপদ রক্তপাত সহ্য করতে হয়েছে।

যারা তামসিকতায় জড়িত হয়ে পূর্ব্বের সংস্কারকে বিশ্বাস করছে তারা ভুলে যায় যে অনেক আগে তাদেরও এই ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়ে একটা স্থিতির মধ্যে আসতে হয়েছে। তারা মনে করে যে তারা সত্যের চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে, এই চিরকেলে পথেই মঙ্গল হবে, তাই অন্যকে তারা বাধা দেয়। একটি ভৌগোলিক উপদেবতার কাছে তারা নরবলি দিয়েছে, তারা মানুষের নারায়ণকে অবজ্ঞা করছে। এই স্বাজাত্যাভিমানীদের সঙ্গে নবযুগের দলের বিরোধ চলছে। যারা উদার ও সর্ব্বজনীন আইডি-য়ালকে বিশ্বাস করে তারা আজ দুঃখ পাচ্ছে, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করছে। কিন্তু তাদের এই নিন্দা দুঃখ অপ-মানের ভিতর দিয়ে আপন বিশ্বাসকে অবিচলিত রেখে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

এই ভাবটিই আমার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে এসেছিল এবং আমার এই কবিতায় তা প্রকাশ করতে চেয়েছি। দেশের যে

গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয় লাভ করে আমরা তাকে ঘর মনে করেছিলাম, সেই সীমারেখা ত্যাগ করে যারা ঘরছাড়া হয়েছে তারাই ভবিষ্যতের মহা যুগের যাত্রী; সম্মুখের বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে তাদের অগ্রসর হতে হবে।

## বলাকা (৪)

"তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে"—

মানুষকে মিলিত করবার নবযুগকে আহ্বান করবার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধূলায় পড়ে রয়েছে। এ'কে গ্রহণ করবার মধ্যে অনেক দুঃখ আছে।

ব্যক্তিগত যে কথাটুকু এই কবিতার মধ্যে আছে, তাকে ছাড়িয়ে আমি যে ভাবটা প্রকাশ করতে চেয়েছি তা এই;— একটা সময় এসেছিল যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল, জীবনের কাজ তো সারা হয়ে গেছে, এখন পূজা অর্চনার দ্বারা শান্তি পাবার সময় এসেছে এখন অন্য কোনো কাজের দাবী নেই। সে সময়ে এই পূজাকেই তখনকার একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবী এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ ত বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোট গণ্ডী থেকে বড় রাস্তায় ত ডাকতে হবে। এখন বললে চলবে না যে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাই। আমার আরত্রিক পূজার কি সময় আছে? তবে কি জীবনের সন্ধ্যায় রজনীগন্ধার শুভ্র স্নিগ্ধ বিকাশ হবে না তবে কি এখন রক্তজবার মালা চাই? মনে করলেম বুঝি জীবনের শেষ বোঝাপড়া এবার করে নিতে হবে, কিন্তু নীরব শঙ্খ আমায় ইঙ্গিত করলে মানুষকে কোন বিরাট যজ্ঞে ডাক দিবার জন্য তাকে ধ্বনিত করতে হবে!

এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ সুরু হতে ছমাস বাকী আছে। তার পর শঙ্খ বেজে উঠেছে;— ঔদ্ধত্যে হউক, ভয়ে হউক নির্ভয়ে হউক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্ব্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষে হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব এখনো আরম্ভ হয় নি। আরো ভাঙবে, সঙ্কীর্ণ বেড়া ভেঙ্গে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে, তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে কাল সর্ব্বজাতির লোকের। চাক ভাঙ্গা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমারোলাঁ, বাট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সার্ব্বজাতিক কল্যাণের কথা বল্‌তে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্চে, বলছে, প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই! পাখীর দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

আমি কিছু দিন থেকে এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের এই যুগ সমস্ত মানবের পক্ষে এক মহাযুগ, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসে নি। একটা ভাবী কাল আসছে যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে। মন্থনে যেমন নবনী ভেসে ওঠে তেমনি বিশ্বের বিধাতার জগৎব্যাপী মন্থন ব্যাপারে সাধকেরা উঠে পড়েছেন। এই বিবাগীর দলের বেরিয়ে পড়ার প্রয়োজন ছিল। বিধাতা এমনি করে ঠেলা মেরে এদের বার করে দেন, এঁরা সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টন থেকে সরে গিয়ে মুক্তিলাভ করেন।

পুরাণের কাহিনীতে আছে যে দেবাসুরের মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, রাহুকেতু তা পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল, অযোগ্যেরা অমৃতে ভাগ বসাতে চেয়েছিল, অমৃত চুরি করতে চেয়েছিল। প্রাচীন কালের সে লোভ এখনো রয়েছে, এখনো স্বার্থের ভোগে লাগাবার জন্য লুব্ধ মন অমৃতকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করবে। লীগ অফ্ নেশনে যে সার্ব্বজাতিক উদ্যোগ হচ্ছে, বিশ্বের রাহু কেতুরা

তার আইডিয়ালিজিমকে নিজের ভাগে নেবার জন্য বসে আছে। এমনি করে মহাযুদ্ধের সময়ে স্বার্থের জন্য যারা লড়েছিল তারা তাকে ধর্ম্মযুদ্ধের আখ্যা দিয়ে কথার ছলনা করেছিল। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা যখন ভঙ্গ করা হল তখন যেমন যুবকের দল তাকে রক্ষা করতে অস্ত্রধারণ করেছিল, তেমনি বুড়ো রাষ্ট্রনীতিকের দল স্বার্থ সাধনের হিসাব কষে এতে যোগ দান করেছিল।

যে বিশ্বব্যাপী প্রলয় মানবের চিত্ত সাগরকে মথিত করেছে তাতে এই দুই বিরুদ্ধ দলের উদ্ভব হয়েছে। অমৃত গরল দুই ই উত্থিত হচ্ছে। এই বিষ মানুষের বড় পাপকে বৃহৎ আকারে দেখিয়ে দেবে। দেবতাদের ভোগের অমৃত নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে, স্বাজাত্যের স্বার্থকে বাড়াবার জন্য চেষ্টা হবে কিন্তু শেষে অসুরের দলই পরাজিত হবে, জয় হবে দেবতাদের, আর শিব আসবেন সমস্ত হলাহল নিঃশেষিত করতে।

আমাদের অনুভব করতে হবে যে বিধাতা ছোট জায়গার মধ্যে কাজ করেন না। একটা বিরাট বিশ্বব্যাপার চলছে, পৃথিবী জুড়ে দৈত্যাসুরে মন্থন চলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষের আমরা কোন্ দিক ধরি? দেবতাদের দিক না দৈত্যের দিক? কিন্তু যে পক্ষেই ধরি তাতে কিছু আসে যায় না। দেবতা যারা তারাই মন্থন শেষে অমৃত পাবার অধিকারী হবে। যারা গৃধ্নুতার বশে লালায়িত হয়ে ভোগ করবার জন্য ছুটবে তাদের ভাগ্যে অমৃত নেই।

কবি নিজের কবিতা যখন ব্যাখ্যা করে তখন তার কথা-রই যে প্রামাণ্য আছে তা নয়, কবিতা লেখা হয়ে গেলে সে অন্য পাঠকদের সমশ্রেণীয়। সে কেবল তার হৃদয়াবেগের ইতিহাসটার কথা বলতে পারে, কারণ রচনাকালের সমস্ত আনুষঙ্গিকতার সেই সব চেয়ে বড় সাক্ষী। কিন্তু কবিতার মর্ম্মগত অর্থ অপরেরও আবিষ্কার করবার ও ব্যাখ্যা করবার অধিকার আছে।

"বলাকা"-রচনাকালে যে ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করে-ছিল এখনো সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্য্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। বুকের মাঝে যে আলোড়ন হ'ল তার কি সার্ব্বজাতিক অভিপ্রায় আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে সে চিন্তা আমার মনে বর্ত্তমান ছিল। আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি, একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি, সে ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানেনি। "বলাকায়" আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছু দিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজা স্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

---

# আলোচনা

## গ্রহণ

জাপান একদিন ইউরোপকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল বলেছিল, আমরা তোমাদের জমি দেবনা, ঘরবাড়ী করতে দেবনা, আমাদের দেশে নামতে দেবনা তোমাদের আমরা চাই না! কিন্তু 'চাইনা' বললে কি হয়, 'কমলি নেহি ছোড়তি হায়!' এই-মস্ত ভুল জাপান যেদিন উপলব্ধি করে-ছিল সেদিন তাকে বলতে হয়েছিল, হাঁ, তোমাদেরই আমরা চাই। তখন তারা যে বিদ্যায় ইউরোপ সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছে সেই বিদ্যা গ্রহণ করেছিল।

আজ প্রাচ্য মহাদেশে যে কোনো দেশ য়ুরোপের বিদ্যাকে যে পরিমাণে অগ্রাহ্য করচে তারা সেই পরিমাণেই য়ুরোপের কাছে পরাভূত হচ্চে। বিদ্যা জিনিষের প্রতিষ্ঠা সত্যে, কোন দেশবিশেষে নয়—এবং বিশেষ সত্যের উৎপত্তি যে-দেশেই হোক্, তা সমস্ত দেশেরই সম্পত্তি। তাকে অস্বীকার করা

আর কিছু নয় সত্যের প্রতি নিজের অধিকারকে অঙ্গীকার করা।

য়ুরোপীয় বিদ্যা বাইরের জিনিস নয় এ কেবল সংবাদের সঞ্চয় বা পড়া মুখস্থ নয়।

এর মধ্যে একটি মনের সাধনা আছে—সেই সাধনার মনের সঙ্গে বিশ্বের যে যোগ হয় সেই যোগে মন শক্তি পায়। বুদ্ধি মুক্তি লাভ করে। সত্যকে গ্রহণ সম্বন্ধে মনের সুর যদি ঠিকমত বাঁধা হয় তাহ'লে মন চরিতার্থতা লাভ করে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চ্চা কেবল জ্ঞান লাভ করা নয়, সে হচ্ছে মনটাকেই তৈরি করা—মন তৈরি হলে মানুষ বিশ্বে জয়ী হয় নইলে পদে পদে তার পরাভব ঘটে।

যেমন আধ্যাত্মিক রাজ্যে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিল হ'লেই মুক্তি তেমনি আধিভৌতিক রাজ্যে বিশ্বের নিয়মের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির যে সামঞ্জস্য আছে সেটা লাভ হলেই আমাদের মুক্তি। আমাদের বুদ্ধি যখন নিজের অধিকারের মধ্যে বিশ্বকে পায় তখনই অশক্তি থেকে আতঙ্ক থেকে পর-পরায়ণতা থেকে আমরা মুক্তি পাই।

মানুষের যেমন আত্মা আছে মানুষের তেমনি দেহমনও আছে, সেকথা ত উড়িয়ে দিলে চলবেনা। আত্মিক রাজ্যে আমরা অমৃতের অধিকার লাভ করব, কিন্তু সেই সঙ্গে আধিভৌতিক রাজ্যে আমরা মর্ত্ত্যলোকের অধিকার লাভ করব এই হচ্ছে মানুষের সাধনার সম্পূর্ণতা।

ভগবান আমাদের মহা অধিকার দিয়েছেন, তিনি বলে-ছেন, 'কারুর কাছে মাথা নীচু করবে না, আমার কাছেও না। সমস্ত বস্তু-বিশ্বকে তুমি আপনার হাতে নাও। আমার এই সম্পত্তি তোমারই রইল, তুমি একে চালাও।' তাঁর এই মহা অধিকারের দলিলকে আমাদের মানতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। তিনি যদি আমাদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতেন তবে তো diarchy দ্বৈরাজ্য হ'ত, কিন্তু তিনি কখনো তা করেন নি।

"যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"

তিনি বিশ্বের সমস্ত অর্থের যে বিধান করেছেন, তা যথাযথ, সে বিধানে খামখেয়ালি নেই, তা নিত্যকালের। এতে দাও বছরের পরীক্ষার ব্যাপার নেই। যে তা জেনেছে সেই ধনে ধান্যে বড় হয়েছে। এই নিত্যকালের সাধারণ বিধি কেউ আড়াল করে বসে নেই। পশ্চিম দেশের কোনো দানব এর উপর চেপে বসে নেই। পাশ্চাত্যবাসীদের তাড়াতে পারলেই সে বিধি করায়ত্ত হবে না, বিধাতার দলিল যেদিন স্বীকার করব এদের আপনা থেকেই চলে যেতে হবে, দাঁড়াবার আর যো থাকবে না। ভারত যখন বিশ্বসিংহাসনের কাছে দাঁড়িয়ে একযোগে বলতে পারবে, 'আমার বিশ্বরাজ্যে অধিকার আছে'—তখন কেউ তাঁকে ঠেকাবে না। কিন্তু যতদিন এই কথা বলবার শক্তি সঞ্চিত না হয়, ততদিন আমরা পরাভূত হব।

পাথরের খণ্ড সহস্র বৎসর ধরে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, সে কিছু নিতে পারে না। কিন্তু চিত্ত যেখানে সজাগ সেখানে তার প্রধান লক্ষণ এই যে তার গ্রহণ করবার শক্তি আছে কেবল বর্জ্জন করবার নয়। বাঙলার ইতিহাসেও আমরা এটাই দেখেছি।

বাঙলা পলিমাটির দেশ। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, তাই ধনে ধান্যে ভরে ওঠে। বাঙলার চিত্তভূমিও সেইরকম উর্ব্বরা, উৎপাদনশীল। নানা বীজ এখানে পড়ে অঙ্কুরিত হয়। একথা কি আজ আমরা বলব না যে পাশ্চাত্যবিদ্যার বীজও এখানে পড়ে ফসল ফলাবে। আমাদের মাটিতে সব ফসলই ফলে এ কথা পৃথিবীতে সকল বড় জাতিই বলতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু যারা বর্ব্বর তারাই নেয় না। আফ্রিকার বর্ব্বরেরা কিছু নেয়ও না, দেয়ও না।

---

# চীনের গোষ্ঠী প্রথা

কিছু কাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল চীনদেশের গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন, সম্প্রতি লণ্ডনের নেশন কাগজে চীনের গোষ্ঠী প্রথার যে বিবরণ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের দেশের প্রথার সঙ্গে তার মিল দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তিনি বলেন—

আমি যখন পেকিংএ ছিলাম সেই সময়ে এক সাধারণ বৃদ্ধ মহিলা মারা যান। তার অব্যবহিত পরেই তাঁর কন্যা মাতৃ-শোকে প্রাণত্যাগ করেন। পিতামাতার শোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করা সেখানে একটা মস্ত গৌরবের বিষয়, যে ব্যক্তি এইরূপ মরে কেবল সে নয় তার কর্ম্মে সমস্ত গোষ্ঠী গৌরবান্বিত হয়। এইরূপ পিতৃভক্তির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেখানে তোরণ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত আছে। যাই হোক্ উল্লিখিত ঘটনার পর সমাজের হুকুম হইল এমন মা ও মেয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন করিতে হইবে। তার খরচ মিটাইতে গিয়া মধ্যবিত্ত অবস্থার ছেলে কয়েকটিকে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রিকস কুলি হইতে হইল।

এই গোষ্ঠী প্রথার প্রভাবে চীনের রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে সততার অভাব দেখা যায়, কোনো লোক যখন কোনো চাকরি পায় তখন তার গোষ্ঠীভক্তি বলে "তোমার চাকরির জোরে তোমার আত্মীয় স্বজনকে ধনী কর," তার মাহিনার দ্বারা এই লম্বা ফরমাস মেটে না। কাজেই তখন তাকে অসাধু উপায় অবলম্বন করিতে হয়। আর যদি সে তা না করে তাহা হইলে অযোগ্য ছেলে বা অযোগ্য ভাই বলিয়া সমাজে তার নিন্দা রটে। অনেক বিদেশ প্রত্যাগত চীন ছাত্র পশ্চিমের আদর্শ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু শেষে তাহারাও এই দেশব্যাপী কুপ্রথার জালে আটক পড়িয়াছে।

গোষ্ঠীপ্রথাকে খুব পাকা করিতে হইলে স্ত্রীলোকের দাসত্বকেও পাকা করিতে হয়। চীনে সে কাজটি বেশ ভালো করিয়াই হইয়াছে। প্রাচীন ধরনের চীনে মেয়ে স্বামীর নিকট-আত্মীয় ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে বাহির হইতে পারেন না। তবে তাঁরা দাসী সঙ্গে লইয়া বাজার করিতে বা অন্য মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন। বিবাহের পর স্ত্রী শ্বশুরের বাড়ীতেই বাস করেন এবং শাশুড়ির দাসীর স্থান অধিকার করেন। শাশুড়ি চাকর বাকরের মুখে বধুর যে কোনো কুৎসা শোনেন তাহাই বিশ্বাস করেন এবং তার অজুহাতে বধুকে আরো দাবাইয়া রাখেন। স্বামী দুশ্চরিত্র হইলে তাহাতে স্ত্রীর কোনো অভিযোগ থাকিতে পারে ইহা কেহ স্বীকার করে না কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর মৃত্যুর পরেও আবার বিবাহ করে তাহা হইলে তার নিন্দা রটে। বিবাহের কথাবার্ত্তা বর কন্যার পিতামাতারাই ঠিকঠাক করেন, বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না। অনেক সময়ে শৈশবের বাগ্‌দান (betrothal) হইয়া থাকে। ইহা বিবাহের চেয়েও কড়া, কারণ কতকগুলি কারণে দম্পতির ছাড়াছাড়ির নিয়ম চীনে প্রচলিত আছে কিন্তু এই বাগ্‌দান ভঙ্গ করিবার কোনো নিয়ম নাই।

এ সমস্তই অবশ্য খুব খারাপ, নবীন চীন এর বিরুদ্ধে খুব জোরের সঙ্গেই বিদ্রোহ করিতেছে। এমন অনেক দম্পতির সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে যাঁহারা নিজেদের বাড়ীতেই আছেন, সেখানে স্ত্রীর স্বাধীনতা ইংরেজ স্ত্রীর চেয়ে কম নয়। অনেক মেয়ে আজকাল ইস্কুলে এবং কলেজে নতুন ধরণে শিক্ষিত হইতেছেন। পেকিং এর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁদের প্রবেশের কোনো বাধা নাই সেখানে আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেকগুলি মেয়ে আসিতেন, এই সব শিক্ষিত মেয়েরা স্বভাবতই প্রাচীন ধরণের বিবাহে বদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক। যে সব শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে তাঁহারাও এ বিষয়ে মেয়েদের সঙ্গে এক মত।

পেকিং এ কয়েকটি অধ্যাপক ও ভাল ছেলেদের লইয়া অধ্যাপক রাসেল একটি আলোচনা-সমিতি গঠন করিয়া

ছিলেন, সেখানে প্রথমে কিছুকাল দর্শনের আলোচনার পর সামাজিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। সামাজিক বিষয়েই ছেলেদের অনুরাগ বেশী ছিল। একদিন সংঘবাদ এবং বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে খুব উত্তেজিত আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে অধিকাংশ ছেলেরা মত প্রকাশ করে যে কালই চীন সংঘবাদী (Communist) হইতে পারে আর তার সংঘবাদী হওয়াই উচিত; কিন্তু গোষ্ঠী প্রথার দিনই আলোচনা সব চেয়ে জমিয়া ছিল। এই উপলক্ষে রাসেল বলিতেছেন "পরে আমি জানিতে পারিলাম যে জ্ঞানের এবং নীতির রাজ্যের নবীন পথিক এই সমস্ত যুবকদের মধ্যে অনেকেই অপরিচিত প্রাচীন অন্ধসংস্কারে পূর্ণ মেয়েদের সঙ্গে বিবাহিত বা বাগ্‌দত্ত। ইহাতে যে কঠিন নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বাহিরের লোকের পক্ষে শক্ত।"

চীন সমাজের যে চিত্র রাসেল আঁকিয়াছেন তাহার কালো দিকটার সঙ্গে হুবহু মিল আছে কিন্তু তার সাদা দিকটার সঙ্গে তেমন মিল আছে কি? নব্য চীন যেমন করিয়া প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে নব্য বাংলা তেমন করিতেছে কি? শিক্ষিত মেয়ে কি আমাদের সমাজে ডুমুর ফুলের মত দুর্লভ নয়? রাসেল যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা করিতে আসেন ত মেয়ে শ্রোতা বেশী হইবে কি? চীনের শিক্ষিত মেয়েদের মত আমাদের দেশের শিক্ষিতারাও হয়ত প্রাচীন ধরণের বিবাহ প্রথার বিরোধী কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের সম্বন্ধে নিশ্চয় সে কথা বলা যায় না কারণ যেপথে পিতা এবং পিতামহরা গেছেন তাঁহারা সেই বাঁধা রাস্তায় চোখ বুজিয়া চলিয়াছেন। রাসেল যদি কলিকাতায় তাঁর আলোচনা সমিতি স্থাপন করিতেন তাহা হইলে এ দেশের গোষ্ঠী প্রথার আলোচনার দিনই সব চেয়ে জমিত বটে, কিন্তু ভোটে প্রাচীনের দলই বোধ হয় জিতিত। তার প্রমাণ মেয়েদের ভোটের অধিকার সম্বন্ধে বাংলার ব্যবস্থাপক সভার আর সিভিল বিবাহ সম্বন্ধে ভারত ব্যবস্থাপক সভার রায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

## আশ্রম সংবাদ

১। গত ১লা বৈশাখ নববর্ষের সূর্য্যোদয়ে মন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে শান্তিনিকেতনের তেতালার ছাদ ফলাহাররত ছোট বড়দের কলধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। রাত্রেও ভোজের ব্যবস্থা ছিল।

২। ২রা বৈশাখ শাল বীথিকার দুইপার্শ্বে ছেলেরা আশ্রমবাজারের মেলা খুলিয়াছিল। বৈকালে দেখিতে দেখিতে কোন আলাউদ্দীনের প্রদীপের বলে ছেলেমেয়েদের কুড়িটী দোকান মহাসমারোহে ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিয়া দিল। ছেলেদের নিজেদের তৈয়ারী তালুয়া, গজা, সন্দেশ, লুচি, আলুর দম, "কাঁচালু", আচার, বিবিধ খেলনা, ছবি, বই, জামা, কাপড়, চা, মোরব্বা, প্রভৃতি কোন জিনিষের অভাবই বাজারে হইল না। বালকের দল দোকানে দোকানে গান গাহিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিল, ক্ষুদে ঝাড়্‌দার মুচি ভিক্ষুক প্রভৃতিও মেলায় অনেকগুলি দেখা গিয়াছিল। পূজনীয় গুরুদেব একটী কীট-দষ্ট বেল একটাকা দিয়া খরিদ করায় ফলের বাজার অত্যন্ত চড়িয়া যায়! ইহার লভ্যাংশ দোকানদারগণ আশ্রম সম্মিলনীর তহবিলে দিয়াছে।

৩। গত ৫ই রাত্রে আশ্রম সম্মিলনীর পূর্ণিমা অধিবেশন উপলক্ষ্যে আশ্রমের ছেলেরা একটি যাত্রা অভিনয় করেন। শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশী "বীরভূমেশ্বর পরাজয়" নামে একটী মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। গৌরপ্রাঙ্গনে আসর করিয়া সাজসজ্জা ঐক্যতানবাদন, ছোট বড় জুড়ীদের সঙ্গীত, যথারীতি হনুমান, মহাদেব, রামচন্দ্র, বীরমণি প্রভৃতির লোমহর্ষকর ভীষণ যুদ্ধ, প্রভৃতি সহ ইহার অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ কর—এই দলের অধিকারী ছিলেন। পূজনীয় গুরুদেব এবং দেশীয় বিদেশীয় অতিথি, অধ্যাপক নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী প্রভৃতি উপস্থিত দর্শকগণ এই অভিনয় দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

৪। আশ্রমের গ্রীষ্মাবকাশ ৩রা বৈশাখ হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত হইয়াছে।

৫। ছুটীর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য একটী সোনার ঘড়ি দেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়া শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই ঘড়িটী পাইয়াছেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

৬। Mr. Pearson অসুস্থতার জন্য ছয় মাসের বিদায় লইয়া কোটগড়ে গিয়া বাস করিতেছেন।

৭। আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় আশ্রমের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

৮। শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীর স্থানে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীরামদাস উকীল, প্রেসের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯। গত ২৫শে বৈশাখ পূজনীয় গুরুদেবের দ্বিষষ্টিতম জন্মোৎসব আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমস্থ বালিকারা এই উপলক্ষ্যে তাঁহার বাড়ীর অলিন্দগুলি আলপনা মালা ও মঙ্গলঘট দিয়া খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়া ছিলেন। প্রাতে, "সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে" গানটি গাহিতে গাহিতে গুরুদেবের বাড়ীতে আশ্রমবাসিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মাল্য চন্দন দিয়া প্রণাম করিলে তিনি তাঁহার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং আশ্রমের সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলেন। ইহার পর প্রতিমাদেবী রথীবাবু ও মীরাদেবী সকলকে প্রচুর পরিমাণে জলযোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। মধ্যাহ্নে আশ্রমের মহিলারা গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইছিলেন। বৈকালে তাঁহার বাটীতে আর একদফা নিমন্ত্রণ ছিল। আহারান্তে গুরুদেব, 'বর্ষশেষ', 'ঝুলন', 'পুরাতন ভৃত্য', 'সাধনা' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়া ছিলেন।

১০। আজকাল পূজনীয় গুরুদেব সন্ধ্যার সময়ে গল্পগুচ্ছ হইতে তাঁহার ছোট গল্প পড়িয়া শুনাইতেছেন। ইতিমধ্যে একবার 'মুক্তধারা' ও 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' সাহিত্য-সভায় পঠিত হইয়াছে।

১১। পুস্তকাগারের নূতন অংশের গঠনকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শমীন্দ্র ও সতীশ কুটীরের মধ্যকার দোতালার মঞ্চগৃহ শেষ হইয়াছে। বিদ্যালয় খুলিলে সেখানে ছেলেরা থাকিতে পারিবে।

---

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ } আষাঢ়, সন ১৩২৯ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## মন্দির

২০শে ফাল্গুন ১৩২৮।

এমন প্রশ্ন কখন কখন শোনা যায় যে ঈশ্বর যদিই বা থাকেন, তিনি ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জগৎ-ব্যাপার চালাচ্ছেন, তাঁকে উপাসনা করবার দরকার কি? এ প্রশ্ন একটা আকস্মিক কৌতূহলের প্রশ্ন নয়, আজকাল যে ভাবে যে প্রণালীতে জ্ঞানের আলোচনা করচে তাতে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক।

একদিন ছিল যখন মানুষ মনে করত ঈশ্বর একজন স্বেচ্ছাপরায়ণ রাজার মত, তাঁকে খুসী করতে পারলে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া যায়, নইলে কখন কি কারণে তিনি যে দণ্ড দেন তার ঠিকানা নেই। তখন মানুষ ভয়ে লোভে তাঁর উপাসনা করত। এখনও এমন অনেক লোক আছে যারা মকদ্দমায় জিতবে বা পরীক্ষায় পাশ হবে বা ধন পুত্র লাভ করবে বলে দেবতার স্তবস্তুতি করে,—তাঁর কাছে মানৎ রাখে। এদের মনে উপাসনা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নেই। তারা যেমন বিশেষ ধনীর কাছে বিশেষ গুণীর কাছে বিশেষ ফল-কামনায় প্রণতি স্বীকার করে, এদের দেবতার উপাসনাও তেমনি। কিন্তু দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যখন উদার হয়, যখন বলি তিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন বিশেষ আকার ধারণ করে নেই, তিনি সর্ব্বব্যাপী, এবং তাঁহার বিধান শাশ্বত, তখন বিশেষ করে' তাঁর উপাসনার দরকার কি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। অল্পদিন হ'ল এ প্রশ্ন আমার মনে উঠেছিল।

কিন্তু এ প্রশ্ন করতে হবে নিজেকে, নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে এর উত্তর সন্ধান করতে হবে। কোন্ আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য উপাসনা করি, আমরা ধনের উপাসনা, শক্তির উপাসনা ক'রে থাকি? কেন করি, কেননা এই যে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর আমি, ধনের যোগে, শক্তির যোগে এ নিজের সার্থকতা অনুভব করে। নিজের মধ্যে যে অভাবের পরিচয় পাই, এ অন্নময় জগতে সে অভাব মোচনের রূপ দেখতে পাই। তাই সে আমাকে আকর্ষণ করে। ভয়ের লোভের ঈর্ষার তাড়নায় এই শক্তিভাণ্ডারের দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরতে থাকি। এত দুঃখ এত প্রয়াস আমরা কখনই স্বীকার করতুম না যদি আমার এই লুব্ধ আমি এই ক্ষুব্ধ আমি এই সংসারের মধ্যে নিজের ছোট দিকের সত্যকে না দেখত।

কিন্তু মানুষ ত নিজেকে কেবলমাত্র ছোট বলে মেনে নিতে পারেনি, কেবলমাত্র অভাবের দিক থেকে নিজের পরিচয় পায়নি। তার নিজের মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য সে একান্ত স্বার্থসাধনের সংসারে যেন হাঁপিয়ে ওঠে ;—বলে এর থেকে মুক্তিই তার যথার্থ মুক্তি। তার নিজের ছোট পরিচয়ই যদি তার একমাত্র সত্য পরিচয় হ'ত তাহলে তার ত কোন দ্বিধা থাকত না, তাহলে স্বার্থ সাধনের ক্ষেত্র তার সুন্দর বলে বোধ হত। কিন্তু স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি তা হয়নি। সে নিজের একটা বড় পরিচয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই ক্ষুধা তৃষ্ণার সংসারকে নিন্দা করচে,—এমন কি, এ'কে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা যায় এত বড় সাহসের কথাও এর মনে হয়েচে। এর মানে হচ্চে এই যে, নিজের অভাবের পরিচয়কে অতিক্রম করে মানুষ নিজের ভাবের পরিচয়কে অনুভব করেচে। ক্ষুধাতৃষ্ণাকে সে তুচ্ছ করে, মৃত্যুকে সে অগ্রাহ্য করে, প্রাকৃতিক শক্তির তাড়নায় প্রকৃতির শাসন পালনকে সে অস্বীকার করে, মানুষের ইতিহাসে এইটে হচ্ছে সবচেয়ে বড় সত্য। এই সত্য যেখানে সেখানে ত অভাব মোচনের কোন কথাই ওঠে না,—সুতরাং সেখানে পশু বলি নেই, সেখানে মানৎ নেই, সেখানে বিশেষ কোন একটা বিধি অবলম্বন করে বিশেষ কোন বাহ্য ফললাভের আকাঙ্ক্ষাই থাকতে পারে না। সেখানে নিজের বড় পরিচয়কে উপলব্ধি করাই হচ্ছে উপাসনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

"আমার ছোট আমি অভাবের আমি যে ধনধান্যের ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে' বিচরণ করচে, ফলের ভিতরকার কীটের মত যাকে ভোগ করচে, সে যে তার চারদিকেই সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগোচর। আমার বড় আমির আমার ভাবের আমির আশ্রয়ক্ষেত্রকেও তার চেয়েও বড় করে নিশ্চিত করে যদি অনুভব করি তবেইতো সেই ছোটর বন্ধন থেকে যথার্থ মুক্তি পাই। যতক্ষণ সেই আশ্রয় অস্পষ্ট থাকবে ততক্ষণ দ্বিধায় আন্দোলিত হয়ে মরব। ততক্ষণ ছোটর দুঃসহ দাসত্ব আমাকে সংসারের পথে পথে তাড়না করতে থাকবে।

আমার বড় সত্যের আশ্রয়কে বড় করে উপলব্ধি করবার জন্যে তাঁকে নিঃসংশয়রূপে শ্রদ্ধা করবার জন্যই আমাদের উপাসনা। অভাবের আমি যে সংসারকে অবলম্বন করে থাকে সে যে আমাদের বাইরে—আর ভাবের আমি যে সংসারকে পেলে সার্থক, সে যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। সেই হৃদয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে উপাসনা করতে হয়—যাদের সেই উপাসনা সার্থক হয়—

হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি—

( হৃদ্‌গতসংশয়রহিতবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশমানরূপে যাঁরা এঁকে জানেন তাঁরা অমৃত হন )

আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের যে সংসার দেখ্‌চি আমাদের কাছে এর জোর খুব বেশী, এর সম্বন্ধে আমাদের সংশয় নেই—তাই এই সংসারের ধর্ম্ম প্রতি নিয়তই আমাদের দেহ মনকে অধিকার করচে। কিন্তু এই হ'ল মর্ত্ত্যধর্ম্ম, অভাবের জগতের ধর্ম্ম,—যেখান থেকে তার অমৃত-ধর্ম্ম আপন সত্যতা লাভ করে সেই ভাবের জগৎকে অন্তরের মধ্যে একান্ত নিঃসংশয়রূপে না জান্‌লে কিছুতেই শান্তি নেই; কারণ যে লাভ চরম সেইখানেই আমাদের শান্তি। সেই জন্যই তো প্রতিদিন বাহির হ'তে চারিদিক হতে মনকে প্রত্যাহরণ করে' অন্তরের মধ্যে তাকে স্থির করে' বলতে হয়—"আবিরাবীর্ম্ম এধি" হে প্রকাশ স্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক্। ধনমান প্রতাপের প্রত্যক্ষতা আমার চারিদিকে যে জাল বিস্তার করেছে তার থেকে আমাকে বাঁচাও। এ সমস্তর চেয়ে আমি যেন তোমাকে অধিক সত্য বলে' জানি। হৃদ্‌গতসংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারা তোমাকে অন্তরতমরূপে যেন নিত্য প্রকাশমান বলে' উপলব্ধি করি।"

মানুষের মধ্যে পনেরো আনা লোক বলে থাকে,—"হাঁ, হাঁ, তিনিই সত্য, ভাগবানই সব চেয়ে বড়, আমি যখন অমুক সম্প্রদায়ের লোক তখন একথা তো আমি স্বীকার করেই থাকি।" কিন্তু এ কি কথার কথা? সম্প্রদায়ই কি

সেই সত্য লোক? সম্প্রদায়ও যে ঐ বাহিরের সংসার ভুক্ত—তাইত সেখানেও লোভ ক্ষোভ ঈর্ষা বিবাদ-বিসম্বাদের অন্ত নেই, সেখানেও সত্যের নাম ধরে মিথ্যার আস্ফালন বাতাসকে কলুষিত করে রেখেছে। সেই জন্যেই আত্মার চরম উপাসনা সেই গভীর সেই নিভৃতে যেখানে স্থির হয়ে সে একান্ত বিশ্বাসে বলতে পারে—

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমোলোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥

---

# "বলাকা"

( ব্যাখ্যা ও আলোচনা )

বিশ্বভারতীর সাহিত্যক্লাশে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যাপনার সময় গৃহীত নোট হইতে )

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

## বলাকা (৫)

"মত্ত সাগর দিল পাড়ি"

এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যখন কোনো কবিতা মনেতে আকার ধারণ করে তখন তা কোনো নির্দ্দিষ্ট চিন্তাকে অনুসরণ করে না। যখন কোনো একটি ভাবের বীজ চিত্তক্ষেত্রে এসে পড়ে তখন তা ভিতরে গিয়ে আপনা হতে অঙ্কুরিত হয় এবং মানবপ্রকৃতির কতকগুলি খাদ্য পেয়ে সেই অঙ্কুর বিশেষ আকার গ্রহণ করে। তখন ভেবে ভেবে লিখে কবিতাকে আকার দেবার দরকার হয় না। কোনো দার্শনিকতত্ত্বের যেমন ব্যাখ্যা হয় তেমন করে এই কবিতাকে যথার্থভাবে বোঝানো কঠিন ব্যাপার। কোনো গাছ বিশেষ বীজ থেকে যে বিশেষ আকার পরিগ্রহ করে, তার সেই বিশেষত্বের মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য আছে কিন্তু সেই গোপন প্রক্রিয়াটি আমাদের জানা নেই।

সে সময়ে যে যুদ্ধ সুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ করছিল। তাকে আমার চিত্ত এই ভাবে দেখেছে—যুদ্ধের সমুদ্র পার হয়ে নাবিক আসছেন, ঝড়ে তাঁর নৌকার পাল তুলে দিয়ে। তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুর্দ্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড় সম্পদ নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আসছেন? এই কবিতায় দুটি প্রশ্নের কথা আমি বলেছি। নাবিক যে সম্পদ নিয়ে আসছেন তা কি এবং নাবিক কোন্ ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন? যুদ্ধের সাগর যিনি পার হয়ে আসছেন তিনি কোন্ দেশে কার হাতে তাঁর সম্পদকে দান করবেন?

১ম শ্লোক—যখন চারিদিকে গভীর রাত্রি, সাগর মত্ত, ঝড় বইছে এমন দুর্দ্দিনে নাবিকের কি ভাবনা ছিল যে এমন সময়ে তিনি কূল ছাড়লেন? কি সঙ্কল্প তাঁর মনে ছিল যার জন্য পরম দুর্দ্দিনে নিয়মের দ্বারা সংযত লোকসমাজের কূলকে ত্যাগ করে তিনি মত্ত সাগর পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়েছেন?

দ্বিতীয় শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। সেই আভাসটা এই যে কোনো একটি গৌরবহীনা পূজারিণী একজায়গায় অজানা অঙ্গনে পূজার দীপ জালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, যুদ্ধের সাগর পার হয়ে নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করবার জন্যে এই প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছেড়েছেন। যে অঙ্গনে কারো দৃষ্টি পড়ে না, সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু তাঁকে আসতে হলে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আসতে হবে।

ঝড়ের মধ্যে এই বিবাগীর, ঘরছাড়ার এ কি সন্ধান এবং কাকে সন্ধান? কত না জানি মণিমাণিক্যের বোঝা নিয়ে তিনি নৌকা বেয়ে আসছেন! বুঝি কোনো বড় রাজধানীতে তিনি ধনসম্পদ নিয়ে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দেখি একটি মাত্র রজনীগন্ধার মঞ্জরী। তিনি যাঁকে খুঁজছেন তাকে ত তবে মণিমাণিক্য দেবেন না। তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিনী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জরী নিয়ে আসছেন। এরই জন্য এত কাণ্ড? হাঁ এরই জন্য নাবিকের নিক্রমণ।

যে রজনীগন্ধার সৌরভ অন্ধকারেই বিস্তৃত হয়, তা সেই অচেনা অঙ্গনের উপযুক্ত। দিনের বেলা সেই সৌরভ

সঙ্গোপনে থাকে কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। সেই সৌরভময় ফুল নিয়ে নাবিক বেরিয়েছেন। নূতন প্রভাত আসন্ন, সেই নবপ্রভাতের উপহার নিয়ে নবীন যিনি তিনি আসছেন। যে তপস্বিনী পথের পাশে নূতন প্রভাতে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে অপেক্ষা করছে তাকে সমাদরের মালা পরিয়ে দিতে তিনি বার হয়েছেন। সে রাজপথের পাশে রয়েছে, তার লোককে দেখাবার মত ঘরদুয়ার নেই—তারই জন্য নাবিক অসময়ে সকলের অগোচরে বার হয়েছেন। সেই তপস্বিনীর রুক্ষ অলক উড়ছে, চক্ষের পলক সিক্ত হয়েছে, তার ঘরের ভিত ভেঙ্গে গেছে, সেই ভিতের ভিতর দিয়ে বাতাস হেঁকে চলেছে। বর্ষার বাতাসে তার প্রদীপ কম্পিত হচ্ছে—ঘরের মধ্যে ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে। তার দৈন্যদশার মধ্যে ভয়ে ভয়ে সে রাত কাটাচ্ছে, তার আশঙ্কা হচ্ছে যে বর্ষার বাতাসে তার কম্পমান দীপশিখা কখন নিবে যাবে। সে একপ্রান্তে বসে আছে, তার নাম কেউ জানে না। কিন্তু তারই কাছে নাবিক আসছেন।

আমার উৎকণ্ঠিত নাবিক আজকের দিনেই যে বার হয়েছেন তা নয়। কত শতাব্দী হল তাঁর যাত্রা সুরু হয়েছে, কত দিন থেকে কত কাল-সমুদ্র পার হয়ে তিনি আসছেন। এখনো রাত্রির অবসান হয়নি, প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। যখন তিনি আসবেন তখন কোনো সমারোহ হবে না, তাঁর আগমন কেউ জানতেই পারবেনা। তিনি আসলে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোকে ঘর ভরে যাবে। নূতন সম্পদ কিছু পাওয়া যাবে না, কেবল দৈন্য ঘুচে যাবে। তপস্বিনী যে দারিদ্র্য বহন করছিল তা ধন্য হয়ে উঠবে, শূন্য পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে। তার মনে অনেক দিন ধরে সন্দেহ জাগছিল, সে ভাবছিল যে তার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করা ব্যর্থ হল বুঝি, কিন্তু তার সে সংশয় ঘুচে যাবে। তখন তর্কের উত্তর ভাষায় মিলবে না, সে প্রশ্নের মীমাংসা নীরবে হয়ে যাবে।

ইতিহাসের বড় বড় বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ইতিহাস-বিধাতা সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন। সেই মাল্য কে পাবে? আজ যারা বলিষ্ঠ শক্তিমান্, ধনী, তাদের জন্য আসছেন না। তারা যে ঐশ্বর্য্যের জন্য লালায়িত; কিন্তু তিনি তো ধনরত্নের বোঝা নিয়ে আসছেন না। তিনি প্রেমের শান্তি বহন করে, সৌন্দর্য্যের মালা হাতে করে আসছেন। আজ তো শক্তিমানেরা সে মাল্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই, তারা যে রাজশক্তি চেয়েছে। কিন্তু যে অচেনা তপস্বিনী আপন অঙ্গনে বসে পূজা করছে আমার নাবিক রজনীগন্ধার মালা তারই জন্য নিয়ে আসছেন। সে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে, মনে করছে তার অজ্ঞাত অঙ্গনে পথিকের বুঝি পদচিহ্ন পড়ল না। সে যখন মাল্যোপহার পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে তখন সে বলবে, তোমার হাতের প্রেমের মালা চেয়েছিলাম, এর বেশী কিছু আমি আকাঙ্ক্ষা করি নি। ধনধান্যে আমার স্পৃহা ছিল না। এই রিক্ততার সাধনা যে করেছে, এই কথা যে বলতে পেরেছে, সে দুর্ব্বল অপরিচিত দরিদ্র হোক্ নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন। এরই জন্য এত কাণ্ড, এত যুগ যুগান্তরের অভিসার! হাঁ, এরই জন্য। সকল ইতিহাসের এটাই অন্তর্নিহিত বাণী।

গত মহাযুদ্ধে একদল লোক অপেক্ষা করে বসেছিল যে যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আরেক দল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল; তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর ও চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছে। বিশ্বে যারা পরাজিত, অপমানিত, তারা মনুষ্যত্বের চরম দানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে কিন্তু তবুও তারা প্রদীপ যদি না নেবায়, তপস্যায় যদি ক্লান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি করে থাকে, তবে তখন সেই নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেবেন।

# রোম্যাঁ রোলাঁ ও আঁরি বারব্যুস

## ফ্রান্সের চিঠি।

১লা বৈশাখ ১৩২৯

শ্রীচরণকমলেষু—

অনেকদিন পরে আপনাকে লিখতে বসেছি; আমার এ চিঠি নববর্ষে আপনার আর একটি নবজন্মদিনে পৌঁছুবে; আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।

এবারকার প্রধান খবর Romain Rollandর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই পরিচয়ের সঙ্গে যেন প্রথম মনে হল ইউরোপে আসা ও ফ্রান্সে একবছর থাকা সার্থক হল: জীবনের সব গভীর পরিচয়ই যেমন অতর্কিতে আসে এটিও তেমনি এল: রোলাঁর ভগ্নি মাদ্‌লন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর জানতে চান আমার বর্ত্তমান অধ্যাপক Jules Bloch এর কাছে। তিনি আমার নাম ধাম রোলাঁদের পাঠান তার ফলে তাঁদের বাড়ীতে আপনার ও গান্ধির আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে আমায় কিছু কিছু আলোচনা করতে হয় এবং বর্ত্তমান ভারত সমস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর দিতে হয়; গান্ধীকে পাগল প্রমাণ করবার সাধু প্রয়াস ইংরেজ পরিচালিত কাগজে যতই প্রকট হয়ে উঠছে ফরাসী উদার নৈতিকদের মধ্যে বিশেষতঃ রোলাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে সত্য গান্ধীকে আবিষ্কার করবার—ভারতের সমস্যাটি বুঝবার আগ্রহ ততই বেড়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে তাই আমার মত নগণ্য একজন মানুষও শুধু ভারতবাসী বলেই এঁদের দলে ভিড়তে পারলে।

ইতিমধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল; যে-ফরাসী উদার-নৈতিকদল এতদিন একত্র হয়ে—রাষ্ট্রীয়নৈতিকদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছিলেন—তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হল; একদল দাঁড়িয়েছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আঁরিবার-ব্যুস এর (Henri Barbusse) পাশে আর একদল Rollandর পাশে! দুইদলই স্বীকার করেন যে সমাজকে উদ্ধার করতে হবে রাষ্ট্র সঙ্কট থেকে; মানুষকে রক্ষা করতে হবে কলের পেষন থেকে। কিন্তু Barbusseএর দল একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন, কলের সঙ্গে লড়তে হলে কল গড়তে হবে—আপনা থেকে যদি গড়ে না ওঠে জবরদস্তি করেও গড়া দরকার এবং এ জবরদস্তি যাঁরা না মানেন তাঁরা কবি বা ভাবুক হতে পারেন, সংস্কারক নন—সুতরাং সংস্কারমার্গের বাইরে তাঁদের স্থান।

এই ধরনের ভাবার বিরুদ্ধে রোলাঁ প্রথম একবার ধীর প্রতিবাদ করিলেন L'Art libre পত্রিকায়, তার উত্তর বারব্যুসের দল L'Humanite বলে কাগজে দিলেন; তার ফলে ১লা এপ্রেলের Clarte কাগজে Rolland Barbusseএর উত্তর প্রত্যুত্তর ছাপা হয়েছে: বারব্যুসের লেখার মধ্যে জুলুমের সার্থকতাটা আরও বেশী প্রকট হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রোলাঁ তাঁর বক্তব্যটি একখানি অপূর্ব্ব চিঠিতে পরিস্ফুট করেছেন; তাঁর মতে কলের সঙ্গে সংগ্রামে কল গড়তে যাওয়া—সে যে-কোন দোহাই দিয়েই হোক—আসলে হচ্ছে কলের কাছে জীবনের পরাভব স্বীকার। জার্ম্মানীর Poison gas এ জার্ম্মানীকে হারান হল বটে কিন্তু Germanism অজেয় রয়ে গেল! তা ছাড়া জুলুম জিনিষটা যত বড় মহৎ উদ্দেশ্যই আশ্রয় করে থাক না কেন—সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ; এই জুলুমের পরওয়ানার উপর স্বার্থত্যাগের ছাপ যত বড় অক্ষরেই দেওয়া থাক না কেন সেটা জুলুমই থেকে যায় সুতরাং সেখানে মনুষ্যত্বের পরাভব স্বীকার করা হচ্ছে; যে স্বার্থত্যাগ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয় তা মানুষকে বড় করে না—খর্ব্ব করে। আপাত ফললাভের লোভ যতই দেখান যাক না কেন কোনও সমাজনৈতিকই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলে আঘাত করে সমাজকে স্থায়ী-ভিত্তি দিতে পারেন না। সুতরাং প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে মানুষের মনকে মুক্তি দেওয়া; তবেই তার ইচ্ছা সত্যকে আশ্রয় করতে, তার হৃদয় কল্যাণকে বরণ করতে শিখবে।

এখন ফরাসী ভাষায় তাঁর মত মনীষীর কথাও বুঝতে পারি

বলে কি আনন্দ হয় কি করে বোঝাব! অনেক সুকৃতির ফলে আপনার ভিতর দিয়ে রোলাঁর সঙ্গে পরিচয় হল ; এঁর সমস্ত বই একধার থেকে পড়ে যাচ্ছি···দেশে ফিরে প্রথম কাজ রোলাঁর চিন্তা ও আদর্শ দেশের লোকের সামনে ধরা এবং এঁর বইএর প্রচার করা ; যথার্থ বিশ্বপ্রেমিক মানুষ ইয়োরোপে এই প্রথম দেখলুম। অথচ চারিদিক থেকে এর উপর আক্রমণ। শুধু অত্যুগ্র স্বাজাতিক ফরাসী দেশবাসী নয়—রোলাঁর সমধর্ম্মী সহকর্ম্মীরা পর্য্যন্ত তাঁকে কতটা ভুল বুঝছেন তা দেখছি!

শিল্পী ত মানুষ বটে—তাই এই ভুল বুঝবার নিষ্ঠুরতা বোধ হয় সব চেয়ে এঁদের বাজে ; Rollandকে দেখে মনে হল যেন একটা সাময়িক অবসাদ এসেছে—আমার মত কীটানুকীট তাঁকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্দ্ধা রাখে না, তবু একটি কাজ না করে থাকতে পারলুম না ; 'বলাকা' থেকে আপনার 'যাত্রী' কবিতাটি অনুবাদ করে তাঁকে উপহার দিয়ে এসেছি ; অনুবাদ শুনে আমায় আসল বাংলা কবিতাটি আবৃত্তি করতে বললেন—সৌভাগ্যক্রমে কবিতাটি মুখস্থ ছিল ; শোনবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রোলাঁ বলে উঠলেন "কবির এইদিকটা অনুবাদের ভিতর দিয়ে পাওয়া সব সময় সহজ হয় না ; যাত্রীর ধরনের লেখা তাঁর এ পর্য্যন্ত দেখেছি বলে মনে হয় না—এ যেন Beethovenএর sublime Symphony···"

বেথোভেনের জীবনীলেখক কি মনে করে একথা বললেন ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরে এলুম।

প্যারিসে থাকা বোধ হয় রোলাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তিনি শুনছি স্থায়ীভাবে সুইটজারল্যাণ্ডে বাস করবেন ; আপনার জন্মদিন আসছে এবং আপনাকে আমি চিঠি লিখতে যাচ্ছি জেনে রোলাঁ এবং তাঁর ভগ্নি তাঁদের শুভইচ্ছা ও প্রীতিনমস্কার আপনাকে পাঠাতে বলেছেন ; আশা করি আপনার শরীর বেশ ভাল যাচ্ছে এবং বিশ্বভারতীর কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। আচার্য্য লেভি নেপাল থেকে ফিরে আবার আশ্রমে আসছেন কি? তাঁরা ভারতে কতদিন আছেন? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। ইতি

স্নেহের কালিদাস

# গান

১

কখন বাদল—ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে।
ঐ ঘাসের ঘন ঘোরে
ধরণীতল হল শীতল চিকন আভায় ভরে,
ওরা হঠাৎ গাওয়া গানের মত এল প্রাণের বেগে।
ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা।
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি ওদের খেলাঘরে।
ওদের, দোলা দেখে প্রাণে আমার
দোলা ওঠে জেগে॥

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

---

২

আজি বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ আলো মেশে।
বেণুবনের মাথায় মাথায়
রং লেগেচে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে।
এই ঘাসের ঝিলিমিলি
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন
একতালে যায় মিলি।

মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন যে মাতে
ওঠে আকুল হেসে॥

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

---

৩

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণায় কি সুর বাঁধারে।
ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর করে তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁদারে।
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ঐ
হের দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।
মন যে আমার পথ-হারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদারে।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

---

# আশ্রম সংবাদ

### কলিকাতা আশ্রমিক সঙ্ঘ।

নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও 'কলিকাতা আশ্রমিক সঙ্ঘে'র এখন একাদশ বৎসর চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য কলিকাতায় প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের মধ্যে যোগ রক্ষা করা ও আশ্রমের আদর্শটিকে সকলের মধ্যে জাগাইয়া রাখা। এই সঙ্ঘের গত দুই বৎসরের কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

* * * *

জুলাই মাসে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি বৎসর সেই সময়ে কলিকাতায় নবাগত আশ্রমবাসী-গণকে লইয়া নূতন কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচিত করিয়া আশ্রমিক সঙ্ঘ তাহার কাজ আরম্ভ করিয়া থাকে। গত পূর্ব্ব বর্ষের (জুলাই, ১৯২০-জুলাই, ১৯২১) প্রারম্ভে সঙ্ঘের কাজ খুব জমিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ঐ বর্ষের ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার নানা গোলমালের জন্য তাহার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই বর্ষের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নাম—সম্পাদক, জিতেন্দ্র ভট্টাচার্য্য; সহকারী সম্পাদকদ্বয়, ভুবনেশ্বর নাগ ও শশধর সিংহ; কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—সম্পাদক, বীরেন্দ্র বসু; ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুহৃদ মুখোপাধ্যায় ও কালীমোহন ঘোষ। যে নয়টি অধি-বেশন হইয়াছিল, তাহাতে গড়ে ১৭ জন করিয়া সভ্য উপস্থিত ছিলেন। প্রায় প্রতি সভাতেই শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞান, মহাপুরুষের জীবনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হয় এবং গুরুদেবের বিদেশের পত্র ও আশ্রমের পত্র পঠিত হয়।

* * * *

জুলাই ১৯২১ হইতে বর্ত্তমান বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এই বর্ষের নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ—সম্পাদক, বিজয় বাসু; সহকারী সম্পাদকদ্বয় সুধাংশু সরকার ও সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—সত্যরঞ্জন বসু, পত্রিকা বিভাগ; বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্রীড়া বিভাগ; শিবদাস রায়, তত্ত্বাবধান বিভাগ, অমিয় ভট্টাচার্য্য নির্ব্বাচিত সভ্য। বর্ত্তমান বর্ষে এ পর্য্যন্ত পাঁচটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

* * * *

১৪ই আগষ্টের অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে গুরুদেবের 'শিক্ষার মিলন' বক্তৃতাটি আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সঙ্ঘ গুরুদেবের শিক্ষাবিষয়ক দ্বিতীয় বক্তৃতাটির আয়োজন করিয়াছিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর জিতেন্দ্র

ভট্টাচার্য্য 'শিক্ষার মিলন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহন করেন। ঐ সভায় সূর্য্য চক্রবর্ত্তী ও বীরেন সেন এ বৎসর ফুটবল ম্যাচে আশ্রমের 'টিমের' কার্য্য-কলাপ বর্ণনা করেন। প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত একটী শীল্ড ও একটী কাপ সভায় প্রদর্শিত হয়। ২৮শে নভেম্বর জ্যোতিষ রায়কে জার্ম্মানী যাত্রার পূর্ব্বে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়। অরুণচন্দ্র সেন এই সভায় সভাপতি হন। শ্রীমান জ্যোতিষকে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে কতকগুলি পুস্তক উপহার দেওয়া হয়। জ্যোতিষ চলিয়া যাওয়াতে সঙ্ঘের অনেক ক্ষতি হইল। কারণ নানা দুর্য্যোগে বিশেষতঃ ১৯১৯২০ সালে তিনি সম্পাদকরূপে অতি উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত সঙ্ঘকে বাঁচাইয়া রাখেন এবং তিনি ইহার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই সভায় ৮ই পৌষের সভায় সভাপতি করিবার জন্য কয়েক-জনের নাম প্রস্তাবিত হয়। ৭ই পৌষের অনতিপূর্ব্বে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আর একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে জিতেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভারতের অর্থবিনিময় সমস্যা বিষয়ক একটি সারগর্ভ ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

*     *     *     *

বলা বাহুল্য এই সভাগুলিতে সামাজিকতার দিকটিও বজায় থাকে অর্থাৎ এখানকার সুগায়কগণ সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে আনন্দদান করেন এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ এই নীতি অনুসারে সভাশেষে মধ্যে মধ্যে প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আশ্রমিক সঙ্ঘ হইতে পরিচালিত হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'যাত্রী' কিছু দিন হইতে তাহার যাত্রা বন্ধ করিয়াছে। আশা করি ইহা পুনরায় প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

*     *     *     *

গত ৩০শে জানুয়ারী সেক্সপীয়র এসোসিয়েসনের উদ্যোগে 'প্রাচ্যতত্ত্ব সম্মিলনের সদস্যগণের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে বঙ্গেশ্বর-প্রাসাদে 'দি পোষ্ট অফিস্' ('ডাকঘর') এর অভিনয় হইয়াছিল। অমল, সুধা, মোড়ল, মাধব, কবিরাজ ও বালকের দল, ইহাদের অভিনয় কয়েকজন ইয়োরোপীয় এবং অন্যান্য পাত্রগণের অভিনয় কয়েকজন বাঙালী করিয়াছিলেন। একটি ইংরাজ বালিকা অমল সাজিয়াছিল।

*     *     *     *

'ডাকঘর' আজকাল পাশ্চাত্যদেশে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দেশে ইহার অভিনয় হইতেছে গত সংখ্যায় তাহার কিছু সংবাদ আমরা পাইয়াছি। কবি কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন 'বলাকা'র ক্লাশে বলেন যে জার্ম্মানিতে তিনি ডাকঘরের যে অভিনয় দেখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ডাকঘর নাটকটিকে তাহারা একটি রোমান্সের সামিল করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু এই নাটকের মধ্যে একটি মূলতত্ত্ব আছে। সংসার প্রতিদিনের অভ্যাসের বন্ধনে মানুষকে বন্দী করিয়া রাখে। তাহার চারিদিকে যাহা জমিয়া উঠে মাধবের মত হিসাবী লোক তাহাকে প্রাচীর দিয়া বাঁধিতে চায়। কিন্তু অসীমের আহ্বানে আত্মা এই জড়প্রথাকে সঞ্চয়ের বন্ধনকে মুক্ত করিয়া দিতে চায়। কবি বলেন যে, আত্মার এই মুক্তির ক্রন্দন ডাকঘরের অন্তরের সুর। বার্লিনে কবির সাক্ষাতে ডাকঘরের যে অভিনয় হইয়াছিল তিনি বলেন যে, তাহা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং দর্শকেরা তাহা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়াছিলেন। একটি জার্ম্মান কাগজে এই নাটকের গূঢ় ভাবটির একটি চমৎকার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। [ ফেব্রুয়ারীর 'মডার্ণ রিভিউয়ে ইহার অনুবাদ আছে ]

এবার সমস্ত গ্রীষ্মের ছুটিটাই পূজনীয় গুরুদেব এখানে কাটাইলেন। তিনি ছুটিতে অনেকগুলি বর্ষার গান রচনা করিয়াছেন, গত বৎসরের মত এবারও কলিকাতায় বর্ষামঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ছুটির মধ্যেও আশ্রমে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সমাগম হইয়াছিল।

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয় সপরিবারে সমস্ত ছুটিই এখানে কাটাইয়াছেন।

বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের ছাত্র শ্রীমান হীরাচাঁদ ডুগ্গারের বন্ধু জিয়াগঞ্জের শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র নাহাটা আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অল্পদিন হইল বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এই স্থানটি তাঁহার এতদূর ভাল লাগিয়াছে যে তিনি এইখানেই বাস করিবার জন্য একখানি বাড়ী করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা বিশ্বভারতী নানা বিষয়ে সহায়তা লাভ করিবে আশা করা যাইতে পারে।

আমেরিকা প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার আমেরিকীয় স্ত্রীসহ কয়েক দিন আশ্রমের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বহুবৎসর আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে ইংরাজী লেখক ও বক্তারূপে তাঁহার খ্যাতি আছে।

এখানে আজকাল প্রায় বৃষ্টি হইতেছে। এবার কাল-বৈশাখীর ঝড়ে আশ্রমের পাকশালার টিনের ছাদ অনেকটা উড়িয়া গিয়াছিল—এবার পাকা ছাদ হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক বৎসরই ঝড়ে বিদ্যালয়ের বাড়ীগুলির বড় ক্ষতি হয় বলিয়া যথেষ্ট আর্থিক লোকসান সহিতে হয়। গ্রন্থাগারের নূতন ইমারৎ হইবার পূর্ব্বেই বৃষ্টি এত শীঘ্র এবং এত বেশী আসিয়া পড়িল যে পুস্তকগুলির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল—কিন্তু গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনাসাকী কয়েকখানি বহুমূল্য দুর্লভ চীনা ও জাপানী পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। সাংহাই হইতে আমরা সমগ্র চীন ত্রিপিটক (প্রায় চারশত গ্রন্থ) উপহার পাইয়াছি। ফরাসী দেশ হইতে বিশ্বভারতীর বন্ধুগণ বর্ত্তমান ফরাসীসাহিত্য সম্বন্ধীয় বহুপুস্তক পাঠাইয়াছেন। জার্ম্মানীতে গুরুদেবের জন্মদিনের উৎসবে যে সব পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, সে গুলিও হামবুর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতীতে জৈন সাহিত্য ও ধর্ম্ম আলোচনার জন্য জিয়াগঞ্জের শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ বোথরা, কলিকাতার শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার ও তদীয় পুত্র শ্রীমান পৃথ্বী সিংহ এবং ভাওনগর, কাঠিবারের 'যশোবিজয় গ্রন্থমালার' প্রকাশক অনেকগুলি জৈন গ্রন্থ দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গ্রীষ্মকালে এখানে বড় জলাভাব হয় বলিয়া আশ্রমে দেড় শ' ফুট এবং সুরুলে প্রায় দু শ' ফুট মাটী মৃত্তিকা-ভেদন যন্ত্রের সাহায্যে খনন করা হইয়াছে। কিন্তু নীচে পাথরের মত শক্ত মাটী বলিয়া কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। খনন করিবার যন্ত্রটী দিবারাত্রি চালাই-বার জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই অক্লান্তভাবে দিন রাত্রি কাজ করিয়াছিলেন। আশা করা যায়, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টায় আমরা অচিরেই যথেষ্ট জল পাইব। পূজনীয় গুরুদেব কর্ম্মীদের উৎসাহিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়াছেন।

এস এস হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করি কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কল কল ছল ছল।

এস এস উৎস স্রোতে
গূঢ় অন্ধকার হ'তে
এস হে নির্ম্মল,
কল কল ছল ছল।

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়
তুমি যে খেলার সাথী সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এস হে উজ্জ্বল,
কল কল ছল ছল।

হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়" সে তোমায় খুঁজে যায়।

তাহার মৃদঙ্গ রবে
করতালি দিতে হবে,
এস হে চঞ্চল,
কল কল ছল ছল।

মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এস বন্ধহীন ধারা,
এস হে প্রবল,
কল কল ছল ছল॥

৪ বৈশাখ
১৩২৯

দারুণ গ্রীষ্মেও সমস্ত ছুটিটাই মিঃ এণ্ড্রুজ ও মিঃ বেনোয়া এখানেই কাটাইলেন।

ছুটির মধ্যেই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার মত সুযোগ্য এবং একনিষ্ঠ অধ্যাপককে পূর্ব্ববিভাগ হইতে হারাইয়া আমরা দুঃখিত আছি। কিন্তু তাঁহার দ্বারা কৃষিবিভাগের যথেষ্ট উপকার হইবে, ইহাই আমাদের সান্ত্বনার বিষয়। তা'ছাড়া আমাদের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন ঘোষ মহাশয় ছুটির পর হইতে পুনরায় বিশ্বভারতীর পূর্ব্ববিভাগের অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করিবেন। ইনি কুচবিহারে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করিতেছিলেন—ইঁহাকে পাইলে পূর্ব্ববিভাগের বিশেষ উপকার হইবে, আশা করা যায়।

বিশ্বভারতীর নূতন সংস্থিতি পত্র (constitution) ছাপা হইয়া রেজেষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে। ছুটির পর হইতে তদনুসারে সমস্ত কাজ চলিবে।

কর্ম্মসচীবের সকল কাজের সহায়তার জন্য ব্যবস্থা-বিভাগে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে তণ্ডুলার রেলওয়ে ট্রাফিক বিভাগে দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছিলেন।

হাঁসপাতালে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সরকার নূতন কম্পাউণ্ডার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে শিলাইদার দাতব্য চিকিৎসালয়ে কাজ করিতেছিলেন। নূতন ডাক্তারেরও খোঁজ চলিতেছে।

ছাপাখানার শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল নূতন ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে দক্ষতার সহিত কলিকাতায় কান্তিক প্রেসে কাজ করিতেছিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর আশ্রম ১৪ই আষাঢ় খুলিবে। খোলার অল্পদিন পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিলভাঁ লেভি সস্ত্রীক নেপাল হইতে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিবেন।

অনেক কষ্টে বহু বিলম্বে চেকোশ্লোভেকিয়ার (Czechoslovakia) বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ (orientalist) অধ্যাপক উইণ্টারনিট্স (Winternitz) ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতে আসিবার ছাড়পত্রের (passport) অনুমতি পাইয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, হয়ত তিনি আগামী নভেম্বর মাসে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিবেন।

বিশ্বভারতীর কৃষি-বিভাগের অনুরোধে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় স্থানীয় চর্ম্মশিল্পের উন্নতির জন্য মিঃ এ, মুস্তাফিকে সুরুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুস্তাফি মহোদয় চারজন লোকসহ সুরুলে একমাস অবস্থান করিয়া চামড়া পাকাইবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। কৃষি-বিভাগের ছাত্রগণ নিয়মিতরূপে তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান কুলদাপ্রসাদ সেন এই বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী মৌদপুর গ্রামের তিনজন মুচীও বিশেষ আগ্রহের সহিত একমাস শিক্ষালাভ করিয়া এই কাজে পাকা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কৃষি-বিভাগে বারোটি ছাত্র আছে। তাহাদের প্রত্যেককে নিজেদের স্বতন্ত্র জমি দেওয়া হইয়াছে। সেই জমি তাহারা নিজেদের হাতে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিনে-

বাদাম, বিলাতি বেগুন, বরবটি ও মূলার বীজ লাগাইয়াছে।

সিউড়ির কৃষি-বিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু প্রতি মাসে সাত দিন সুরুলে অবস্থান করিয়া কৃষি-বিভাগের শিক্ষাদানে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃষি-বিভাগের শ্রীমান ধীরানন্দ রায় ও কলাবিভাগের শ্রীমান মসোজিকে ছুটির মধ্যে জব্বলপুরে Scout master হইবার শিক্ষালাভ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা সেখানকার অধ্যক্ষের নিকটে বেশ খ্যাতি লাভ করিয়া উপরোক্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ছুতারের কাজেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি ছাত্রেরা নূতন বৃষ্টি পাইয়া কয়েক দিন চাষের কাজে ব্যস্ত আছে—তাহাদের জমির কাজ একটু কমিলেই তাহারা অন্যান্য কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে।

---

অনাহার ক্লিষ্ট রুশীয় মনস্বীদের সাহায্যার্থে

## আবেদন পত্র।

অক্সফোর্ডের International Lawএর বিখ্যাত প্রফেসর P. Vinogradoff আচার্য্য রবীন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত পত্র খানি পাঠাইয়াছেন :—

"আট বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় আপনার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তখন আমি ভাবিতেই পারি নাই যে আমাকে আমার হতভাগ্য রুশীয় স্বদেশবাসীদের হইয়া আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

সেই মিলনের পর আমার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, যে ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের তাড়নায় জর্জ্জরিত, তাহার প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র আপনি।

এই দুর্ভিক্ষ এবং অত্যাচারের কবল হইতে রুশের মৃতপ্রায় মনীষী এবং ভাবুক সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার জন্য আমি আপনার ন্যায় অন্যান্য ভাবুক ও জনহিতৈষী লোকদের নিকট আবেদন জানাইতেছি। ইঁহাদের মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

অসংখ্য অনশনক্লিষ্ট কৃষকদের তরফ হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং জগতের সকল দেশেরই সদাশয় লোকেরা তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য দানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই সমস্ত জননায়ক, চিকিৎসক এবং সকল বিভাগেরই শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দেশীয় সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে বিশেষরূপে সাহায্য পাইবার যোগ্য।

রুশিয়ায় ইঁহাদের সংখ্যা কোন দিনই বেশী ছিল না কিন্তু ইঁহাদের দল ধীরে ধীরে পুষ্ট হইতেছে এবং লোকসেবা ও অসহায় জনসাধারণের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার কার্য্যে তাঁহারা ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন। রুশিয়ার অন্তর্বিপ্লবে ইঁহাদের অনেকেই মরিয়াছেন, ইঁহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতেছে ভারতবাসীরা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন এবং আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন এই আশা করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনার কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে কিরূপ বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহা নিম্ন লিখিত কয়েকটি ঘটনা পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহারা যখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিতেন এবং দুর্ভিক্ষের জন্য রশদ পাইতেন তখন তাঁহাদের অবস্থা যতই শোচনীয় থাকুক না কেন কিন্তু সম্প্রতি তাহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে। যখন হইতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং বাণিজ্যের অধিকার লোপ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন তখন হইতেই তাঁহারা রাজকর্ম্মচারীবর্গের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যা সংক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহার ফলে বহু সংখ্যক মস্তিষ্কজীবীদের পথে বাহির হইতে হইল এমন কি তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনেরও

কোন উপায় রহিল না। সরকার হইতে প্রাপ্ত নাম মাত্র বেতনে অকুলন হওয়ায় তাঁহাদের গৃহের অধিকাংশ জিনিষই তাঁহারা পূর্ব্বে বিক্রয় করিয়াছেন এবং সম্প্রতি পেট্রোগার্ডে, মস্কোতে ও ওডেসায়ে, খারকেকে এবং কিয়েফ ইত্যাদিতে এমন সহস্র সহস্র মস্তিষ্কজীবী আছেন যাঁহারা কোন কাজ পাইতেছেন না, তাঁহাদের বিক্রয় করিবার মতও কোন জিনিষ পত্র নাই এবং এমন কি সত্য সত্যই তাঁহাদের দল অনাহারে ও রোগে দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

নিম্নে রুশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত পত্র সমূহের কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

একটি বৃহৎ শিক্ষা-কেন্দ্র হইতে যে পত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে এইরূপ লেখা আছে।

৭ই জানুয়ারী ১৯২২ আমি সম্প্রতি X.-Y,-Z-এর সহিত নগর সভার কাজে নিযুক্ত হই। ইঁহারা সকলেই বিখ্যাত স্থপতি। ইঁহারা সহরের সব চমৎকার বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কোন রকমে ছাতাপড়া আধসের জইশস্য কিংবা একটু সাবান সংগ্রহ করিতে কি পরিশ্রমই না করিতে হইত। কারণ দিনে আমরা এক পোয়া মাত্র রুটি বেতন রূপে পাইতাম। এখন আমরা তাহাও পাই না। A,-Bর হাতে এমন কালী পড়িয়াছে এবং ভয়ঙ্কর ভাবে তাঁহার হাত ফুলিয়াছে যে তাঁহার দিকে কিছুতেই তাকান যায় না (A,-B-সহরের পরোপকারীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং তিনি নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার) উকিলদের অবস্থা সকলের অপেক্ষা শোচনীয়। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার N-যখন শেষবারে আমার কাছে মোটে এক আউন্স রুটির দাম ৫০ রুবল্ ধার করিবার জন্য নগরসভায় আসিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি ছেঁড়া গ্যাকড়া পরিয়া আসিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং তিনি তাঁর ঠাণ্ডায় জমা ও ফোলা হাত দুটি যখন উত্তপ্ত ষ্টোভের উপর রাখিলেন তখন তাঁহার উত্তাপ অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্তও ছিল না।

আর একটি শিক্ষাকেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত পত্রাংশ উদ্ধৃত হইল।

অধ্যাপক A-এবং তাঁহার পত্নী খাদ্য সংগ্রহের জন্য এমন কি তাঁহাদের খাট বিছানা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছেন, অনাবৃত মেজের ঘুমাইয়া তাঁহারা মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছেন। Bর অবস্থাও ঐরূপ C-প্রেতাত্মার মত শীর্ণকায় ও বিবর্ণ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার গৃহের শেষ দ্রব্যটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিতেছেন। Kostandi অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইনি রুশের একজন বিখ্যাত চিত্রকর A,-B,-Cরাও তাই।

আপনি এবং আপনার বন্ধুবর্গ যদি এই হতভাগ্য লোকদের সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আপনি রুশিয়ার মনীষীদের সাহায্যকল্পে যে পরিষৎ নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহার নিকট আপনাদের দান পাঠাইয়া দিবেন। প্যারিসে ইহার একটি কেন্দ্র আছে। ইহার ঠিকানা (118 rue de la Faisan derie) নিম্নলিখিত জনহিতৈষী ব্যক্তিগণকে লইয়া উক্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে—P. Milukoff সভাপতি J. Tschaikovsky, D. Merejkovsky, J. Bunin, P. Vinogradoff, L. Rosenthal ধনরক্ষক M, Zetlin সম্পাদক।

আপনি যদি এই সমিতিতে যোগদান করেন তাহা হইলে তাহা আমরা খুব গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিব। আমরা আশা করি যে ভারতে আপনি এই সমিতির সংশ্লিষ্ট আরেকটি সমিতি গঠনের ভার গ্রহণ করিবেন।

আপনি আপনার দান এই ঠিকানায় পাঠাইবেন Monsieur L. Rosenthal, 6 Avenue Ruysdal Paris

আপনার অকৃত্রিম

P. Vinogradoff"

ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে চান তাঁহারা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহা পাঠাইবেন, তিনি পরে প্যারিসে ধনরক্ষকের নিকট তাহা প্রেরণ করিবেন।

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ } শ্রাবণ, সন ১৩২৯ সাল। { ৭ম সংখ্যা

## বর্ষশেষ

(মন্দিরের উপদেশ, ৩০শে চৈত্র, ১৩২৮)

### (গান)

"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ,
তোমায় করিগো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করিগো নমস্কার"।—

মানুষ যদি ক্ষতিকে একান্ত ক্ষতি, দুঃখকে একান্ত দুঃখ বলেই জানত তবে তার অভিজ্ঞতার সিংহদ্বার দিয়ে পরম সত্যের সঙ্গে মিলন ঘটত না। কিন্তু সে সাংসারিক ক্ষতিকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, তার মধ্যেও সত্যের স্পর্শ পেয়েছে। সে বুঝেছে যে এই "নাশের" মধ্য দিয়েও সে পূর্ণতার দিকে যাত্রা করেছে—তাই সে অমৃত ও মৃত্যুর অধিদেবতাকে প্রণাম করেছে।

মানুষ জীবলোকের অন্য প্রাণীদের মত একান্তভাবে বর্ত্তমানকে আশ্রয় করেনি। সে অতীতযুগের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাসের সঙ্গে তার চিত্তের অবিচ্ছিন্ন যোগ স্থাপন করে চলেছে এবং তার যে সাধনার ধন, সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি, যত্নোপার্জ্জিত সঞ্চয় তা সে কেবল নিজে ভোগ করবে বলেই নয়—সুদূর ভবিষ্যৎযুগের মানবের জন্যও তার এই সকল প্রচেষ্টা। তাই নানা দেশের ইতিহাসে মানুষ যে জ্ঞান ও বিত্ত আহরণ করছে, তা অতীতকাল ও আগামীকালকে অঙ্গীভূত করে রয়েছে। সে একটি পরম কালকে অন্তরে উপলব্ধি করে বলেই ভাবী কালের জন্য সকল সুখসম্পদকে বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না—নানা কষ্টকে স্বীকার করেও বিশ্বের মূলউৎসের সন্ধানে প্রবৃত্ত আছে। সে যে ভাবী কালের গৌরব ও সার্থকতাকে অনুভব করে, অপর জীবেরা তা করে না। সে যে সত্যকে একান্তভাবে দেখেছে, তা মৃত্যুর অতীত, তা খণ্ডিত বিভক্ত নয়—তা সকল দেশ-কালপাত্রকে ছাড়িয়ে বিরাজ করছে। সে একটি অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন কালের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে বলেই অকাতরে দুঃখকে বরণ করেছে, ত্যাগকে স্বীকার করে নিয়েছে। কারণ সে জানে যে মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে অমৃতনিকেতনে পৌঁছনো যায়।

মানুষ দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণদান করছে,—ইতিহাসের এই সাধারণ ব্যাপারটি বারংবার কেন ঘটছে? সে জানে যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতলোকে প্রবেশ করা যায়—মৃত্যু অমরতাকে বাধা দেয় না। তার একান্ত শ্রদ্ধা না থাকলে সে এমন করে মৃত্যুকে অবজ্ঞা করতে পারত না। মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না, তা নয় কিন্তু তার ইতিহাসের বিরাট্‌ রূপ এই অসীমতার বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে একটি পরম কালকে উপলব্ধি করেছে বলেই, প্রতিদেশে বীরেরা আপনাকে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছে। ত্যাগের উপর স্বদেশের ইতিহাসের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করে গেছে। তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে মৃত্যুঘটিত ভয়কে অতিক্রম করতে পারে বলেই, তাদের প্রাণপাত ও স্বার্থত্যাগ সত্য হয়ে ওঠে, তারা শক্তিসম্পদে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। প্রতি দেশের মানুষেরা তাদের জাতির মধ্যে এই নিত্যকালের সত্যকে মেনেছে বলেই তারা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বমানবের জন্য চিরন্তন ধনকে রেখে গেছে।

যারা অবিশ্বাসী হয়ে রইল তারা বর্ব্বরতার যুগকে ছাড়াতে পারল না। পশুচর্ম্ম পরে, অজ্ঞানান্ধকারে অভিভূত হয়ে কালযাপন করতে লাগল। পরম আকাশের আলো তাদের আত্মাতে প্রবেশ করতে পারে না। ক্ষণিকের মধ্যেই তাদের জীবনের ব্যবস্থা ও সকল কর্ম্মচেষ্টা পর্য্যবসিত হয়। তাই যে জাতি কেবল বর্ত্তমানকে আশ্রয় করে থাকে; যে জাতি বিরাট্‌ সত্যকে অন্তরে গ্রহণ করেনি—তাকে ইতিহাসে বর্ব্বর এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

মানুষের অন্তরে এই যে অসীমতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে তা আমাদের বারে বারে নানা উপলক্ষ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করতে হবে। আমরা যে মুহূর্ত্তে পরম আকাশে আপনাকে অনুভব করব অমনি পূর্ণতার বদলে পূর্ণতার বোধ আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। আমরা পূর্ণ অসীমের মধ্যে নিমগ্ন আছি এই ভেবে সুখদুঃখ উত্থান-পতনের ঊর্দ্ধে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

আসলে মানুষ অসীমকে, অমৃতকে অন্তরে অনুভব করে বলেই মৃত্যুর আঘাত তাকে ব্যথিত করে। কারণ শোকের দুঃসহ বেদনায় সে মনে করে মৃত্যু বুঝি সমগ্রকে খণ্ডিত করে দিল। একদিকে তার গভীর আত্ম-উপলব্ধি, অমৃতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে; তাই দুঃখকে বরণ করা, ত্যাগ স্বীকার করা তার পক্ষে সহজ হয়েছে। অপর দিকে সে প্রাণলোকে, ক্ষুধাতৃষ্ণার জগতে জীবধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয়েছে, তাই সুখদুঃখ ভয় বেদনা তাকে চঞ্চল করে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সেই উভয়লোকেই তার অধিকার বিস্তৃত। যেখানে সে মর্ত্ত্যলোকে অন্য প্রাণীদের সঙ্গে বাস করে সেখানে সে মৃত্যু ক্ষতিতে পীড়িত হয়, কিন্তু যেখানে অমৃতের অধিকারী বলে নিজের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে। সেখানে সে মৃত্যুর আঘাতে ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়েছে মাত্র, তার পরেই শোককে উত্তীর্ণ হয়ে শান্তিলাভ করেছে। তার সম্পূর্ণ দ্বিধা ঘুচতে চায় না, সে মর্ত্ত্যধর্ম্মকে শ্রদ্ধায় ও নির্ভয়ে আপনার অধ্যাত্ম-জীবনের সম্পূর্ণ অনুগত করতে পারেনি। তাইতো মানুষের যথার্থ সাধনা হচ্ছে প্রাণলোকের এই নশ্বরতাকে নীচে রেখে মৃত্যু ও অমৃতের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপন করা।

যেমন নদীর পারে দাঁড়িয়ে অপর কূলকে এই কূলের বিরুদ্ধ বলে মনে হয় কিন্তু আসলে নদী দুই কূলকে পূর্ণ করে মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তেমনি জন্মমৃত্যু এই দুইয়ের মাঝখান দিয়ে অমর জীবনের স্রোত অসীমসিন্ধুর দিকে বয়ে চলেছে। জীবনের এই দুই স্বরূপই আমাদের সমান চালনা করছে। নৌকার যে দাঁড় জলে ফেলছি তাকে জল থেকে তুললে সে অশ্রুবর্ষণ করে বটে কিন্তু নৌকাকে চালাতে হলে দাঁড়কে যেমন নামাতে হবে তেমনি ওঠাতেও হবে। তোলা ও ফেলা দাঁড়টানার এই দুই সত্যদিক আছে, এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নৌকার গতিশীলতাকে বাধা দেওয়া হয়। মানুষ যদি একান্ত ভাবে একই জায়গায় স্থবির হয়ে রইল, তবে তার চলা যে বন্ধ হয়ে গেল। সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু এই দুই-ই তো তাকে চালনা করছে, তার জীবনকে গতি-দান করছে। অসীমের পরিচয় এমনি করে সীমার মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চলতে চলতে যখ

দেশকালের মধ্যে অখণ্ডকে অমৃতকে অনুভব করছি। সুখদুঃখ উত্থানপতনের দ্বন্দ্বের মধ্যেই তো অসীম গতিলাভ করছে, আপনাকে প্রকাশ করছে।

আজ আমরা সংসারপথে মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে এই সুখদুঃখ জন্মমৃত্যুকে মিলিত করে দেখব। যে অসীম স্বরূপের মধ্যে এই দুইয়ের সার্থকতা আছে আমরা তাঁকে প্রণাম করি। মানুষ বিশেষ দিনে কালগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বিশেষ দিনে তার জীবনের অবসান হবে একথা জেনেও সে মনেই করতে পারে না যে জন্মের পূর্ব্বে সে ছিল না বা পরে স থাকবে না। যেমন দূরে আকাশের সীমারেখায় দিগ্‌বলয়ের গণ্ডী দেখেও আমরা কল্পনা করতে পারি না যে সেখানে এসে পৃথিবী ঠেকে গেছে, মনেই হয় না যে দক্ষিণে বামে ঊর্দ্ধে অধোতে কোনো জায়গায় আকাশ সীমাবদ্ধ তেমনি আমরা মর্ত্যলোকের জীব হলেও ভাবতেই পারি না যে আমরা খণ্ড কালের দ্বারা সীমাবরুদ্ধ প্রাণী, এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেই বুঝি আমরা অতলস্পর্শ শূন্যতার মধ্যে পড়ে যাব। মানুষের নিজের সম্বন্ধে যে চৈতন্য তা জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে বর্ত্তমান আছে। সে শূন্যতার কল্পনা করতে রাজি নয় বলেই, মৃত্যু তাকে ভয় দেখালে সে অত্যন্ত পীড়া বোধ করে। তার সত্তার অসীমতার সম্বন্ধে সে তখনই সন্দিহান হয় যখন সে পূর্ণস্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করে না। তাই সে পৃথিবীর জীবনকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চায়, এবং মৃত্যু আসন্ন হলে সে মনে করে যে মৃত্যু তাকে গিলে ফেলবার জন্য মুখব্যাদান করছে।

যাঁরা পূর্ণস্বরূপকে চিত্তাকাশে দেখতে পেয়েছেন তাঁদের মনের সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে। আত্মার অসীমতাকে তাঁরা গভীরভাবে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, তাই "অমৃতাত্তে অমৃতং"—তাই তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেছেন। তাঁরা মৃত্যুভয়ে ভীত নন, তাঁরা একথা বলতে পেরেছেন যে "এষাস্য পরমাগতিরেষাস্য পরমাসম্পৎ এষোহস্য পরমোলোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ"।

# গান

১

ভোর হল যেই শ্রাবণ-শর্ব্বরী
তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে
হেনার মঞ্জরী।
গন্ধ তারি রহি রহি
বাদল বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে-কোণে
বেড়ায় সঞ্চরি'।
বেড়া দিলে কবে তুমি
তোমার ফুল-বাগানে,
আড়াল করে রেখে ছিলে
আমার বনের পানে।
কখন্ গোপন অন্ধকারে
বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে
ডাকে মর্ম্মরি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ আষাঢ়
১৩২৯

---

২

একলা বসে একে একে অন্যমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।
হায়রে বুঝি কখন তুমি গেছ ভুলে
ওরে আমি এনেছিলাম আপনি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ঐ চরণ-মূলে
অকারণে,

কখন্ তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে
অন্যমনে ॥

দিনের পর দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়,
এমনি তোমার আলস ভরা অবহেলায়,
হয়ত তখন বাজবে ব্যথা সন্ধ্যেবেলায়
অকারণে,
চোখের জলের লাগবে আভাস নয়ন কোণে
অন্যমনে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ আষাঢ়
১৩২৯

---

৩

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ ভোলা।
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে
উত্তরী তার যায় রে উড়ে,
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা।

লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ ত আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউতোলা ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ আষাঢ়
১৩২৯

---

# ফ্রান্সের চিঠি

## ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান কি ?

শ্রীচরণকমলেষু

আপনার হাতের বৈশাখের আশীর্বাদ পত্রখানি এমন সময় এল যখন দেশের যথার্থ অবস্থাটি বোঝা আমার বিশেষ দরকার; কাগজ পত্র ও বন্ধুদের চিঠি থেকে যা পাই তা আংশিক, ভাঙা চোরা—তাকে আবার মনের মধ্যে গড়ে নিতে হয়, না হলে বোঝা যায় না; আপনার কাছে যা পেলুম তা সূর্যরশ্মির মতন জিনিষ—সে মাত্র বস্তু নয়; তথ্য নয়—সে আলো—যা সবটাকে স্পষ্ট করে তোলে, সত্য করে দেখায়। এই দেখাই এখন আমার বিশেষ প্রয়োজন কারণ একটা বড় গুরুদায়িক কাজে রোলাঁ লাগিয়েছেন আপনার পরামর্শ চাই

যুদ্ধ যখন চলছে তার মধ্যে রোলাঁ ও তাঁর সহকর্মীরা একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন; তার মধ্যে বিশেষ ভাবে বিভিন্ন দেশের নারী শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা হয় নূতন ভাব নূতন সমাজের উদ্বোধন করবার আশায়; অনেক হাস্য বিদ্রূপ ও বিপত্তির ভিতর দিয়ে এই সঙ্ঘটি গত ৮ বৎসর ধরে কাজ করে আসছে। এর নাম হচ্ছে "The International League of women for Peace and Liberty"—রোলাঁর ভগ্নী এই সঙ্ঘের একজন বড় কাজের মানুষ; ইনি আমায় দলে টেনে আনলেন। গত দু' বছরে এঁদের কংগ্রেস হয়ে গেছে। Switzerland ও Austria তে; এবার জার্মানী ও ইতালীর সীমান্তে Vareso বলে একটা স্থানে কংগ্রেস বসবে; অনেক দেশ থেকে প্রতিনিধি আসছেন। ফ্রান্স থেকে রোলাঁর বন্ধুরা, ইংলণ্ড থেকে Bertrand Russel এবং অন্যান্য দেশের স্বাধীন বেপরোয়া মানুষরা [illegible]; এশিয়া থেকে মাত্র একজন জাপানী আছেন তাই এঁদের ইচ্ছা ভারতবর্ষের তরফ থেকে [illegible] [illegible]

পড়বেন। এবছর এঁদের বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, Internationalism in Human culture Symposiumটি খুবই মর্ম্মে লেগেছে আমার ; একদিন Rolland ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আপনার Nationalism বইখানি নিয়ে আলোচনা করতে২ প্রসঙ্গক্রমে বলি যে ভারতেতিহাসের যথার্থ গৌরব তার বিশ্বজনীনতায়—এথেকে বিচ্যুত যতবার আমরা হয়েছি ততবারই আমাদের অধঃপতন ঘটেছে। আমাদের পুনরুত্থানের ভিত্তি হচ্ছে সকলকে, বিশ্বকে বরণ করে নেবার সাধনায়—এই প্রসঙ্গটি রোলাঁর ভাল লাগায় আমায় অনুরোধ করেন এই ভাবে কোন একটা আলোচনা তুলতে তাই স্থির করেছি India and Internationalism—a reading of History বলে একটা প্রবন্ধ পড়ব ইংরাজীতে, Bertrand Russel, Far Eastern Problems এর উপর বলবেন্ সুতরাং তার পর India সম্বন্ধে আলোচনা খুব উপযোগী হবে বলে এঁদের বিশ্বাস। সুতরাং আগষ্ট মাসে এঁদের বৈঠকে যোগ দিতে Varese যাচ্ছি রোলাঁর আদেশ না মেনে উপায় নেই—মাথা পেতে নিয়েছি।—আপনার আশীর্ব্বাদ চাই।

"মুক্ত ধারা" পড়ে খুব উপকৃত হয়েছি ; ইংরাজী অনুবাদটি পেলেই রোলাঁকে পাঠাব তিনি অত্যন্ত সুখী হবেন ; দেশী বিদেশী আর্য্য অনার্য্য কত ওস্তাদ গড়া যন্ত্র কতকাল ধরে ভারতের প্রাণকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছে সত্য কিন্তু এটাও কম সত্য নয় যে বার বার যন্ত্রীদের গর্ব্ব চূর্ণ করে মুক্ত ধারা ছুটেছে যখনই সব বাঁধন ভেঙ্গে ছুটেছে তখনই বড় মানুষ দেখা দিয়েছেন, বুদ্ধ অশোক, কবীর চৈতন্য জন্মেছেন ; তখন আর ছোট বড়, শ্রেষ্ঠ নিম্ন অধিকারী ভেদ টেঁকেনি ; সমস্ত বর্জ্জন বিধি ভাসিয়ে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষ মিলেছে সেই সব যুগসন্ধিতেই ভারত যথার্থ সৃষ্টি করেছে, পূর্ণ প্রাণে নিয়েছে এবং দিয়েছে—ভাবে শিল্পে সাহিত্যে তার অমরকীর্ত্তি রেখে গেছে ; বিশ্বকে দেশের মধ্যে ভরা যায় না ; দেশই আছে বিশ্বের বুকের মধ্যে এইজন্তে বিশ্বের দিক থেকেই দেশকে বুঝতে হবে একথা আপনি কত কাল থেকে বলে আসছেন ; সাময়িক উত্তেজনার বেগে সেকথা না শুনলেও এক দিন বুঝবে এই হচ্ছে ভারত-ইতিহাসের মর্ম্মকথা ; এটা আপনি ভক্ত থেকে যেতে দেন নি সমস্ত প্রাণ দিয়ে প্রচার করে জীবন্ত করে গেছেন।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন ইতি

স্নেহের  
কালিদাস

পুনশ্চঃ—

প্রবন্ধটা লিখতে যেয়ে আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন জাগছে—আপনার কাছে একটু আলোক পাওয়া বিশেষ দরকার :—

(১) পারসীক (Darvis) ও গ্রীক (Alexander) দের অভিযোগের সময় থেকে সুরু করে শক, হুনার, হুন, অভিযান পর্য্যন্ত দেখছি হাজার বছর ধরে আমরা নানা জাতির কাছে আঘাত পেয়েছি আঘাত করেছি অথচ অজ্ঞাতসারে মিশে এক হয়ে গেছি। সংহিতা-কারদের দল—মনু যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি এই সংমিশ্রণকে ঠেকাতে পারেন নি তাঁদের বিধি ব্যবস্থার জোরে। সুতরাং সে গুলো প্রায় theoryই থেকেই গিছল। এই রকমে নিষেধ এড়িয়ে নানা জাতির সঙ্গে মিশ্রনের ফলে রাজপুতদের মত এক বীর উদার মনুষ্যত্বপূর্ণ জাত গড়ে উঠেছিল—ঠিক মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে যেন সমগ্র জাতীর বর্ম্ম হয়ে ; কিন্তু (২) মুসলমান আক্রমণ এই বিকাশধারাকে যেন ছিন্ন ভিন্ন করে দিলে—কেন সেজন্যই হয়ে আমাদের মন নানা অদ্ভুত অস্বাস্থ্যকর বিধি নিষেধের মধ্যে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করলে ; মানুষের সঙ্গে মানুষ আর মিল না পেয়ে গরমিল গুলোই বড় করে তুলতে লাগল—প্রায় হাজার বছর হতে চলল তবু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গরমিল গেল না—অবশ্য নতুন সংগ্রাম নতুন আধ্যাত্মিকতা জাগাল—একদিকে কবীর নানক চৈতন্য আর এক দিকে আকবর সাজাহান উঠলেন—যেন সুদূর ভবিষ্যতকে ইঙ্গিতে সূচনা করতে ; কিন্তু ভেদ রয়ে গেল।

এই ভেদ কতটা থাকবে—কতটা যাবে? মুসলমান জাতি, ধর্ম্ম, সভ্যতাকে না মেনে আমাদের উপায় নেই—

[illegible] সেটা কি শুধু মনে পড়ে যায় বলে কল্পনা করার মধ্যে থাকবে? সমস্যা কি ভাবে কি মনে হবে? (৩) সভ্য, সুসংবদ্ধ, কৃতী পাশ্চাত্য জাতরাও এসে পড়েছে আমাদের বুকের উপর কেউ commercial, কেউ colonial, কেউ anthropological interest নিয়ে—অনেকখানি জুড়ে বসেছে, অনেকটা এদের হাতে আমরা গিয়ে পড়েছি—হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী—এদের সঙ্গে কি ভাবে কোন ক্ষেত্রে আমরা মিলব?

(৪) জাতি, ধর্ম, সভ্যতা ও নিয়ন্তাদের স্বার্থের বিভিন্নতা যখন কালের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক সত্য, তখন সে গুলো থাকা সত্ত্বেও মানুষ মানুষের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যথার্থ বিশ্বজনীনতার ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারবে কি না—যদি পারে তাহলে ভারত এই কাজে কি ভাবে সাহায্য করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

এইভাবে মোটামুটি আমার সমস্যা আপনাকে জানাচ্ছি—যা বলতে পারি না তা আপনি অনেক সময় আমাদের চেয়ে ভাল করে বুঝে বলেন এই ভরসায় লিখছি।

---

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজ বাদল নেমেছে। তাই আমার মনটা মানব-[illegible] তারিখ-চিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশ-মরুভূমিতে জলবাতাসের মাতনের যুগযুগান্তর-সঞ্চিত স্মৃতিস্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্তব্যবুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল, সম্প্রতি আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল বনস্পতিদের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণবাক্যে ওদের হ'ল বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের মৌসুমবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ করে চলেচে। ওরা মানুষের মত আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার সম্পর্কের চোটে আদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসেনি। তাই জঙ্গলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ ব'লে অবজ্ঞা করে না। এই জন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিবাগী করে' প্রাণের খেলাঘরে ডাকতে থাকে—আমাদের মর্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে প্রাচীন পূর্বজ, সেই আমার কর্ম-শালাটি দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সুরে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরি করচি—সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সব চেয়ে কমমানুষ হয়েচি—আমার মন ঘাসের মত কাঁপচে, পাতার মত ঝিল্‌মিল্ করচে। কালিদাস এই উপলক্ষ্যেই বলেছিলেন, "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।" অন্যথা-বৃত্তি হচ্চে মানববৃত্তির গণ্ডির বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের সেই সুদূরকালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চল্‌চে, মনের মাষ্টারী সুরু হয় নি—আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেচে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। যাই হোক্, এই সময়টাতে ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত, মাঠে মাঠে বাদল হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেচে, আর ছোট ছোট চঞ্চল জলধারা ইস্কুলছাড়া ছাত্রদের অকারণ হাসির মত চারদিকে খিলখিল্ করচে। আজ এই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েচে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের [illegible] মুখর হয়ে উঠল। ঘনমেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেচে—তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লিরাও নিমন্ত্রণ পেয়েচে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে "মত্তদাদুরী।" এ আসরে আমার আসন পড়েনি যে তা মনেও করো না। [illegible] জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে যাব, আমি [illegible] নই। মেঘের গুরু মেঘের [illegible] গান [illegible]

দিনের পর দিন—আর কোন গুরুত্ব নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই—মেঘ যেমন "ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" সেও যেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জন ধ্বনিতে গান ধরেচি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেচে
আমার মনে ;
আমার ভাবনা যত উতল হ'ল
অকারণে

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান সমস্তার সমাধান কি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল মানব সংসারে আমার কাজ আছে,—শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চল্‌বে না, মানব ইতিহাসের যে সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আস্‌তে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্ম্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র :—সে হচ্চে খৃষ্টান আর মুসলমান-ধর্ম্ম। তারা নিজের ধর্ম্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্ম্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্ম্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এই জন্যে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্ম্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃষ্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। "য়ুরোপীয় বৌদ্ধ" বা "য়ুরোপীয় মুসলমান" শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে-জাতির নামকরণ ধর্ম্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। "মুসলমান বৌদ্ধ" বা "মুসলমান খৃষ্টান" শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মত। অর্থাৎ তারা ধর্ম্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্যপ্রভেদটা হচ্চে এই যে অন্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্ম্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্ম্মের সঙ্গে তাদের Non-violent non-cooperation। হিন্দুর ধর্ম্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেচে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টান্‌তে পারে নি। আচার হচ্চে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেচে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারী-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মত দুই জাত একত্র হয়েচে;—ধর্ম্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় আচারে প্রবল,—আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয় ধর্ম্মমতে প্রবল,—এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কি করে মিল্‌বে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো সে "হিন্দু" যুগের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে। হিন্দুযুগ হচ্চে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ,—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোন প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সাম্‌লাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক মোট কথা হচ্চে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে

ছিলেন অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও আচার থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মত করেই গড়ে তুলেছিল —এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মত মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্ত্তনে, যুগের পরিবর্ত্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডীর বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্ম্মকে কবরের মত তৈরি করে তারি মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চল্‌বার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেল্‌বার উপায় নেই। আমাদের মানস প্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোন রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড় এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেল্‌তে হবে তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু মুসলমানের মিলন, যুগপরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আস্‌ব; যদি না পারি তবে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৯।

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# আশ্রম সংবাদ

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিশ্বভারতীর কাজ খুলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগের পুরাতন ছাত্র, ও অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই আসিয়াছেন।

উত্তর বিভাগে এবার একজন চীনদেশীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত এল কুন-অ্যাং যোগদান করিয়াছেন। ইনি ব্রহ্মদেশে শিক্ষালাভ করিয়া সিংহলে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন, সেখান হইতে বিশ্বভারতীতে ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছেন। ইহা ব্যতীত গুজরাট হইতে ৮জন, অন্ধ্রদেশ হইতে ৫জন, মহারাষ্ট্র হইতে ১জন, সিন্ধুপ্রদেশ হইতে ১জন, মোট ১৫জন ছাত্র বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগে গ্রীষ্মাবকাশের পর যোগদান করিয়াছেন।

অধ্যাপক লেভি এখনও নেপালে আছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর মধ্যে একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া নেপালের মহারাজ তাঁহাকে নেপালে আরও একমাস-কাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সম্ভবত ২৪শে জুলাই নাগাদ তিনি সস্ত্রীক নেপাল হইতে রওনা হইবেন।

ছুটির পরও পূজনীয় গুরুদেব বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগে বাংলা সাহিত্য অধ্যাপনা করিতেছেন। সন্ধ্যার সময় প্রায় প্রত্যহই ছাত্র ও অধ্যাপকদের লইয়া তিনি বর্ত্তমান যুগের নানা সমস্যা সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা করিতেছেন। চিত্রকলা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যে মনোজ্ঞ আলোচনাটি হইয়াছিল তাহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। গত ৮ই জুলাই মহাকবি শেলির শতবার্ষিক [illegible] উপলক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইটি সভা হইয়াছিল। প্রাতঃকালের সভায় গুরুদেব কবি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যায় বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশি মহাকবি সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত [illegible] দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সভার আরম্ভে ও শেষে বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা দুটি গান গাহিয়াছিলেন। [illegible]

আলোচনা সভায় ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তা কথা প্রসঙ্গে বলেন খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ণ ইতিহাস লেখা হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের কাহিনী এখনও অন্ধকারে আবৃত, এখনও তাহার আবিষ্কারের কাজ নানাস্থানে চলিতেছে। সেদিন স্যর এ, ষ্টিন (A. Stien) চীন-তুর্কীস্থানের মরুভূমির মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া যে তথ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁর নূতন বই serindiaতে প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্প্রতি যে সকল আলোচনা হইতেছে তাহা হইতে মনে হয় খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে প্রবেশ করে। বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে আশ্চর্য্য মিল আছে। পূর্ব্বেকার সকল ধর্ম্মের মধ্যেই একটা প্রতিশোধের প্রবৃত্তি দেখা যায়। চক্ষুর বদলে চক্ষু, দন্তের বদলে দন্ত, এই ছিল তাহাদের বাণী। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম এক নূতন সত্য প্রচার করিল; বুদ্ধ বলিলেন—প্রেমের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে হইবে। এ কত বড় বাণী!—এই পরম সত্য জগতের নানাজাতিকে আকর্ষণ করিয়া লইল। খৃষ্ট ধর্ম্মেরও বাণী ইহাই। বৌদ্ধধর্ম্ম যে বাণী সারা এশিয়াতে প্রচার করিয়া ইউরোপের দ্বারে আনিয়া দিয়াছিল, খৃষ্টধর্ম্ম সেই বাণী এশিয়ার প্রান্ত হইতে সারা ইউরোপে প্রচার করিয়াছে।

কয়েকদিন সন্ধ্যাকালীন পাঠসভায় ফরাসী লেখক Racineএর রচিত Berenice নামক নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ বাংলায় অনুবাদ করিয়া পূজনীয় আচার্য্যদেব শুনাইয়াছিলেন।

বিশেষ কাজে তাঁহাকে সম্প্রতি কলিকাতা যাইতে হইয়াছে। সেখান হইতে তাঁহার শিলাইদহ অঞ্চলে দুই একদিনের জন্য যাইবার কথা আছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় বিশ্বভারতীর একটি শাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। গুরুদেব এই শাখাসমিতির উদ্বোধন করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এবং Mr. Elmhirstও কলিকাতা সমিতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছেন—আগামী মাসের ইহাদের সেখানে প্রবন্ধ পাঠ করার কথা আছে। বিশ্বভারতীর অধ্যাপকগণ মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গিয়া সমিতির কার্য্যে যোগদান করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। সমিতি রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন—বিশ্বভারতীর সাধারণ সভা সেখানেই হইতে পারিবে।

যে কয়েকদিন গুরুদেব কলিকাতায় থাকিবেন, সে কয়েকদিনের মধ্যে মাঝে মাঝে বিশ্বভারতী সম্মিলনী দ্বারা পরিচালিত সভায় তাঁহার বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

পরলোকগত কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি সভায় গত ১০ই জুলাই তিনি কলিকাতায় সভাপতি হইয়াছিলেন, তদুপলক্ষে যে কবিতাটি তিনি পাঠ করেন তাহা শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মিঃ এণ্ড্রুজ মধ্যে দু তিন দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বভারতীর ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাস পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিঃ বেনোওয়া ফরাসী ভাষার ক্লাসগুলির সম্পূর্ণ ভার ছুটির পর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমোদারঞ্জন ঘোষ এম, এ, বি, টি এবং শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল মল্লিক আসিয়া যথাক্রমে পূর্ব্ব এবং উত্তর বিভাগের অধ্যাপনায় যোগ দিয়াছেন।

ছুটির পরে ছাত্রীবিভাগে একজন নূতন ছাত্রী আসিয়াছেন, আর একজনের শীঘ্রই আসিবার কথা আছে। আরো অনেক ছাত্রী আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপাতত ছাত্রীনিবাসে আমাদের আর স্থান নাই।

ছাত্রীনিবাসের কাছেই হাঁসপাতালের সম্মুখের অপরিষ্কার বাগানটি ছাত্রীরা নিজেদের হাতে বড় বড় গাছ জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছেন—এখন সেই জমিতে তাহারা প্রত্যহ গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে আবর্জ্জনা পুঁতিয়া জমি যাহাতে উর্ব্বর হয় তাহার জন্য উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিয়া

দিয়াছেন—আশা করা যায় তাঁহাদের বাগান শীঘ্রই ফলে ফুলে শাক সবজীতে ভরিয়া উঠিবে।

শ্রীযুক্তা সরযুবালা দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঢাকার হিন্দু বিধবাশ্রম হইতে একটি মহিলা কর্ম্মী সম্প্রতি ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের কার্য্যে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন। ছাত্রীরা গত সপ্তাহ হইতে নিয়মিতরূপে সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কলাবিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিতেছেন। কলিকাতার Oriental Art Society জার্ম্মানির চিত্রপ্রদর্শনীতে ছবি পাঠাইবেন—এখান হইতে কলাবিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রায় ২০ খানি ছবি এই উপলক্ষে সোসাইটিতে পাঠান হইয়াছে।

গ্রীষ্মাবকাশের পর সম্প্রতি কলাবিভাগ হইতে খোদাইর কাজ (Engraving.) (Dyeing, ) কাপড় রং করার কাজ বই বাঁধানর কাজ (Book-binding) সূচীকর্ম্ম বা সূজনী (Needle-work) দেওয়ালে ছবি আঁকা (Fresco) প্রভৃতি কাজের শিক্ষা ছাত্র ছাত্রীদের দিবার আয়োজন হইতেছে।

বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অনেক। ইঁহারা আজকাল গুরুদেবের বর্ষার নূতন গানগুলি শিখিতেছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক উৎসাহ এবং নৈপুণ্যের সহিত ছাত্র ছাত্রীদের এদিক দিয়া সর্ব্বদাই যে সাহায্য করিতেছেন, তাহার জন্য আশ্রমবাসী সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছেন।

সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয়কে আজকাল গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় নিয়মিত ক্লাশের উপরও একটি ছাত্র ও চারিটি ছাত্রী সহ প্রত্যহ বহুক্ষণ ধরিয়া বীণাবাদন অভ্যাস করিতেছেন।—গ্রীষ্মাবকাশের সময় তিনি শ্রীযুক্ত সজ্জনেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে কতকগুলি সুন্দর বীণা পিথাপুরম হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছেন।

আশ্রম-সম্মিলনীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। গত পূর্ণিমা সম্মিলনীর অধিবেশনে কয়েকটি গান, একটি হেঁয়ালী নাট্য এবং হাস্য কৌতুকের ব্যবস্থা ছিল। সভায় সকলেই বেশ আনন্দ পাইয়াছিলেন। ছেলেদের নিজেদের পত্রিকাগুলি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। সাঁওতালগ্রামের ছেলেরা এখন চাষের সময় বলিয়া নিয়মিত পড়িতে আসে না, তাহাদের পড়াইবার জন্য প্রত্যহ বিকালে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র যাইতেছে। ভুবনডাঙ্গায় প্রসাদ-বিদ্যালয়ের কাজ ভালই চলিতেছে। সেই বিদ্যালয়ের জন্য বেতন দিয়া আরো ভাল একটি শিক্ষিত শিক্ষক রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বিশ্বভারতীর পূর্ব্ববিভাগের বিভিন্ন ক্লাশগুলির মধ্যে আষাঢ় মাসে সুহৃদকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। সকলেই জানেন, পরলোকগত আশ্রম-ভ্রাতা সুহৃদকুমার সেনের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার সহপাঠীরা ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এবৎসর ৬ষ্ঠ বর্গের ছাত্রেরা শেষ ম্যাচে পঞ্চম বর্গকে হারাইয়া কাপটি লাভ করিয়াছেন। পঞ্চম বর্গের ছোটছেলেদের খেলা খুব ভাল হইয়াছিল।

ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ বিদেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ারীং শিখিয়া আসিয়া জামসেদপুরে কাজ করিতেছেন তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিদ্যালয়ের কলকারখানা মেরামতের কাজে সাহায্য করিতেছেন।

জার্ম্মানী হইতে প্রেরিত পুস্তকগুলি কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, শীঘ্রই সেগুলি আমরা লাইব্রেরীতে পাইব। বৃষ্টির জন্য লাইব্রেরী ঘরের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা মেরামত হইয়া গিয়াছে। লাইব্রেরী শীঘ্রই পূর্ব্বের মত ব্যবহারযোগ্য হইবে।

বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগ দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে। কৃষি-বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির দরিদ্র লোকদের লেখা-পড়ার জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। অনেকগুলি ছাত্র সেখানে নিয়মিত পড়াশুনা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ম্যাজিক লণ্ঠনের সহযোগে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে। কয়েকটি গ্রাম মিলাইয়া দুইটি "স্কাউট" এর দল

গঠন করা হইয়াছে। স্কাউট-এর শিক্ষার প্রতি গ্রামবাসী ছোটবড় সকলেরই আশাতীত উৎসাহ দেখা যাইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দরিদ্র রোগীরা প্রায় প্রত্যহই চিকিৎসার জন্য কৃষিবিভাগে আসিতেছে। Scout-এর First aid-এ যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন।

গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সকল লোকই কৃষি-বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম দেখিতে প্রায়ই আসিতেছে। মোটার ট্র্যাক্টার সহযোগে চাষ, Tube well-এর কাজ, ছাত্রদের ক্ষেতের কাজ দেখিয়া গ্রামবাসীদের উৎসাহ বাড়িতেছে, 'বাবু'-সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ক্রমশ দূর হইতেছে।

কৃষিবিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও Scout-এর First aid এবং Fire Drill-এর অভ্যাস করিতেছে। ছুতারের কাজও ছাত্রেরা বেশ দক্ষতার সহিত শিখিতেছে।

কৃষি বিদ্যালয়ের চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে ছাত্রদের বিশেষ মনোযোগ আছে। ছাত্রেরা বাগান এবং ক্ষেতের কাজ খুব উৎসাহের সঙ্গে করিতেছে। ইতিমধ্যেই তাহাদের ক্ষেত চীনাবাদাম, বরবটী, দেশী ও বিলাতী ভুট্টা, শসা বেগুন প্রভৃতিতে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। পাঁচ মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় ম্যালেরিয়ার বীজে-ভরা এই জঙ্গলী বাগানের জমিটা এখন ক্রমশঃ চাষ এবং বাসের উপযোগী হইয়া উঠিতেছে।

'সুরুল কৃষি-সমিতি' নামে একটি সমিতি বিদ্যালয়ে স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্র এবং অন্যান্য কর্ম্মীরা এই সমিতির সভ্য। অসুবিধা, অভিযোগ, নিয়মশৃঙ্খলার যাবতীয় আলোচনা এবং নূতন প্রস্তাব সমিতির মাসিক অধিবেশনে আলোচিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করা হয়। কৃষি-বিদ্যালয় হইতে 'চাষা' নামে হাতে লেখা একটি মাসিক পত্র বাহির হয়—প্রত্যেক ছাত্র নিজের কাজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত করে। ছাত্রেরা পনর দিনের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজন নায়ক নির্ব্বাচন করে এবং তাহারা নিজেদের আহারের ব্যবস্থা করে। তাহারা সপ্তাহে দুইদিন বিকালবেলা শান্তিনিকেতনে থাকিয়া সেখানকার সাহিত্যসভা, বক্তৃতা বা আলোচনায় যোগদান করে। আর, প্রতি বুধবার শান্তি-নিকেতনের ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের ফুটবল ম্যাচ হয়।

আমেরিকা হইতে কুমারী গ্রীন নামে একটি মহিলা শীঘ্রই সুরুলে আসিয়া বিশ্বভারতীর কার্য্যে যোগদান করিবেন। এই মহিলাটি শুশ্রূষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং First aid প্রভৃতি বিদ্যায় সুশিক্ষিতা।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের গৃহটি এখন ঋণমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে প্রাক্তনদের সামগ্রী হইয়াছে। এখন, কিছু আসবাব পত্রের বিশেষ প্রয়োজন। সঙ্ঘের সভ্যগণ যদি বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র একশত টাকা চাঁদা তুলিয়া সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের নিকটে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে একটি প্রাক্তন ছাত্র পঞ্চাশ টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

---

## বৈদেশিক সংবাদ

[ শ্রীযুক্ত রমাঁ রলাঁ সম্প্রতি আচার্য্যদেবকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল:— ]

Villenenol (Vand) Villa Olges,
SUISSE.
*Sunday, May 7, 1922.*

Dear & great Friend,

Paris-এ আমাদের শেষ দেখা হওয়ার পর আমি আপনাকে লিখিনি, কিন্তু তাই বলে আমার মনের মধ্যে আপনার সঙ্গ যে আমি কিছু কম অনুভব করেছি তা নয়। দেশের দূরত্ব এবং ব্যবধান সমস্ত অতিক্রম করে আমাদের চিন্তার ধারা মিলিত হয়েছে,—আমাদের কথা বলবার দরকারই হয়নি।

আমার ইচ্ছা আছে, যদিও জানিনা কবে এ ইচ্ছা

পূর্ণ হবে, ভারতবর্ষে গিয়ে আপনার সঙ্গে আবার দেখা করি, এবং আমার সামান্য শক্তিদ্বারা যতটা সম্ভব বিশ্বমানবের হিতের জন্যে আপনি যে বিরাট মিলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার কাজে সাহায্য করি। একটা প্রধান বাধা হচ্ছে এই যে আমি ইংরাজিতে কথা বলতে পারিনা, এবং আপনার ছাত্রেরাও ফরাসী ভাষা জানেনা। কিন্তু তৎসত্বেও আমি গেলে আপনাদের যদি কোনোভাবে কিছুমাত্র উপকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা'হলে একবার আমি আপনাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসব। এ বছরে ত আ'র হয়ে উঠল না, আমার অসুস্থ শরীর যদি আবার বেঁকে না বসে, ১৯২৩ সালের হেমন্তে কি শীতকালে আমার জীবনের এই বহুদিনের নিভৃত বাসনাকে সফল করে তুলতে চেষ্টা করব।

ইতিমধ্যে Paris-এ আমরা একটি পত্রিকা বার করতে চেষ্টা করছি যাতে জাতীয়তার আদর্শকে খুব বড় করে দেখা হবে, কোনো সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের প্রভাব থাকবে না; এবং শুধু যে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চিন্তাপ্রণালী সেখানে সমান আদৃত হবে তা নয়, সেখানে এশিয়ার চিন্তা'কও বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আমি যা ভাবছি সেভাবে যদি কাজ হয় তবে এই অক্টোবর মাসেই কাগজ বের করা যেতে পারবে, আর তাহলে আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে আপনি আমাদের প্রথম সংখ্যাতে আপনার নাম দিয়ে তা'কে সম্মানিত করুন। আমি আশা করি আপনার ইউরোপ থেকে লেখা চিঠিগুলির ফরাসী তর্জ্জমা বার করলে হয়ত আপনি আপত্তি করবেন না, কোনো ইংরিজি কাগজে আমি এর কিছু কিছু অংশ পড়েছি। এখন ছাপানো হলে আমরা ঐ চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে আমাদের জীবনের একটা খুব নিকট রকমের সম্বন্ধ অনুভব করতে পারব। আপনি কি অনুগ্রহ করে জানাবেন এ বিষয়ে কোনো কারণে আপনার অসম্মতি আছে কি না? এ ছাড়া, আমাদের পত্রিকার দুটি তরুণ সম্পাদক—আমার বন্ধু Rene Arcos এবং Paul Colin—এ'রাও এই নিয়ে আপনাকে লিখবেন।

আমি এই অল্পকাল হল বরাবরকার মত আমার Paris-এর ঘরগুলি ছেড়ে দিয়ে Savoy Alps থেকে অদূরে Lemon হ্রদের উপরে একটি ছোট্ট Swiss বাড়ীতে এসে সংসার পেতেছি। Paris এর কর্ম্মজীবন, তার নৈতিক আবহাওয়া আমি আর সহ্য করতে পারলাম না; তার শকট-শব্দ মুখরিত পথঘাট, তার অন্তহীন পথিকপ্রবাহ আমাকে পীড়িত করছিল। যতদিন সেখানে আমাকে থাকতে হয়েছিল এবং আমি নিজের গানবাজনা স্বপ্নের মায়াজালে মনকে নিয়ত ভুলিয়ে রাখতাম বলেই সেখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আমার বিশ্বাস 'মানুষ' যেখানে বহু সেখানকার কোলাহল থেকে বিদায় নিয়ে নিভৃতে বসে চিরন্তন মানব-হৃদয়কে উপলব্ধি করার সাধনায় দিন কাটানোর অধিকার আমি এখন অর্জ্জন করতে পেরেছি। এখানে আমার চারদিকে অনাবিল শান্তি, তরু-মর্ম্মর-ধ্বনির সঙ্গে মিশে যাওয়া অদূর বালুকাতীরে ঢেউএর অস্ফুট একটুখানি শব্দ, আর নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর থেকে ভেসে-আসা শীতস্পর্শ-বহ স্নিগ্ধ সমীরণ।

আপনার দিনও যেন কল্যাণে ও লাবণ্যে ভরে ওঠে। আপনার প্রতি আমার যে পবিত্র ভালবাসা তা জেনে আপনি একটুখানি মধুর আনন্দ অনুভব করুন এই আমার প্রার্থনা।

আপনার অনুগত বন্ধু,
Romain Rolland.

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ | ভাদ্র আশ্বিন, সন ১৩২৯ সাল। | ৮ ও ৯ম সংখ্যা

## মন্দিরের উপদেশ

৬ই ফাল্গুন বুধবার ১৩১৮

প্রভাতে আমরা যে-একটি রসের দ্বারা বিশ্বকে পূর্ণ দেখ্‌তে পাই সে হচ্চে শান্তরস। এই শান্তরসটি হচ্চে ভূমার রস, পরিপূর্ণতার রস।

ভোরের বেলা প্রকৃতির মধ্যে এই ভূমার এই পরিপূর্ণতার আনন্দ উপলব্ধি করি কেন? কেননা নিদ্রাভঙ্গের প্রথম মুহূর্ত্তে আমাদের সংসার তথনো চারিদিককে আচ্ছন্ন করে দাঁড়ায় নি। ব্যক্তিগত প্রয়োজন, সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও রাগবিরাগের পরিবেষ্টনী দিয়ে আমরা নিখিলজগৎকে তথনো ছোট করে আবিল করে' তোলবার সময় পাইনি। তাই সহজেই সমস্তকে সমস্তের অতীতের মধ্যে, বিশ্বকে অনন্তের পটভূমিকার মধ্যে দেখ্‌তে পাই।

শান্তি পাই সেইখানেই যেখানে আমাদের ভাবে বা কর্ম্মে আমরা নিজেকেই না দেখে' নিজের চেয়ে বড়কে দেখি। যাকে আমরা সুন্দর বলি তার মধ্যেও এই কথাটি আছে। সৌন্দর্য্য, সুন্দর বস্তুতে, বস্তুর চেয়ে বড়কে প্রকাশ করে, তাই আমরা আনন্দ পাই। একটি গান যথন শুন্‌লুম তথন তার সমস্তটাই শোনা হয়ে গেল,—কিন্তু সে থাম্‌ল বলেই ত শেষ হল না। তার পূর্ণতা তার সমাপ্তিকে অতিক্রম করে' আমার মনকে আনন্দিত করতে থাক্‌ল। তার প্রধান কারণ, গান ত সুরের সমষ্টিমাত্র নয়,—যেথানে সে আপন সমষ্টির অতীত সেই-থানেই সে আমাদের আনন্দ দেয়, সেইথানেই তার মধ্যে আমরা শান্তি পাই। আমাদের এই আশ্রমকে সর্ভে করে' যদি কেউ তার একথানা ম্যাপ এঁকে দেয় তবে সেই ম্যাপে আমরা যে থবরটুকু পাই সে ঐ ম্যাপের রেথার মধ্যেই বদ্ধ; এই ম্যাপের রেথায় আমাদের কাজের সুবিধে আছে কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নেই; সেই সুবিধাটুকু কোনো কারণে ফুরিয়ে যাবামাত্র এই ম্যাপের আর কোনো মূল্যই থাক্‌বে না। কিন্তু একথানি ভালো ছবির আসলকথাটি রেথাসমষ্টিকে অবলম্বন করে' রেথার অতীতকে প্রকাশ করে—তাই সেই ছবিতে আমার সাংসারিক কোন প্রয়োজন না থাক্‌লেও তার সঙ্গে আমার চিত্তের আনন্দসম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটে না।

আমাদের নিজের জীবন সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, আপিসে যাচ্ছি, ছেলেমেয়ের বিয়ে দিচ্ছি, টাকা জমাচ্ছি, আর তার হিসেব রাখ্‌ছি, এই সমস্তর মধ্যে যখন নিজেকে প্রকাশ করি তখন জীবনযাত্রার এই গণ্ডি রেখাই আমাদের সমস্তটাকে কৃপণের মত আত্মসাৎ করে রাখে—আত্মার যে ঐশ্বর্য্য আমাদের সকল স্বার্থের, সকল ভোগের অতিরিক্ত, যা অসীমের দিকে প্রসারিত, তাকে দেখা যায় না। যতক্ষণ আমার জীবন তার প্রতিদিনের কর্ম্মসমষ্টিরূপে, তার দিনরাত্রির বারবার আবৃত্তিরূপেই দেখা দেয় ততক্ষণ শান্তি নেই, কেবলই ঝগড়াঝাঁটি ঈর্ষা বিদ্বেষ।

ব্যক্তিসম্বন্ধে যে কথা জাতিসম্বন্ধেও তাই। আজ যুদ্ধের অবসানে য়ুরোপে সর্ব্বত্রই শান্তিলাভের জন্যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস দেখা যাচ্চে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো জাতি আপন জাতীয়তাকেই সর্ব্বপ্রযত্নে একান্ত করে' তুলতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার মধ্যে আপনার অতীত বৃহৎমানুষকে প্রকাশ না করে, ততক্ষণ কিছুতেই সে গায়ের জোরে ব্যবস্থার জোরে শান্তি পেতেই পারে না। যে জাতি নিজের জাতীয়তার সীমার দ্বারা পরিবেষ্টিত সে নিজের এই সীমাকেই উদ্যত করে' অন্যসকলকে নিয়ত আঘাত করতে থাকবেই—তার প্রকৃতি স্বতই শান্তির বিরুদ্ধগামী হবে।

সঙ্গীত বল, কাব্য বল, চিত্র বল, যে-কোন রচনার মধ্যে যথার্থ সৌন্দর্য্য আছে, বাইরের সমাপ্তিতে তাদের সমাপ্তি নেই। মানুষ যখন নিজের মধ্যে সত্যকে পায়, অর্থাৎ যখন সে কেবলমাত্র নিজেকেই নিজের জীবনের মধ্যে প্রকাশ না করে, ভূমাকে প্রকাশ করে, তখন মৃত্যুতে তার জীবনের অবসান ঘটে না। নক্ষত্র যখন আলোক জ্বালায় তখন অন্ধকারে তার বিলুপ্তি নেই। যে-জীবন নিয়ে আমরা মানবজন্ম যাপন করতে প্রবৃত্ত হয়েচি উপকরণ সংগ্রহের দ্বারা আমরা তাকে সেই পূর্ণতা দিতে পারি নে যে পূর্ণতা মৃত্যুর উপরেও উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে। কেননা উপকরণের মধ্যে অসীমতা নেই।

কেউ না মনে করেন যে, অসীমতার প্রকাশ বৃহত্বের মধ্যে। জুঁইফুলটি ছোট হলেও তার মধ্যে সেই পূর্ণতার স্বরূপ বিরাজ করে যে পূর্ণতা সৌরজগতের গ্রহমালায়। জীবনের সার্থকতাসাধনের জন্যে অসামান্যক্ষমতা ও অসাধারণউদ্যোগের প্রয়োজন হয় না। শক্তিশালীর বৃহৎঅনুষ্ঠান বা বিপুলআড়ম্বরের মধ্যে অনেক মিথ্যা অনেক আত্মবিরোধ দেখা যায়, কিন্তু এমন অখ্যাতনামা অনেক আছে বাইরে দেখতে যাদের দীনের মত, কিন্তু তাদের জীবনের মধ্যে বিশালসমুদ্রের, নিভৃতগিরিশিখরের, অরুণরাগরক্তপ্রভাতের, তারাখচিত স্তম্ভিত নিশীথিনীর শান্তি রয়েচে। মৃত্যুতে রাজামহারাজাদের বিলুপ্তি ঘটে কিন্তু মৃত্যুতে এই সব অকিঞ্চনের বিনষ্টি নয়। মৃত্যু কেবল সীমার জিনিসকেই হরণ করতে পারে, সমস্ত ক্ষুদ্রতার আবর্জ্জনাকেই সে ঝেঁটিয়ে ফেলে; যা' অমৃত, মৃত্যু তা'কে বিশ্বের অমৃতের মধ্যেই সঞ্চিত করে, যা' কল্যাণ তাকে বিশ্বের কল্যাণের মধ্যে রেখে দেয়। মৃত্যু হচ্চে সেই রত্নপেটিকা যার মধ্যে জীবনের সমস্ত অমূল্যধনগুলি থেকে যায়। মৃত্যু হচ্চে সেই বিরাম যার মধ্যে জীবনসঙ্গীত আপন সম্পূর্ণতাকে সমে এনে প্রকাশমান করে। মৃত্যু যাকে রক্ষা করে সেই যথার্থ রক্ষিত হল। আমাদের জীবনের যে-কাজকে, যে-সাধনাকে মৃত্যুর কালো কষ্টিপাথরের উপরে কষে উজ্জ্বল দেখ্‌তে পাই তার দ্বারাই আমরা যথার্থ প্রকাশলাভ করি।

---

# মাটির উপর দস্যুবৃত্তি

ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে যখন আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সহিত আমার কয়েক ঘণ্টার জন্য আলাপ হইয়াছিল সে সময়ে তিনি তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়া কৃষিসম্বন্ধীয় একটি কোনরূপ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া দিবার জন্য আমাকে এই শান্তিনিকেতনে

আহ্বান করেন। এই অনুষ্ঠান কিরূপ আকার ধারণ করিবে সে সম্বন্ধে হয়তো আমাদের উভয়েরই মনে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু ইহার আটমাস পরে যখন ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের পুনরায় আলাপ হইল তখন দেখা গেল যে আমরা দু'জনে যে-কল্পনা করিয়াছিলাম তাহা মিলিয়া যাইতেছে। তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আজ তাহারই ভূমিকা। আমি এই বক্তৃতার ধারা অবলম্বন করিয়া আন্তর্জাতিক সমস্যাঘটিত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিব।

আরম্ভেই একটি কথা বলিয়া রাখি। আমি নিজে প্রথমে ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম, তাহারপর কৃষিবিদ্যা ও বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া সেই চর্চ্চায় মন দিয়াছি। সুতরাং যাঁহারা সাহিত্যিক ও যাঁহারা বৈজ্ঞানিক উভয়পক্ষকেই আমার শ্রোতার দলে আমি পাইতে ইচ্ছা করি। যে-কোনো পন্থা অবলম্বন করিয়া হউক প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যসাধনই আমার লক্ষ্য, সুতরাং আমি জ্ঞানচর্চ্চার কোনো বিভাগকেই বাদ দিয়া কথা বলিব না। পৃথিবীর যে-সকল নিত্যব্যবহারের ব্যাপারকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া আমরা মনে করি আমার প্রামাণ্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করিবার জন্য আমাকে তাহাদেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। আপনারা আমার বক্তব্যকে প্রত্যক্ষঘটনার সহিত মিলাইয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।

বিখ্যাত পিয়ানোবাদক ও সঙ্গীতরচয়িতা শোপ্যাঁ ইয়োরোপে পর্য্যটনকালে পোল্যাণ্ড দেশের মাটিতে পূর্ণ একটি রজতপাত্র সর্ব্বদা সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। তিনি যখন তাঁহার মাতৃভূমি পোল্যাণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত হন, সে সময়ে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে বিদায়কালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার-স্বরূপ এই দেশের মাটি প্রদান করেন। আমিও আজিকার এই বক্তৃতায় আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে আপনারা দেশের মাটিকে এইরূপই আন্তরিকভাবে ভালবাসিবেন। আপনারা যে শুধু মাটির ভোগদখলের অধিকারী নন, আপনারা যে মাটির সন্তান এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন। সকলদেশেই ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিকগণ যে এই সত্যটির প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেন নাই তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু মাটির সঙ্গে কৃষিজীবীর নিবিড় সম্বন্ধ; মাটির কথা ভুলিয়া থাকিলে তাহার দিন চলে না। আমি সুরুলগ্রামে বিশ্বভারতীর ভার লইয়াছি তাহাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আমাকেও চাষীহিসাবেই এই অঞ্চলের মাটির পরিচয় লইতে হইবে। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে এই ভূমিখণ্ডের যে অংশটি নীচু তাহা শস্যক্ষেতে শ্যামল হইয়া রহিয়াছে কিন্তু যে অংশ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে, চাষীর লাঙ্গল সেখানে আসিয়া হার মানিয়াছে; সেই কঠিন শুষ্ক জমিতে কোনো শস্যের চিহ্ন নাই। ছেলেরা তাহাকে খেলার মাঠরূপে ব্যবহার করে। এই জমির স্থানে স্থানে আবার কাঁকরে ঢাকা খাদগুলি রক্তবর্ণ কঠিন পাঁজরা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে। এই ভূমিখণ্ডটির যে বর্ত্তমানঅবস্থা দেখিতেছেন তাহার পিছনে কি ইতিহাস প্রচ্ছন্ন তাহা ভাবিয়া দেখুন। এক-কালে ভূমির নীচু অংশে কোনো ধানক্ষেতের অস্তিত্ব ছিল না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আত্মচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে শান্তিনিকেতনের মালভূমি হইতে কেবল দিগন্তবিস্তৃত পতিতজমিই দেখা যাইত এবং ডাকাতের দল ছাড়া জনমানবের সাক্ষাৎ মিলিত না। কিন্তু তাহারপর অল্পকালমধ্যেই এই মাটিকে দখল করিয়া মানুষ এই ভূমিখণ্ডের ইতিহাসকে রূপান্তরিত করিল। সে পরিবর্ত্তনের গতি ধ্বংসেরই দিকে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডও এককালে ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রোমসভ্যতাও যে এই পথ অবলম্বন করিয়াই একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আমি যে সকল অবস্থার কথা আলোচনা করিতে যাইতেছি তাহার সহিত হয়তো আপনাদের পরিচয় আছে,

কিন্তু আমি গত কয়েকমাস যাবৎ তাহার পর্য্যালোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা আমাদের তাঁবু লইয়া বীরভূম জেলার নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। আমরা স্বচক্ষেই দেখিলাম কিরূপ অল্পকালের মধ্যেই এই জেলার মানুষের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। কোনোকোনো গ্রামে গত কয়েকবৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণপরিবারের সংখ্যার এত হ্রাস হইয়াছে যে আশঙ্কা হয় ব্রাহ্মণগণ সেখান হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া যাইবে। দু'একটি গ্রামে তাড়িখানার মালিক ইহাদের ভিটেমাটি কিনিয়া লইয়া ইহাদের জন্য কোথাও আর স্থান রাখে নাই। ইহারাই সর্ব্বপ্রথমে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। বোধহয় এই অধোগতির কারণ এই যে ব্রাহ্মণেরাই গ্রামের শীর্ষস্থানীয়, তাহারা সকলের নেতা ও চালক সুতরাং সমাজদেহে তাহারা পরভুক্‌জীবের ন্যায় কাল কাটায়। আধুনিক কালে জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন হইয়াছে অথচ তাহাদের আহারআচরণ বিধিনিষেধ দ্বারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়াতে তাহাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতেছে।

আমরা আরো দেখিলাম যে ব্রাহ্মণের পরই স্বর্ণকার ও কুম্ভকারগণ সংখ্যায় কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কৃষকশ্রেণীর লোকেরা তবু ম্যালেরিয়ার প্রকোপকে সামলাইয়া অনেকটা বর্ত্তিয়া আছে কিন্তু প্রতিবৎসর তাহাদের মধ্যেও মৃত্যুসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। দেখা গেল যে বর্ষার পূর্ব্বে এই চারিমাসের ভীষণ রৌদ্রদাহে গোমহিষাদি শীর্ণ ও মৃতপ্রায়। নিকটস্থগ্রামের জলাশয়গুলির খনন বা পঙ্কোদ্ধার বহু বৎসর ধরিয়া হয় নাই। কেবল মাঝে মাঝে যৎসামান্য কাদামাটি উঠাইয়া পার্শ্বের ধানক্ষেতে ফেলা হয়। পথঘাট, বাড়ীঘর ও দেবালয়গুলির জীর্ণসংস্কারের জন্য গ্রামবাসীদের কোনো সমবেতচেষ্টার চিহ্ন দেখা গেল না। পুষ্করিণীর তীরস্থ গাছপালা কাটিয়া ফেলা হইতেছে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কোনো নূতন গাছ লাগাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। কেবল কয়েক বিঘা জমিতে ইক্ষু ও আলুর চাষ দেখা গেল কিন্তু বাকি জায়গাতে সম্বৎসর ধানের আবাদ হইতেছে। এই সকল ক্ষেতের মাটি চিরকালই এক অবস্থায় আছে, জলপ্রবাহের দ্বারা নূতন মাটি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিতেছে না। মাটির এই দুর্দ্দশা, তাহার উপর আবার চাষীরা একজোট হইয়া সদ্ভাব রাখিয়া কাজ করে না। এবং রায়তীজমিতে চাষ করিতে হয় বলিয়া দুঃখের অন্ত নাই। মনের অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় তাহারা শুঁড়িখানার আশ্রয় লইতেছে।

দেশের এই যে অবনতি দেখিলাম লেখকেরা তাহার নানাপ্রকারের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন ইহার কারণ প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা, কেহ বলেন ইহার কারণ পানদোষ ও ম্যালেরিয়া, কেহ বলেন দেশে রেললাইন বসাইয়া জলনিঃসরণের পথরোধ করা হইয়াছে, আবার কেহ বা বলিতেছেন দেশের জমিদারেরা ইহার জন্য দায়ী, কারণ তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে গিয়া বাস করে এবং প্রজার স্বার্থ দেখে না। কেহ কেহ গোচারণভূমির অভাব ও জলের অপ্রাচুর্য্যের উল্লেখ করিতেছেন। সহুরেলোকেরা বলিতেছেন যে গ্রামের লোকেদের মধ্যে নিরুদ্যমতা দেখা যাইতেছে, তাই তাহাদের এই দুর্দ্দশা।

এই সকল মতামত লইয়া পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ চাষের মাটির কথা বলা যাক্। মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া উৎকৃষ্টতর ও প্রচুরতর ফসল ফলানোই আমাদের সুরুল কৃষিকেন্দ্রের কর্ত্তব্য হইবে। মাটিকে অবহেলা করিলে গোড়াতেই আমাদের সবকাজ ফাঁসিয়া গেল। আমরা প্রকৃতির খুব বড় একটি নিয়মকে পালন করি না বলিয়া বসুন্ধরার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হই। সে নিয়মটি এই যে, মাটির নিকট হইতে যে-পরিমাণ গ্রহণ করিবে, মাটিকে আবার সেই পরিমাণই ফিরাইয়া দিতে হইবে। বাড়ীতে ভাঁড়ারঘরে যে সঞ্চয় থাকে তাহা খরচ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ক্রমাগত বাহির হইতে রসদ যোগাইয়া রাখিতে হয়, তেমনই ধরিত্রীর যে ভাণ্ডারের চাবির সন্ধান মানুষ জানে তাহা হইতে সে যে-ধন আদায় করিবে তাহার মূল্য যদি ফিরাইয়া না দেয় তবে ধরিত্রীকে ও তাঁহার ভবিষ্যৎ-

সন্তানদিগকে সে নিঃসম্বল করিয়া দেয়। মাটি চাষ করিয়া তাহা হইতে যে-উপাদানগুলি আদায় করিয়া লইলাম, কোনো না কোনো আকারে মাটিকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। পেট্রোল ফুরাইয়া গেলে যেমন হাওয়াগাড়ীর গতি-বেগ থাকে না তেমনই মাটির ঐশ্বর্য্য নিঃশেষিত হইলে তাহার আর প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না।

মানুষের খাদ্য সামগ্রীকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, প্রাণপ্রদখাদ্য, দ্বিতীয় শক্তিপ্রদখাদ্য। আহার্য্যের এই শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ হইলেও ইহাই আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার পক্ষে যথেষ্ট। তৈলপদার্থ মণ্ড ও চিনি শক্তিদায়ক খাদ্য। আকাশ ও মাটি হইতে রৌদ্রজল লইয়া ইহাদের রচনা হয়। যে সকল খাদ্য জীবজন্তুর ও তরুলতার জীবকোষগুলির গঠনে সহায়তা করে তাহাদিগকে প্রাণদায়ক খাদ্য বলা যাইতে পারে। সকল জীবদেহেই কোষ আছে এবং তাহাদের জীবকোষগুলিতে নাইট্রোজেন ও ভাইটামীন থাকে। ইহারা জীবজন্তু ও তরুলতাকে প্রাণবান্ রাখে। তরুলতা কেবল মাটি হইতে এই দুই পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে। ইহা ছাড়া গাছপালার প্রাণধারণের জন্য লৌহ, চুন, পোটাসিয়াম, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ ও ম্যাগ্নেসিয়ামের আবশ্যক হয়। তাহারা এই সকল উপাদানও মাটি হইতে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কৃষক যে-ফসল উৎপাদন করে তাহা দিয়া সে গাছপালার জীবনীশক্তির সহায়ক এই সকল পদার্থকে মাটীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই দানকে সে যদি ফিরাইয়া দিবার চেষ্টামাত্র না করে তবে সে মাটির উপর দস্যুবৃত্তি করিয়া ভবিষ্যৎমানবকে তাহার প্রাপ্যধন হইতে বঞ্চিত করিল।

আমাদের এই সুরুলের জমিও ভবিষ্যতে এক সময়ে বন্ধ্যা হইয়া যাইবে কারণ বছর বছর যে ফসল ফলিতেছে তাহাতে মানুষ ভূমিলক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্যকে তিল তিল করিয়া হরণ করিতেছে। বসুন্ধরার এই রত্নহরণ আমাদের চোখেই পড়ে না, কারণ প্রথমতঃ হয়তো একশত বৎসর অতীত না হইলে আমাদের নিকট এইসত্য সপ্রমাণ হইবার অবসর পাইবে না, এবং দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালাদেশের গঙ্গাজলবিধৌত আবাদের জমিগুলি প্রতিবৎসর নূতন পলির দ্বারা আবৃত হওয়াতে তাহা আবার তাজা হইয়া উঠিতে থাকে। আপনাদের চারিদিকে এই যে আসবাবপত্র, জীবজন্তুফলমূল ও আত্মীয়স্বজনদিগকে দেখিতেছেন ইহাদের সকলকেই পৃথিবীর নাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হইয়াছে। ইহাদের নিকট হইতে পৃথিবীর অংশ আবার পৃথিবী ফিরিয়া পাইবে এইরূপ কড়ার আছে। যে পরিমাণে কড়ারমত তাহার ঋণশোধ না হয় সেই পরিমাণে তাহাকে নিঃস্ব করা হইয়া থাকে, এবং তাহার ভাবী সন্তানসন্ততিদেরও অন্নবস্ত্রের সম্বল হরণ করা হয়।

ধান্য এই জেলার প্রধান শস্য। প্রতি বৎসর বৃষ্টি পড়িলে ক্ষেতে জল জমে, তাহার পর তাহাতে ফসল ফলে ও সে-ফসল কাটিয়া ফেলা হয়। এই জেলার বিশাল ফসলের জমিতে অন্য কোনো শস্য জন্মে না। যখন ধান কাটা হইয়া যায় তখন আবার বর্ষা না আসা পর্য্যন্ত সেই জমিতে গরুমহিষ চরে। কিন্তু কৃষক এই ফসল পাইয়া জমিকে কি প্রতিদান দেয়? তাহার ধান মহাজনেরা অল্পমূল্যে কিনিয়া লইয়া গোলাজাত করে এবং পরে সুবিধামত কলিকাতায় বা কয়লাবদেশে খুব উঁচু দরে বিক্রয় করে। এই রপ্তানির চাল মানুষের উদরস্থ হয় এবং মলমূত্রের আকারে তাহার যে বিকৃতি ঘটে তাহা নালা বহিয়া নদীতে গিয়া পড়ে এবং মাটি হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে-ধান চালান না হইয়া গ্রামেই থাকিয়া যায় তাহা গ্রামবাসীরা সম্বৎসর ধরিয়া নিঃশেষ করে কিন্তু তাহাদের মলমূত্র ক্ষেতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। পুরুষেরা গ্রামে ইতস্ততঃ তাহা বিক্ষিপ্ত করে এবং স্ত্রীলোকেরা তাহা জলাশয়ের মধ্যে ফেলে। এই পুকুরের জলে কাপড় কাচা হয় এবং তাহা পান করা হয়। যদি বা কখনো ইহার পঙ্কোদ্ধার হইল তো তাহার তলদেশের এই ময়লাজলের ধাতবপদার্থ উপরে

ধান ক্ষেতের উপর জমা হইল, তাহাতে জমির সহিত দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ অল্পপরিমাণে বজায় রহিল। এই সকল ত্রুটিকে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, ইহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়া প্রতীকারের চিন্তা করিতে হইবে। এই জেলার লোকদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইতে হইলে আমাদের এই সকল অপ্রিয় সত্যগুলির পর্য্যালোচনা করিতেই হইবে। আমরা প্রকৃতির স্বচ্ছন্দবৃদ্ধির কিরূপ বিরোধিতা করিয়া থাকি তাহার আরো উদাহরণ আছে। ধানের যে বিচালি হয় তাহার কিয়দংশ গরুতে খায় এবং সেই গরুর গোবর কোনো খোলাগর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই গোবর রৌদ্রে শুকাইয়া যায় বা বৃষ্টির জলে ভাসিয়া যায়। গরুর চোনাও গোয়ালে বা পুকুরে নষ্ট হইয়া যায়। কিছু গোবর দিয়া ঘুঁটে হয় কিন্তু তাহার ছাই গ্রামে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলা হয় এবং হয়তো তাহা বৃষ্টির জলে ভাসিয়া যায়। যে-গোবর গর্ত্তে পচানো হয় তাহা নিকটস্থ কোনো ইক্ষু বা আলুরক্ষেতে দেওয়া হয় কিন্তু তাহা ধানক্ষেতে আর ফিরিয়া যায় না। ভাতের ফেন গরুকে খাইতে দেওয়া হয় অথবা নালায় ফেলা হয়! চীনেরা কিন্তু এই ফেনও খাইতে ছাড়ে না। তাহার পর ধানের যে ক্ষুদকুঁড়া ও ভুষা হয় তাহা গরুকে খাইতে দেওয়া হয় কিন্তু তাহাতে সারবান খাদ্যপদার্থ যথাপরিমাণে না থাকাতে গোবররূপে তাহার যে পরিণতি ঘটে তাহাতে জমি লাভবান্ হয় না। যে-বিচালি পাওয়া যায় তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলা হয় অথবা ঘর ছাওয়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। জমির পক্ষে এই বিচালির যে কিরূপ প্রয়োজন তাহা এ দেশের কেহ জানে না। কিন্তু আমার স্বদেশ ইংলণ্ডে আমরা যখন নূতন প্রজাকে জমি দিই তখন এই সর্ত্ত থাকে যে সে ঐ ভূমি হইতে প্রাপ্তসার বিক্রয় করিতে পারিবে না বা বিচালি অন্যত্র সরাইতে পারিবে না। আমরা জানি যে এই সাবধানতা অবলম্বন না করিলে জমি ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহার দর ও খাজনার হার কমিয়া যাইবে। রায়তী-জমির প্রতি কৃষকদের কোনো মমতা থাকে না। তাহারা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খাজনায় জমি লয় সুতরাং তাহারা তাহাকে যথাসম্ভব দোহন করিতে থাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষতিপূরণের কোনো চেষ্টাই করে না। যে দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে গিয়া বাস করে সেখানে অল্পবুদ্ধির লোকেদের হাতে পড়িয়া মাটি শীঘ্রই এই দৈন্যদশা প্রাপ্ত হয়।

ধান ছাড়া অন্যান্য শস্যের কথা ধরা যাক্। ইহাদের মধ্যে আলু ও ইক্ষুর চাষে জমি সব চেয়ে বেশী কাবু হইয়া পড়ে। ইক্ষু মাড়াইয়া রস বাহির করা হইলে তাহার ছোবড়া ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহার ছাই ক্ষেতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। ইক্ষুর পাতাগুলি গরুতে খাইয়া ফেলে। এই ক্ষতি সত্ত্বেও গুড়পদার্থটি মাটির উপর বেশি জুলুম করে না, কারণ তাহা খাঁটি ষ্টার্চ এবং তাহা শক্তিদায়ক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। তাহারপর চাষী যে আলু উৎপন্ন করে, তাহার অধিকাংশ মহাজনের কাছে বিক্রয় করা হয় এবং গ্রামের লোকেরা যতটুকু খায় তাহার মধ্যে আবার খোসা বাদ পড়ে। এই খোসাই আলুর সবচেয়ে সারবান অংশ, কিন্তু তাহা মানুষে না খাইয়া গরুতে খায়। তামাকু, শাকসবজী ও তুলাও জমির উপর কম দাবী করে না এবং তাহারা জমিকে তাহার বদলে কিছুই ফেরৎ দেয় না। তাহার পর মাটির যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান অর্থাৎ পশুপক্ষী ও মানুষ তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। এদেশে গোমহিষ ও মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তাহারা মাটিতে ফিরিয়া যাইতে পারে না। গ্রামে কোনো মহামারী হইলে মৃত গোমহিষাদিকে নিকটস্থ কোনো স্থানে প্রোথিত করা হয়। অন্যসময়ে মৃতগরুর চামড়া কলিকাতার ব্যবসায়িগণের নিকট চালান করা হয়। চামড়া ছাড়া অবশিষ্ট মৃতদেহ পড়িয়া পচিতে থাকে, তাহার হাড়গুলি পরিষ্কৃত হইয়া বাহির হইয়া আসিলে তাহা একত্রিত করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। এই হাড়ের গুড়া দিয়া অতি উত্তম ও মূল্যবান সার প্রস্তুত হয়। জাপানদেশের কৃষিজীবীরা মাটির দরদ বোঝে, তাই সে দেশে এই হাড়ের চাহিদা খুব

বেশি। তাহারা ভারতবর্ষ হইতে এই হাড়ের আমদানি করে এবং এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হয় বলিয়া এখানকার কৃষিবিভাগ এই সারের সাহায্য লইবার বিষয়ে কোনো উচ্যবাচ্য করে না। ফলতঃ বছরের পর বছর মাটির উপর এই মারাত্মক রকমের দস্যুবৃত্তি চলিতেছে এবং তাহার কোনো প্রতীকার হইতেছে না। অন্যদেশের ন্যায় এদেশেও মানুষ মরিলে তাহার মৃতদেহের সংকার বিধির জন্য তাহাতে মাটির কোনো উপকারই সাধিত হয় না।

সহরবাসীরাই সব চেয়ে মাটির উপর বেশি জুলুম করিয়া থাকে। মাটি হইতে উৎপাদিত জিনিসের জন্য তাহাদের আকাঙ্ক্ষার আর পরিতৃপ্তি নাই, অথচ মাটি হইতে প্রাপ্ত আবর্জ্জনাকে তাহারা জ্বালাইয়া ফেলে এবং নালা দিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। তাহাদের বাড়ীগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে নিজেদের এতটুকু জমি নাই যে শাকসবজী উৎপন্ন করে। তাহাদের জীবনযাত্রা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ এবং তাহারা দেশ জুড়িয়া রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সকল কারণে সমস্ত ঝুঁকি পড়িয়াছে কৃষকদের উপর। তাহারাও বেশ উৎসাহের সহিত মাটির উপর জোর খাটাইয়া যতটা পারে আদায় করিয়া লইতেছে। কিন্তু সহরবাসীরা চাষাদের এই শ্রমজাতসামগ্রীর পরিবর্ত্তে যে সকল সভ্যতার উপকরণ যোগাইতেছে তাহাতে মাটির কোনো লাভ হইতেছে না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাটির উপর এই দস্যুবৃত্তির ফলে মানুষের জীবনীশক্তি ও বলবীর্য্যকে তিল তিল করিয়া ক্ষয় করা হইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসিগণ কি খায় তাহা একবার বিচার করিয়া দেখুন। তাহাদের প্রধান খাদ্য ভাত, এবং অনেক স্থলে শুধু ভাত ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাল, চিনি ঘৃত, তেলকে সৌখীন খাদ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদের মধ্যে কেবল ডালেই নাইট্রোজেন আছে। এখানকার গ্রামের লোকেরা প্রায়ই শাকসবজী খায় না। তাহারউপর ভাতের রন্ধনপ্রণালীর দরুণ ভাইটামীনভাগ নষ্ট হয়। তাহলে দেখা যাইতেছে যে তাহারা কেবল শক্তিদায়ক খাদ্যই আহার করিয়া থাকে কিন্তু যে-সকল প্রাণদায়ক খাদ্য পাইলে শরীর সুগঠিত হইয়া ঐ শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারে তাহা তাহাদের ভাগ্যে জোটে না। ভাইটামীন না পাইলে প্রাণরক্ষা করা অসম্ভব। এদেশের লোকেদের এজন্য শরীরের শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে এবং রোগাক্রান্ত হইলে শরীর সেই রোগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না।

সকলদেশে ও সকলকালে সহরবাসীরা তাহাদের কষ্টের জন্য গ্রামবাসীদের গাল পড়িয়াছে। আহার্য্য যখন দুর্ম্মূল্য হয়, তখন তাহার মূলকারণ অনুসন্ধান না করিয়া তাহারা কল্পনা করে যে বুঝিবা আর কেহ তাহাদের ঠকাইয়া লাভবান্ হইতেছে। যত দোষ ঐ চাষার ঘাড়ে পড়িয়াছে। কেহ কেহ বা রাজপথ ও রেলপথের জন্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়াছে বলিয়া এই দুঃখকষ্টের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। অবশ্য রাজপথ ও রেলপথ ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির একটি কারণ, কিন্তু ইহার আরো কারণ আছে। সহরবাসীরা নির্দ্দয়ভাবে জঙ্গলের গাছপালা কাটিয়া ফেলাতে উঁচুজমির মাটি বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইতেছে। এই মাটি নদীর জলে মিশিয়া নরম পলিমাটির জায়গা জুড়িয়া জলচলাচলের বিঘ্ন ঘটাইতেছে। সহরবাসীরা মাটির উপর আরো কি কি দৌরাত্ম্য করে তাহা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল কারণেও ম্যালেরিয়া দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের নিকটেই জলাশয়ের সংলগ্ন যে গ্রামটি আছে তাহার সহিত শান্তিনিকেতনের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে ঐ গ্রামেই ম্যালেরিয়ার অধিক আধিপত্য। ম্যালেরিয়ার মশা ঐ গ্রামের লোকদের কঠিন দেহকে এখানকার শিশুছাত্রদের সুকুমারদেহ অপেক্ষা অধিকপছন্দ করে তাহা তো কেহ বলিবেন না। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রগণ প্রতিদিনের আহারের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে প্রাণদায়ক খাদ্য পায় যথা দুধ, শাকসবজী।

আমরা এই জেলার সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে

মুসলমান চাষারা হিন্দুচাষাঅপেক্ষা মিতব্যয়ী ও সুস্থসবল হইয়া থাকে। এই মুসলমান প্রজারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার হেতু যে রক্তগত ও জাতিগত পার্থক্য তাহা বলা যায় না। হেতমপুর ও সিউড়ীর প্রদর্শনীতে আমরা দেখিলাম যে মুসলমানেরাই গোমহিষকে অধিক যত্ন করে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল যে সে গরুপিছু খাদ্যের জন্য দৈনিক আটআনা খরচ করিতে প্রস্তুত আছে। তাহারাই উৎসুক ও কৌতুহলী হইয়া নূতন কিছু শিক্ষনীয় বিষয় দেখিয়া ও শুনিয়া লইতেছিল। এখানকার হিন্দুরা যদি কোনো সুদূর ভবিষ্যতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায় তবে অন্ততঃ সাঁওতাল ও মুসলমানগণ আরো কিছুকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে। তাহারা খাওয়াদাওয়াব্যাপারে ও আচারপদ্ধতিতে অনেকাংশে হিন্দু অপেক্ষা স্বাধীন। আমি সকলকে মাংস খাইতে বলি না কিন্তু মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর পদার্থ সকলের খাওয়া উচিত। ইয়োরোপীয়গণ বিভিন্ন জলবায়ু হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া যে এখানকার রোগভোগের হাতে পড়িবে তাহাই স্বাভাবিক কিন্তু এদেশের লোকদের তুলনায় তাহাদের স্বাস্থ্য আশ্চর্য্যরূপ সুরক্ষিত থাকে। ইহার কারণ এই যে তাহারা পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে এবং স্বাস্থ্যকর নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলে। দারুণ গ্রীষ্মপ্রধান মেসোপোটেমিয়ায় যে সকল কুলী প্রেরিত হইয়াছিল, আমি দেখিয়াছি যে তাহাদের মধ্যে জাপানী ও চীনেরা ভারতীয়দের অপেক্ষা সুস্থ ও সবল। সেখানে আরব, পারসীক, কুর্দ্দী, মিসরবাসী, জাপানী ও চীনেকুলিরা পরিশ্রমে ও জীবনসংগ্রামে ভারতীয় কুলীদিগকে পরাস্ত করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আবহাওয়ার অপেক্ষা খাদ্যই দেহরক্ষার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়। ঐ বিদেশীকুলীরা দুধ, ডিম, শাকসবজী ও মাংস খায়—এই সকল খাদ্যে প্রোটীন ও ভাইটামীন অধিক পরিমাণে আছে। অনেকে হয়তো বলিবে যে এই দৈহিক বলের কারণ খাদ্য বা জলবায়ু নহে। মাটির গুণেই এইরূপ শক্তিলাভ করা সম্ভবপর। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মাটিকে যেরূপ অবহেলা করা হয় তাহাতে আমি মনে করি এই উক্তি অনেকাংশে সত্য। কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে তার জন্য আমরাই দোষী এবং ইহার প্রতীকারের ভার আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে আছে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া কিছু ফল হইবে না। ভূমিকে সুফলা করিয়া তুলুন সমবায়প্রণালীর দ্বারা সকলের সহিত সহযোগিতা করুন তবেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। পৃথিবীর পূর্ব্বইতিহাস আমাদের এই পথেই চলিতে শিক্ষা দিতেছে।

আমি পরবর্ত্তী বক্তৃতাগুলিতে আমার অদ্যকার এই সিদ্ধান্তের কোনো ঐতিহাসিক-ভিত্তি আছে কিনা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব এবং আমাদের অভাব-মোচনের উপায় কি কি তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়েরই চারিদিকের জমির বিশেষঅবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপনারা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবেন ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। বীরভূমের ভূমির অবস্থার কিছু বিশেষত্ব আছে। মধ্য বা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও সুন্দরবনঅঞ্চলের ন্যায় এই ভূমি সুজলা নহে। আমাদের একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে শস্য বিক্রয় করিয়া সদ্য লাভ পাইলেই সকল গোল চুকিয়া গেল না কিন্তু তাহার চেয়ে প্রয়োজন এই শস্য উৎপন্ন করিয়া মাটির কি লাভ হইল তাহা দেখা এই লাভের অনুপাতেই কৃষকের যথার্থ লাভ হয়। এদেশে ও বিদেশে এই ধারণা আছে যে কৃষক জমির চাষ সম্বন্ধে সবজান্তা। বীরভূমের চাষের অবস্থা দেখিয়া বোঝা যায় যে, কৃষিসম্বন্ধেও কৃষকদের সকল বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান নাই। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থাভেদে জমির কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। এবং জলবায়ু ও রোগ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ সত্য আছে যাহা অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায় এবং যাহা জানা না থাকিলে কাজে হাত দিয়া সফলতা লাভ করা যায় না। এই সকল স্থানীয় অবস্থার কথা জানিয়াই চাষা সন্তুষ্ট থাকে, ইহা অপেক্ষা

বেশি সংবাদ সে রাখে না। পৃথিবীর সকল দেশের সাধারণ কৃষকেরই নিজের পেটের দায়ের দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি। সে মাটিকে অধিকতর উৎপাদনশীল করিয়া এবং মানুষের সহিত সমবায়বদ্ধ হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করিয়া ব্যাপকভাবে লাভবান্ হইবার চেষ্টা করে না। কোনো রকমে বাঁচিয়া থাকিব আদিমকালীন এই মনোভাবের অনুসরণ করিয়াই ইহারা আপন আপন দায় বহন করে।

এই জেলায় জমি যতদিন শস্যসমৃদ্ধিবান ছিল ততদিন পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য খরচের ভাবনা হয় নাই। কিন্তু যখন ফসলজনিতলাভের অংশদ্বারা জলব্যবস্থা করা ও জলাশয় সংস্কারের ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব হইল তখন পুকুরের জল পচিতে লাগিল, এবং খরচ চালাইবার জন্য লোকেরা তীরস্থ গাছগুলিকে কাটিতে আরম্ভ করিল। এই স্থানে নূতন গাছ লাগানো হইল না, পারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার মাটি জলের মধ্যে ধসিয়া পড়িতে লাগিল।

এই জেলায় পূর্ব্বে যখন যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল তখন যুদ্ধকালের বিশৃঙ্খলতায় মাটির উপর এই দস্যুবৃত্তি বার বার প্রতিহত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা চাষের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত জঙ্গল কাটিত না। তখন বিদেশের সহিত চলাচলের ব্যবস্থা অতি অসম্পূর্ণ ছিল তখন এই জেলা হইতে গালা, নীল, রেশম ও কাপড় চালান হইত। এগুলি তৈরী মাল, সুতরাং ইহাতে মাটির উপর বেশি জুলুম চলিত না। তখন রেলপথ ছিল না এবং প্রশস্তনদীপথ বাহিয়া ও গোযানযোগে স্থলপথ দিয়া জিনিষ রপ্তানি হইত। শস্য, চামড়া, তুলা, হাড়, বিচালি প্রভৃতি দুর্ব্বহ কাঁচামালকে তখন মাটির অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় ছিল না। তখন ঝোপঝাড় জঙ্গলের প্রতি অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা হইত না। যেখানে জঙ্গল সেখানে মাটির ক্ষতি অপেক্ষা লাভই হয় বেশি, কারণ সেখানকার মাটি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

কিন্তু যে দেশে যুদ্ধাবসানের পর দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি-স্থাপিত হইয়াছে সেখানে এই হরণব্যাপার দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে, কারণ দেশে চলাচলের পথ সুগম হওয়াতে মাটির যাহা দান তাহা দেশে ও বিদেশে সহরবাসীদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করিতে দূরে চলিয়া যায়। 'সাম্রাজ্য' কথাটির সহিত এই বিত্তাপহরণের ভাবটি জড়িত আছে। শান্তির সময়ে দেশ জুড়িয়া রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মিত হইতে থাকে, সহর ও বন্দরের জঠরে মালগাড়ী গিয়া দ্রব্যসম্ভারের বোঝা নামাইয়া পরিশূন্য হইয়া ফিরিয়া আসে। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তাহার মাটিকে এমন নির্দ্দয়ভাবে শোষণ করা হয় যে তাহাতে ভূমি ক্রমে ক্রমে উৎপাদন শক্তি হারায়। এই দস্যুবৃত্তি যে কি ভীষণ তাহা আমাদের এই বিস্তৃত বৃক্ষ পল্লবহীন মাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই, বোধগম্য হইবে। আর একশত বৎসর পরে এই উঁচু মালভূমিটুকু একেবারে খাদে পূর্ণ মরুভূমির আকার ধারণ করিবে। মাটিকে এই দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবার উপায়গুলি আমাদের উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইবে। শিক্ষাবিস্তার ও সমবায়প্রণালীর প্রবর্ত্তনই যে ইহার দুইটি প্রধান উপায় তাহা আমি পরবর্ত্তী বক্তৃতাগুলিতে উদ্ঘাটিত করিব।

---

## শারদোৎসবের

রাজা। আমাদের সব প্রস্তুত ত?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, এক রকম প্রস্তুত, কিন্তু—

রাজা। কিন্তু! কিন্তু আবার কিসের! আমাদের শারদ-উৎসবের ভিতরেও কিন্তু এসে পড়ে! এ ত রাষ্ট্রনীতি নয়।

মন্ত্রী। উৎসবের আয়োজনের মধ্যে একটি কবি আছেন যে, কাজেই কিন্তুর অভাব হয় না।

রাজা। আমাদের কবিশেখরের কথা বলচ? তা তাঁর উপরে ত ভার ছিল উৎসব উপলক্ষ্যে একটা যাত্রার পালা তৈরি করবার জন্যে।

মন্ত্রী। আপনিত তাঁকে জানেন, সুবিধা অসুবিধা, স্থান কাল পাত্র এ সবের দিকে তাঁর একেবারেই দৃষ্টি নেই। তিনি আপন খেয়াল মতই চলেন।

রাজা। তা হয়েছে কি! লোকটা পালিয়েছে না কি?

মন্ত্রী। একরকম পালানোই বই কি। সভা পণ্ডিত মশায় ঠিক করে দিয়েছিলেন, এবারকার উৎসবের জন্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পালা তৈরি করে দিতে হবে। একথা হয়েছিল সেই মহা দ্বাদশীর দিনে। কাল শুনি কবি সে পালা তৈরিই করে নি।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! এ মানুষকে নিয়ে দেখচি আর চল্ল না। সখা, তুমি কেনারাম পাঁচালি ওয়ালার উপর ভার দিলে না কেন—তা হলেত এ বিভ্রাট ঘটত না। পুরবাসীরা সবাই এসে জুটেচেন, এখন উপায়?

মন্ত্রী। কবি বল্‌চেন, তিনি তাঁর মনের মত ছোট একটা পালা লিখেচেন।

রাজা। তাতে আছে কি?

মন্ত্রী। তাত বল্‌তে পারিনে। সংক্ষেপে যা বর্ণনা কর্‌লেন তাতে ভাবটা কিছুই বুঝতে পারলেম না। বললেন যে, সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুইনা-গোছের জিনিষ।

রাজা। কিছুই-না গোছের জিনিষ! একি পরিহাস না কি?

মন্ত্রী। শুধু পরিহাস নয়, মহারাজ, এ দুর্দ্দৈব!

রাজা। তাতে গল্প কিছু আছে?

মন্ত্রী। নেই বল্লেই হয়!

রাজা। যুদ্ধ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। কোন রকমের রক্তপাত?

মন্ত্রী। না।

রাজা। আত্মহত্যা? পতন ও মূর্চ্ছা?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। আদিরস? বীররস? করুণরস?

মন্ত্রী। না, কোনটাই না। কবি বলেন, তিনি যা রচনা করেচেন, তা শরৎকালের উপযোগী খুব হাল্কা রকমের ব্যাপার। তার মধ্যে ভার একটুও নেই।

রাজা। তাকে শরৎকালের উপযোগী বল্‌বার মানে কি হল?

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তার কোন প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। একথা সত্য বটে!

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোন আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।

রাজা। একথা মান্‌তে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের; সে হেলাফেলায় মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করে বেড়াচ্চে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। একথা কবি বেশ বলেচে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতে কাঁচাধানের যে ক্ষেত দেখি, কেবল আছে তার রং; কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একেবারে লুকিয়েচে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ঐ রকমই হাল্কা, ঐ রকমই নিরর্থক। সে পালায় কাজের কথা নেই, সে পালায় আছে ছুটির খুসি।

রাজা। বাঃ, এ ত মন্দ শোনাচ্চে না! ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জন্যে

রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসী বেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে! আর কে আছে?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল? তাদের নিয়ে কি হবে?

মন্ত্রী! কবি বলেন, ঐ ছেলেদের প্রাণের মধ্যেইত আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচা ধানের ক্ষেতের মতই ছুটির ভিতরেই, নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে, ফসলের আয়োজন করচে।

রাজা। তা ঐ ছেলের দলকে ভাল করে' শেখান হয়েছে?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। কি সব্বনাশ! তাহলে—

মন্ত্রী। কবি বলেন, বুড়োরা ছেলেদের যদি শেখাতে যায়, তাহলে ত ছেলেরা পেকে যাবে—ছেলেই থাক্‌বে না। সেই জন্যে ওদের নাট্য শেখানই হয় নি। কবি বলেন, সহজে খুসি হবার বিদ্যে ওদের কাছ থেকে আমরাই শিখব।

রাজা। কিন্তু, মন্ত্রী, সহজে খুসী হবার বিদ্যা ত পুরবাসীদের বিদ্যা নয়। এই সব হাল্কা, এই সব কাঁচা, এই সব না-শেখা ব্যাপারের মূল্য কি তাঁদের কাছে আছে?

মন্ত্রী। সে কথা আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—তিনি বল্‌লেন, ওজন যার কিছু নেই তার আবার মূল্য কিসের? হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচা ক্ষেতের আবার মূল্য কি? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুসি এই হইলেই দেনা পাওনা চুকে যাবে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুম্ভ-নিশুম্ভ তাহলে এখন থাক্—আসুক ছেলের দল, আসুক সন্ন্যাসীবেশে রাজা। তাহলে কবিকে একবার ডেকে দাওনা, তার সঙ্গে একবার কথা কয়ে নিই।

মন্ত্রী। তাঁকে ডাক্‌ব কি মহারাজ, তিনি নিজেই যে এই পালায় সাজ্‌চেন।

রাজা। বল কি, তার শিক্ষা হল কোথায়?

মন্ত্রী। তার শিক্ষা হয়ই নি।

রাজা। তবে? সে কি হাত পা নেড়ে গলা ছেড়ে দিয়ে আসর জমাতে পারবে?

মন্ত্রী। পাছে যারা হাত পা নাড়তে শিক্ষা পেয়েচে তাদের ডাকা হয় এই ভয়েই সে নিজেই সন্ন্যাসী সাজবার ভার নিয়েচে। সে বলে, পালার বিষয়টা যেমন অনর্থক পালার নটের দলও তেমনি অশিক্ষিত।

রাজা। তা এ নিয়ে এখন পরিতাপ করে কোন লাভ নেই। তাহলে আরম্ভ করে দাও। একটা সুবিধে এই যে বেশি কিছু আশা করব না সুতরাং বেশি কিছু নৈরাশ্যের আশঙ্কা থাক্‌বে না। গোড়ায় একটা গান হবে ত?

মন্ত্রী। হবে বৈ কি। এই যে গানের দল আপনার পাশেই বসে।

---

## গান

আমার কণ্ঠ হ'তে গান কে নিল ভুলায়ে।
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে।
মেঘের দিনে শ্রাবণমাসে
যুঁথী বনের দীর্ঘশ্বাসে.
আমার প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে।
যখন শরৎ কাঁপে শিউলি ফুলের হরষে,
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।
গভীররাতে কি সুর লাগায়
আধোঘুমে আধো জাগায়,
আমার স্বপন মাঝে দেয় যে কি দোল দুলায়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বুধবার

( ১৩ই ভাদ্র, ১৩২৯, মন্দিরের উপদেশ )

## গান

"মনোমোহন, গহন যামিনী শেষে
দিলে আমারে জাগায়ে।"

এই যে জাগরণের কথা গানে বলা হয়েচে তার রূপ কি, তার ভাব কি? জাগরণের একটা দিক হচ্চে, প্রভাতের আলোতে এই পৃথিবীকে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া। প্রভাতের জাগরণ নিদ্রার বিস্মৃতির পরে আমাদের আর একবার নতুন করে সংবাদ দেয় কোথায় কি আছে। সেই সংবাদটি স্পষ্ট করে পাই বলে' আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সহজ হয়, রাত্রের অন্ধকারে তার বাধা ঘটে। কিন্তু প্রভাতের জাগরণের এইটেইত পূর্ণস্বরূপ নয়। আজ শরতের প্রত্যূষে পূর্ব্বদিগন্তে কুঞ্চিত কালো মেঘের ভিতর থেকে অরুণোদয়ের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়ে দূর মেঘ-স্তূপের প্রান্তে প্রান্তে স্পর্শমণি ছুঁইয়ে দিলে, মাঠে মাঠে যে-তৃণের মঞ্জরী ছোট ছোট চামরের মত উচ্ছ্রিত হয়ে রয়েচে তারা শিশির-কণায় ঝলমল্ করতে করতে মৃদু স্নিগ্ধ বাতাসে দুলে উঠ্‌ল। তখন ত কেবল আমরা এর ভিতর থেকে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের খবর পেলুম তা নয়। অর্থাৎ সকাল-বেলায় বিশ্বপ্রকৃতি আকাশে কেবল তাঁর দৈনিক খবরের কাগজখানা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন না। তাঁর বীণায় একটি সঙ্গীত বেজে ওঠে। এই সঙ্গীতের স্পর্শে আমাদের আত্মা আপন বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করে। সৌন্দর্য্যের রসে শান্তির গভীরতায় একটি পরিপূর্ণতার পরিতৃপ্তি তার মধ্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। তাই বল্‌চি জাগরণের যথার্থ মানে, আপনার আত্মাকে পূর্ণতার মধ্যে দেখতে পাওয়া, বিশ্বের সুরের সঙ্গে ছন্দের সঙ্গে, আপন আত্মার সুরের ছন্দের একান্ত মিলটি উপলব্ধি করে আনন্দিত হওয়া। বিশ্বপ্রকৃতির ভূমার সঙ্গে এই যে মিল এ কেবল আমাদের আত্মাতেই আছে—ক্ষুধাতৃষ্ণাপীড়িত সুখেদুঃখে দোলায়িত অতি ক্ষুদ্র আমিটার মধ্যে নেই। তাই এই আমিই যখন বড় করে জেগে থাকে তখন তারই দাবীতে, তার কান্নায়, তার চাঞ্চল্যে আত্মার উদার রূপটি আর দেখতে পাইনে। সেই সঙ্গে ভূমার সঙ্গে আমাদের সামীপ্য, আমাদের সাযুজ্য, আমাদের সাধর্ম্ম্য সেও আমাদের চেতনা থেকে দূর হয়ে যায়। বিশ্বপ্রকৃতির নক্ষত্রখচিত ঐশ্বর্য্যে, তুষারমণ্ডিত অভ্রচুম্বিত মহিমায়, সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের অপরূপ স্বর্ণপারিজাত বিকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মা ক্ষণে ক্ষণে ভূমার স্পর্শে আপনাকে ক্ষুধাতৃষ্ণা জন্মমরণের অতীতরূপে উপলব্ধি করে এটা সহজ। কিন্তু এই উপলব্ধির শান্তিকে, গৌরবকে, সংসারের কোলাহল ও জটিলতার মধ্যেও রক্ষা করতে হবে এই বার্ত্তাইত আমরা শরৎপ্রভাতের শিশিরধৌত আলোকে আজ পেয়েছি। বীর সেনাপতির, পরে দুর্গরক্ষার ভার রয়েচে; সে যদি ঘুষ খেয়ে বা ভয় পেয়ে সেই দুর্গ তার শত্রুর হাতে সমর্পণ করে তবে তাতেই পৌরুষের অবমাননা। সংসারের প্রলোভনে বা বিপদের শাসনে আমরা তেমনি যখন আমাদের আত্মাকে বিস্মৃত হয়ে অশান্তিউদ্বেগ বিরোধ-বিদ্বেষের আলোড়নের মধ্যে তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে বসি তখনই আমাদের সকলের চেয়ে বড় পরাভব। আমরা যখন কোন মানুষকে দেখতে পাই সংসারের আবর্ত্তের মাঝখানে আপনার শান্তি রক্ষা করে রয়েচেন, তখন সেই সংসারের মধ্যে আমরা মানবাত্মার যথার্থ জাগরুক মূর্ত্তি দেখতে পাই। তখন সেই জাগরণের সৌন্দর্য্য ও মহিমা আমাদের মধ্যেও জাগরণের আনন্দ উদ্রেক করতে থাকে। মানুষের মধ্যে যেখানেই আমরা আত্মার পরিচয় পাই সেখানেই আমাদের সকলের চেয়ে বড় সম্পদ পাই। কেননা সেখানেই মানুষের সত্যকে দেখি। মানুষের সত্যই মানুষের সব চেয়ে বড় আশ্রয়। মানুষের সত্য এ নয় যে সে মজুর, সে দাস, এ নয় যে সে যন্ত্রচালিত, মানুষের সত্য এই যে সে জ্যোতির্ম্ময় আত্মা, এই সত্যকে যদি প্রায়ই না দেখি, বা এ'কে প্রায়ই পরাভূত হতে দেখি তাহলেই আমাদের "গহন যামিনী"—তাহলে আত্ম-

অবিশ্বাসে আমাদের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কেননা মানুষের যথার্থ শক্তি হচ্চে ত্যাগের শক্তি। বাইরে থেকে কোন মানুষ ত্যাগ করতে পারে না, আত্মার ভিতর থেকে যদি তাঁর পূরণ না হয়।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা মানুষের কাছে মানুষের জাগ্রত আত্মার পরিচয় দিতে আসেন। এই পরিচয়ের মত মূল্যবান জিনিষ আর কিছু নেই, সেইজন্যে তাঁদের চরিত আমরা চিরদিন স্মরণ করে রাখতে চাই। আমরা দুদিন বাদেই ভুলে যাই লক্ষপতি ক্রোরপতিদের বিবরণ; কিন্তু এই সকল অকিঞ্চনদের জীবন আমাদের জীবনযাত্রায় পরম সম্বল। এঁরা আত্মার পরিচয় দেন মৃত্যুর সামনে, কঠিন দুঃখের, দারুণ বিপদের মুখে। সকল ক্ষতি সকল রিক্ততার উপরে এঁরা অপরিমেয় পূর্ণতার রূপ দেখিয়ে দেন। মুক্তি কাকে বলে সে যখন এঁদের এই বিমুক্ত আত্মার মধ্যে দেখ্‌তে পাই তখনই মুক্তি আমাদের পক্ষে সত্য হয়ে ওঠে। তখনই জান্‌তে পারি মানুষের চরম লক্ষ্য মুক্তি।

যেন তার আত্মা নেই মানুষ এমন ব্যবহার প্রতিদিনই করচে, চারদিকেই তাই দেখচি। দেখচি সে লোভ করচে, ক্ষোভ করচে, পীড়া দিচ্চে, পীড়া পাচ্চে তবু সেইটেকেই আমি তার সত্যের প্রমাণ বলে গণ্য করতে পারিনে। ভিজে কাঠ স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাক্; একটি ছোট কাঠি জ্বলুক্‌ত, তারই থেকে বল্‌তে পারব ঐ সমস্ত নিস্তেজ-দেখ্‌তে বড় বড় গুঁড়ির ভিতরেই অগ্নিতেজের সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তেমনি নিশ্চিত করেই বলব যে, মানুষ তার সমস্ত জড়তা তামসিকতার নিবিড় বাধার মধ্য থেকেও চাচ্চে আপন জাগ্রত আত্মার পরিচয় পেতে। মুখে মানুষ যা চাচ্চে সত্যই মানুষ তা চাচ্চে না। সেই জন্যেই যাদের আত্মা মহৎ মানুষ তাদের গলায় বরমাল্য দেয়, ভক্তির সঙ্গে তাহাদের নাম গ্রহণ করে। মানুষ সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে আপন আত্মাকেই উজ্জ্বল করে' জান্‌তে চায় বলেই পূজার মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। বলে, নমস্তেঽস্তু, তোমাকে নমস্কার। সেই নমস্কারের দ্বারাই মানুষ আপনার মধ্যে আত্মার স্পর্শ পায়। সে নমস্কার ধনকে না, মানকে না, স্বার্থকে না। সেই নমস্কারের দ্বারা মানুষ পরম আত্মাকে বলে, "আমি তোমার তুমি আমার।" বলে, যে, যে-তুমি পূর্ণ, যে-তুমি আপনার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, যে-তুমি "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু" সেই-তুমিই আমার নিকটতম অন্তরতম; সেই-তোমার আত্মীয়তায় আমার আত্মা মহীয়ান। সকল-কিছু চাওয়ার চেয়ে মানুষ আত্মাকেই চায় বলে' সে বলে, "আবিরাবীর্ম এধি", হে আত্মপ্রকাশ, তোমার আবির্ভাবের দ্বারা আমার আত্মাকে তুমি প্রকাশমান করে দাও। সে বলে, আমার রাত্রি শেষ হোক্, তমসো মা জ্যোতির্গময়, সে বলে, আমার জাগরণ পূর্ণ হোক্, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# বিদায় অভিনন্দন

(অধ্যাপক সিলভ্যালেভি মহাশয়ের বিদায় উপলক্ষে আচার্য্যদেবের অভিভাষণ)

Dear Acharyya,

You know that I believe the time has come, when the outward fact of the meeting of East and West must ripen into a union in truth. With the object of giving form to such an aspiration and also of training young minds for a future when the federation of races will be acknowledged, we have established Visva-bharati in Santiniketan. I cherish the hope in my heart that this institution will grow to be a meeting ground of truth's pilgrims coming from the Eastern and Western continents, and represent the principle of unity, which

reveals harmony through materials that are varied and often antagonistic in appearance. That the spirit of *anantam*—the infinite—is in *advaitam*—the ideal of unity,—has been the teaching of the seers of India. I deeply feel that this great truth has its claim upon us for its application to life and for proclaiming our faith in it, mocked though it may have been on every side by power-worshippers who value truth according to the apparent success it brings them in an immediate material advantage.

When I had the good fortune to meet you in Europe, I had no hesitation in inviting you to our institution, which was still in its nascent stage. Fully aware though I was of its material poverty, and though I felt that its struggle for bare existence was likely to appear as pitiful to one who has been accustomed to the lavish splendour of the established universities of Europe, supported by the generosity of ages, I was certain that you would be able to recognise our ideal inspite of; nay, because of, the bareness of its materials.

Dear friend, you, in your adventure of truth had sailed across trackless centuries reaching the India of ancient days, had gained access to her secrets which could never be for pedants, but only for lovers; you have known the preciousness of her wisdom and her generosity which ever kept her doors open to all races and her treasure sent to distant shores; you have spent strenuous days in understanding what she had thought and how she had felt, what were her aspirations and achievements. You accepted our call, crossed the sea and came to the living generation of India, and we crowded round you asking for the message you had gathered from our past. There have been numerous interruptions in the current of our political and mental life, and the consciousness of our own inheritance has grown for most of us fragmentary and vague. Therefore, we need co-operation of all earnest students of Indian history in order to trace out the path pursued by this country in its mission of civilisation. Learned scholars we already have among our own countrymen who are working in this direction, but we have no doubt that it will greatly strengthen them in their task if they have trained teachers from the West to collaborate with them. Your offer of assistance was all the more precious for us because of the sympathetic insight and imagination which you combine with your scholarship, and also because you have learned to love that ideal India which is not confined to any limited time, but claims its fulfilment in the life of humanity.

You came from a great western country, which had fought for the ideal of equality and you have made that eastern culture your own which says that he only knows truth who realises all beings as his own self. Therefore, it was fit that you should be our honoured guest at the ceremony of opening this institution to the public and should join your hands with ours in launching it on its career of progress. We, the members of the Santiniketan Asram, offered our homage of welcome to you, who had already enjoyed the spiritual hospitality of this ancient land and to whom she had been known in that aspect of hers which is ageless.

At last the time has come when you are preparing to take leave from your friends and students of our Asram and this is going to be the last meeting when we shall see you among

us. If we had nothing else from you but the service of a scholar we could be profuse to day in our thanksgiving; but it makes me reticent of words when I realise that what you gave to us was far more precious than scholarship. You understood us, you accepted us to your heart, your love for us made you overlook our numerous shortcomings and discover all that is real and permanent in our endeavour. This magnanimity of your sympathy has given us courage and confidence in our own mission, and what we offer you to-day as our last homage to you is not honour or gratitude, but love.

Before we part, my friend, allow me to express my deep feeling of admiration for your wife. She has made herself very dear to me and our people with whom she came into touch, and it is difficult for us to think that we had not known her for a long period in the past and to believe that she can leave us for any length of time.

[Farewell address presented to Prof. Levi by Dr. Tagore on 9th August, 1922, at Santiniketan on the eve of the departure of Prof. & Madame Levi, from Bolpur.]

---

# চিঠি

সম্বলপুর

১৫।৮।২২

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

যে আশিষ আপনি পাঠালেন তাহা যেন আমার শ্রদ্ধা দিয়ে অন্তঃকরণে পেতে পারি।

শান্তিনিকেতনে আমি মনের একটী বিশেষ অবস্থাতে যাই। মানুষ যখন একটি পরম সত্বাতে বিশ্বাস হারায় তখন সে যে এই জগতের অতিরিক্ত একটা কিছুর যোগ হারায় শুধু তাই নয়, এই জগতের সঙ্গে যে তার একটি সহজ স্বাভাবিক যোগ আছে তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়। ঝড় যখন আসে, তখন তার অন্ধবেগের দৃষ্টির সামনে সব একাকার করে দিয়েই আসে।—সত্যের negationটাই আরম্ভে হয়ত বড় করেই দেখা দেয়; সত্য তাকে পেরিয়ে যদি না আসতে পারে, তবে আঘাতটা জীবনের গোড়ায় গিয়ে লাগে। অসীমের মধ্যে মানুষ একলা হয়ে পড়ে;—আর দুর্ব্বল হলে ক্ষুদ্রতার মধ্যে পতিত হয়। তখন, কোনো বৃহৎ ideal এর সঙ্গে living contactই তাকে রক্ষা করতে পারে।

আমি এ জিনিসটি পেয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে। একটা intellectual theory বা মতবাদের মধ্যে নয়,—তাহা পাই জাগ্রত ideal এর চেতনাময় সংস্পর্শে।

কর্ম্মকে, Purposeকে, যখন বড় করে দেখি তখন, যে আনন্দ তাকে ধারণ করে আছে—তাকে মূল্য দিয়েছে,—তা' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে,নিঃস্ব হই। যন্ত্রকে যখন একান্ত ক'রে জানি, তখন যন্ত্রী আড়ালে যান। এই হারান সত্যটি ফিরে পেলুম আশ্রমে—যেখানকার বাতাসে আকাশে তা সহজেই সঞ্চারিত হচ্চে।

'সত্যম' 'কে' 'জ্ঞানম' কে 'অনন্তম' কে ত জগৎ ধরে রাখতে পারলে না, সেখানে তা কুলালো না,—তাই মানুষকে আসতে হ'ল। এই মানুষ না এ'লে কে সত্যকে অনন্তকে বুঝা'ত।

যে ঋষিদের মধ্যে অনন্ত বাণী পেলেন তাঁদের বাদ দিলে উপনিষৎ অর্থহীন হয়ে পড়ে। Jesus-হীন Gospel of love ও একটি narrow dogmatism মাত্র। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শূন্য বা'দকে ধারণ করে রাখতে, অসীম শূন্যও যথেষ্ট হ'ল না, তারও বুদ্ধত্ব বা পরম মানবতার আশ্রয়ের প্রয়োজন হ'ল। স্থানকে, মানুষকে, বড় করে দেখা mass mind এর একটা crude instinct মাত্র বলতে পারিনে, তা abstract ধরতে পারে না, symbol চায়।

Rationalist Nietzsche, 'Superman'এর ideaর মধ্যেও শুধু জ্ঞানের Purposeএ অতৃপ্ত ঋষির পূর্ণ মনুষ্যত্বের তীরে সর্ব্বজ্ঞানের fulfilment লাভের আকুতি দেখা যায়। মানুষকে ছোট করে abstract জ্ঞানের মধ্যে যখন সত্য খোঁজা হ'য়েছে, তখনি সত্যকেও হীন করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের বাণীকে শান্তিনিকেতন থেকে পৃথক করলে শুধু যে তার প্রতি অবিচার করা হবে তা' নয়—সত্য হ'তে অনেকটা বিচ্যুত হতে হবে। আর Europe এই বাণীকে একটি বিশেষ নামের মধ্যে দে'খতে যে চেয়েছে, সে হচ্ছে এই বর্ত্তমান যুগের কোন বৃহৎ ভাবকে তাড়াতাড়ি একটি concrete রূপ দেবার যে উগ্র চেষ্টা আছে, তারই তাড়ায়। হয়ত একে তা'রা একটি অভিনব internationalism বলেই জানবে। সব বড় বড় ideal কে Practical Europe প্রয়োজনের কাজে খাটিয়েছে—ইহাকেও সে সেই বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে। ইহা সত্য যে, কোন সত্য ideal কিছু চিরদিনই ideaর স্বর্গলোকে থাকতে পারে না, তা'কে নামতে হ'বে এই কঠিন মাটির পরে,—নইলে তার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু তাই বলিয়া যদি প্রয়োজন পূরণের দিকই কেবল দেখা হয়, যদি দরকারটাই প্রধান করা হয়,—তবে ideal বিনিষ্ট হ'বে। যে ধূলা Politics উড়িয়েছিল, তা' থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় জেনে, পথভোলা, দিকহারা য়ুরোপ আজ ইহাকে কামনা করচে। তাই সেখানকার idealist রা যা free—যা চিরদিনই মুক্ত,—তাকে নিয়ে league করতে চায়। যে সত্য নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দলের বলে তুলে ধরতে চায়। মানব মনের যে দিকটা য়ুরোপ এতকাল politicsএ নাড়া দিয়ে এসেছিল তাকেই তারা জানে ও বিশ্বাস করে এবং তাকে দিয়েই জীবনের সব problem এর মীমাংসা করতে চায়—শুধু তফাৎ এই যে তার সাথে কারবার করবার means এই ideatistদের অন্য। সত্য মুক্তি পে'তে হ'লে, এই mentalityকে ছাড়িয়ে উঠতে হবে,—এ'কথাটি তা'দের কাছে এখনো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেনি। তাই তা'রা league চায়, or ganisation চায় propaganda চায়। মানি, সত্যের প্রচারের আবশ্যকতা আছে,—কিন্তু তা'র চেয়ে অনেক গভীর আবশ্যকতা আছে, মানবমনের মধ্যে সত্যের প্রসারের। তা যদি না হয়, তবে প্রচার তেমনি একটি বন্ধন হয়ে উঠবে, সত্যের জন্য ব্যাকুল মানুষ যাকে বারম্বার ভাঙ্গতে চেয়েছে।

শান্তিনিকেতন যে বাণী বুকে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছিল, যাকে সে এতদিন জাগিয়ে রেখেছে ও এমন প্রাণ দিয়ে গড়ে তুলেছে, তা একদিকে যেমন নাম ও মত ছাড়িয়ে আছে, তেমনি অন্যদিকে তামসিক কর্ম্মের সহজ প্রলোভন হ'তে মুক্ত বলেই সে জগতের মধ্যে প্রকাশ পেলে—আর দূর দূরান্তর থেকে আগত ঘরছাড়াদের তার ছায়াতে আশ্রয় দিতে পারলে।

উপনিষদ যুগের পরে ভারতে এত বড় বাণী আর নামেনি। একদিন খুঁজতে বেরিয়েছিলুম কোথায় সেই চিরন্তন মানবের মিলন দীপটি জ্বালা হ'য়েছে। দেশের মধ্যে তার আয়োজন দেখলুম, কিন্তু সন্ধান পেলুম না। সেই কোলাহলে আমার স্থান কোথায়!—

সেদিন দুটি মৌন ভাব আমায় বড় গভীর করেই ডেকেছিল তাদের বিজন নিভৃতে। তার একটি এসেছিল পণ্ডিচেরী আর অন্যটি শান্তিনিকেতন থেকে।

পণ্ডিচেরীতে হয়ত এমন শক্তি আছে যা অর্দ্ধ পৃথিবীকে কম্পিত করে দিতে পারে,—কিন্তু আমার চিত্ত সেথান থেকে ফিরে এল।—শান্তিনিকেতন আমার মাথাকে নত হতে শি'খালো। জানি, শান্তিনিকেতন perfect নয়। কে এই সৃষ্টি কে perfectionএর হাত থেকে রক্ষা করত, যদি এই ভুলের মানুষ না অসত? যন্ত্র সম্পূর্ণ হয় perfect হয়ে, প্রাণ পরিপূর্ণ হয়েছে অসম্পূর্ণ হয়ে। প্রাণের ভুল সৃষ্টির ঘোমটা ক্ষণেকের জন্য সরিয়ে দিয়েছে, সেই পরিপূর্ণতাকে reveal করতে যা চিরদিনই অপ্রকাশিত।

শান্তিনিকেতনের একটি বিশেষত্ব খুব করেই আমাকে নাড়া দিয়েছিল; cultural শান্তিনিকেতন যখন প্রবল

হবে, তখন যেন ভারতের সাধনার ও বিশ্বমানবের অন্তরাত্মার চির barbarianটি ফিরে না যায়,—শান্তিনিকেতন যখন জগৎ সভায় গুরুর আসন নেবে, তখন সে যেন তার চিরকালের বালকটিকে না হারায়,—যাকে আশ্রমের সত্য-সাধকেরা এতদিন প্রাণ দিয়ে এসেছেন।

শরতের আলোক উজ্জ্বল শান্তিনিকেতনকে এক গন্ধবিধুর নিশিতে ঘুমন্ত ছেড়ে আসি। সেদিন শাল বৃক্ষ শ্রেণীর মাথার উপর একটি উতল বাতাস ঘুরছিল,—সেই বিদায়ের নিবিড় মুহূর্ত্তে মনে হ'ল যেন, যে দেবতাকে আমি আমার আশ্রমের শান্ত দিন, বিপুল সন্ধ্যা, স্তব্ধ রাত নিবেদন করে এসেছি তাঁরই একটি অনুচ্চারিত বাণী, একটি অসম্পূর্ণ পূজার বেদনে,আকাশকে ক্ষুব্ধ করেতুলেছে। চিত্তে যখন সেই সাড়াটি ঘনিয়ে আসছিল, মন তখন অন্য মনে ভাবছিল, এই চলার যুগে এই নীড় বাঁধার কি প্রয়োজন!

আমার আশ্রমে থাকা এবারের মত সাঙ্গ হ'ল; আবার কখন ফিরব তা'ত জানি না। আজ আমার আশ্রমের দিনগুলির প্রতি দৃষ্টি ফিরাতেই দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ভুল অনেক করি, যা আশ্রম তার স্বাভাবিক ক্ষমা দিয়ে সহজে ক্ষমা করেছিল। বেশ বুঝতে পারচি, সেখানে থাকাটা আমার একটু থাপ ছাড়া রকমের ছিল।—এমন অনেক কিছু করেছি, যা' করা উচিত ছিল না, এমন অনেক কিছু করিনি যা করা উচিৎ ছিল। তার জন্য একটা খেদ থেকে যে'ত, যদি না আশ্রম তার গোপন অন্তরলোকের প্রকাশে আমার সেখানকার থাকা পূর্ণ করে রাখত।

শান্তিনিকেতনে যে বৃহৎ সাধনার মধ্য দিয়ে যে বৃহৎ দানের আয়োজন চলচে, সেটা হয়ত আমার পাওয়া আর হ'ল না। তার জন্য দুঃখ নেই, যদি তার নীল আকাশের খেলার মাঝে, খোলা মাঠের মেলার মাঝে তাকে পেয়ে থাকি। ধন্য হব যদি আমার প্রাণের তার, তা'র সুরে বেঁধে নিয়ে থাকতে পারি! আপনি আমার প্রণাম লইবেন। ইতি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

# আলোচনা

## বিশ্বভারতীর কথা

[ গত ২০ শে ফাল্গুন বিশ্বভারতীর কয়েকটি নবাগত ছাত্র আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার মর্ম্ম এখানে দেওয়া গেল। ]

কোনো জিনিষের আরম্ভ কি করে হয় তা বলা যায় না, সেই আরম্ভ কালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এই ভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্ম্মজগতে প্রবেশ করলাম?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড় পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত যে বড় হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে মানব জীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেশনে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্ম্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ী। সেখানে গাছ পালা নেই, মার্ব্বেলের উঠান আর ইঁটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে' তাকিয়ে থাকত। আমরা—যাদের শিশু প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়ই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য্য থেকে দূরে থেকে আর মাষ্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাষ্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে বিদ্যা লাভ করা

যায়, এটা কখনো জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনো কখনো বক্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মান্‌লেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোন উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্ম্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুসী করব; প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে—এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণ-নিকেতন নীড় তৈরী করে তুলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল, সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট্ প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে' অসাধ্য সাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌছয়নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনও রাজনীতি ক্ষেত্রে নামেন নি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভাল লাগল, তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি জমবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ ছয়টি ছেলে নিয়ে জাম গাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশী বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেচি। সেই ছেলে কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি—তাদের কাঁদিয়েছি, হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে একজন 'হেড্ মাষ্টার'এর নেহাৎ দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, "অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাঁকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েচেন সেই পাস হয়ে গেছে।"—তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখে শুনে বললেন, "ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়ায়—এ তো ভাল না।" আমি বললাম, "দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনো তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে—ওরা ওতে চড়ে' পা ঝুলিয়ে থাকলই বা!" তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে তিনি কিণ্ডার গার্টেন প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। "তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল"—ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বন্‌ল না, তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেড্ মাষ্টার রাখি নি।

এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েচে। আমি এ নিয়ে মাষ্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি, আমি ছেলেদের বললাম, "তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী কর—তোমাদের ভার তোমরা নাও।" আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি—আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশুশিক্ষার আরেকটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য্য ছোট ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, "যা' মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই।" কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড় মহতের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই যে সব চেয়ে বড় যে আদর্শ মানুষের আছে—তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনও বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এ'তে আর কিছু না হোক্,

একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোট ছেলেরা একটা বড় জিনিসের ইসারা পায়। হয় তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্ররসে পূর্ণ করে নেবে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চ্চায় শিশুদের মগ্নচৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শুধু এটাকেই চরম লক্ষ্য বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর ছেলেরা এখানে মানুষ হবে; রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সঙ্গীতে তাদের হৃদয় শতদল পদ্মের মত আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালীর ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে এই আনন্দ এযে নিখিল মানব চিত্ত থেকে বিনিস্সৃত অমৃতউৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি। বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাটক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময় তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাশ বছর পর্য্যন্ত ইংরাজী লিখিনি, ইংরাজী যে ভাল করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরাজী চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তের বছর পর্য্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন 'গীতাঞ্জলি'র গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্বোধন হয়েছিল বলে সেই গান গুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জ্জমার বই আমার পশ্চিম মহাদেশ যাত্রার যথার্থ পাথেয় স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তারপরে যখন অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতিলাভ করে, তখন সে বিশ্বের জিনিষ হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার এক প্রান্তে কয়েকটি বাঙালীর ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়েছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মত তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এল, তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিষ রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড় পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগ সাধন হল। বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবী করল।

আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙ্গে গেছে; মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম—বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, একথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্য সাধনায় পূর্ব্ব পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীন দেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্য সাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুলবয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদান প্রদানের সম্বন্ধ

হয়নি। সাহসপূর্ব্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্য সম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত প্রাচুর্য্য আছে সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সঙ্কোচ হয়না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বান বাণী একসময়ে ঘোষিত হয়েছিল,—আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা!

আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জ্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে টিকে থাকবার মৎলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরী করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে তাকে শিক্ষার ছিটে ফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড় বড় মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তেরীয়, ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড় বড় শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা, স্থপতি বিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেচে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোন শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয়নি বলেইত আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্ব্বল।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করচে, তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাইত। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয় স্বজনে বৈঠকে যে অহঙ্কার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞানচর্চ্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক্।

আমি চাই তোমরা বিশ্বভারতীর নূতন ছাত্রেরা খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এখানকার আদর্শকে সমর্থন করে কাজ করে যাবে, যাতে আমি তোমাদের সহযোগিতা লাভ করি। আমার অনুরোধ যে তোমরা এখানকার তপস্যাকে শ্রদ্ধা করে চলবে, যাতে এই প্রাণ দিয়ে গড়ে-তোলা প্রতিষ্ঠানটি অশ্রদ্ধার আঘাতে ভেঙে না পড়ে।

---

# আশ্রম-সংবাদ

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাসে এবার খুব একটা বড় পরিবর্ত্তন হইল। সমস্ত কার্য্যেই এখন নূতন সংস্থিতি-পত্র (Constitution) অনুসৃত হইতেছে। গ্রীষ্মাবকাশের পরে গত ৯ই আগষ্ট শান্তিনিকেতনে কলাভবনের দ্বিতলে বিশ্বভারতী সংসদের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হয়। সভাগৃহটি আশ্রমবাসী চিত্রশিল্পীগণ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া ছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্র, অধ্যাপক, সকলেই দর্শকরূপে সংসদের এই প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি আসিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করেন।

"তমীশ্বরানাং পরমংমহেশ্বরম্"—এই বেদগান গীত হইলে আচার্য্যদেব, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রভৃতিসহযোগে কয়েকটি সংস্কৃত শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেন। ইহার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার কল্পে কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সম্মিলনীর কার্য্যোপলক্ষে এবার আচার্য্যদেবকে অনেকবার কলিকাতা যাইতে হইয়াছে। তথাপি তিনি সান্ধ্যপাঠ-সভায় তাঁহার ছোট গল্পগুলির অনেকগুলি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন।

গুরুদেবের অনুপস্থিতিকালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য মিঃ এণ্ড্রুজ প্রতি রবি এবং বুধবার মহাত্মাগান্ধীর জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং ভারতবর্ষের যে সব কর্ম্মানুষ্ঠানে মহাত্মাজীর সঙ্গে মিঃ এণ্ড্রুজ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত ছিলেন, এবং মহাত্মাজীর জীবনের মূলমন্ত্র অহিংসা ( Non-Violence ) পরিচায়ক কয়েকটি প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে, কথা প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়। ইহার পর উপর্য্যুপরি কয়েকটি সান্ধ্যসভায় তিনি 'মহাত্মাজী এবং আধুনিক সভ্যতা' সম্বন্ধে যে আলোচনা উত্থাপন করেন তাহা খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল—বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই এই আলোচনাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২রা আগষ্ট লোকমান্য তিলকের মৃত্যুবাসরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলাভবনে তিলক স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ কর 'তিলক-তর্পণ' নামে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ গঙ্গাধর 'লোকমান্য তিলকের জীবনী এবং শ্রীমান্ অনুজন লোকমান্যের অসামান্য পাণ্ডিত্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় লোকমান্যের দেশবাসীর উপরে আশ্চর্য্য প্রভাব এবং তাঁহার অসাধারণ বিচক্ষণতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিবসে আমাদের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলাভবনে আর একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয় শিশুছাত্রদের উপযোগী করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের কতকগুলি আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়া বিশেষভাবে তাঁহার নির্ভীক, তেজদৃপ্ত মনুষ্যত্বের চিত্রটি সভাস্থ সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন সান্ধ্যসভায় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, এম, এ মহাশয় 'কবীর' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন,—বিশ্বভারতী সম্মিলনীর কলিকাতার একটি অধিবেশনে পরে আবার ইহা পঠিত হইয়াছিল।

শ্রাবণের পূর্ণিমা রজনীতে শিশুবিভাগের নূতন গৃহে 'বর্ষামঙ্গল উৎসব হইয়াছিল। সভাগৃহটি আশ্রমস্থ মহিলারা বিচিত্র আলপনায় মনোরম করিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের অধিনেতা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার তাঁহাদের শিষ্যবর্গসহ সভাগৃহটি পুষ্পপত্রে সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। পূজনীয় গুরুদেব, শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী এবং গানের দলের ছাত্র ছাত্রীরা বর্ষার অনেকগুলি নূতন গান করেন। গুরুদেব একাকী যখন 'আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে' গানটি গাহিতেছিলেন, তখন বাহিরে শ্রাবণের ধারাও রাত্রির অন্ধকারে ঝরঝর ধারে ঝরিতেছিল। গানের মধ্যে মধ্যে গুরুদেব 'ঝুলন' 'বর্ষামঙ্গল', এবং 'নিরুপমা' তাঁহার এই তিনটি বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করেন। বীণার ঝঙ্কার মাঝে মাঝে হঠাৎ আসিয়া মৃদু সঙ্গীতের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। মানুষে প্রকৃতিতে মিলিয়া সেদিন যে সন্ধ্যাটির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দুর্লভ সামগ্রী—জীবনে এমনতর সন্ধ্যা খুব বেশী আসে না।

গত ২৪এ শ্রাবণ সায়াহ্নে উপরোক্ত স্থানেই বিশ্বভারতীর অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীর বিদায় সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভাগৃহটি এদিনও বিশেষভাবে সাজানো হইয়াছিল। সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে মাল্যচন্দন বস্ত্র ও উত্তরীয় দান করিবার পর গুরুদেব তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া যে অভিভাষণটি উপহার দেন—তাহা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় সযত্নে চিত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে লেভি মহোদয় আশ্রমবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম নিয়ে দেওয়া হইল।

"আজ শান্তিনিকেতনবাসীদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে আমার ও আমার পত্নীর অন্তরের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা আমার সাধ্যাতীত। আজ আমাদের চিত্ত শোকভারাক্রান্ত কারণ গুরুদেবকে যেমন আমরা উত্তরোত্তর অধিকতর ভালবাসিতে শিখিয়াছি তেমনি আপনাদের সকলের সঙ্গেও আমাদের হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে প্রথম অভ্যর্থিত হইবার সময়ে আপনাদের সহিত পরিচয় সূত্রে আমরা বুঝিয়াছিলাম যে এখানে আমাদের দিনগুলি সুখশান্তিতেই কাটিবে কিন্তু এখানে যে আমাদের এতগুলি প্রিয়তম বন্ধু মিলিবে তাহা আমাদের আশার অতীত ছিল। এখানে আপনাদের যে সখ্যতা ও প্রীতির পরিচয় পাইয়াছে, আমরা তাহার স্মৃতি বিদেশযাত্রাকালে হৃদয়ে বহন করিয়া লইয়া যাইব। গুরুদেব আজ আমার অধ্যাপনা কার্য্যের কথা বলিয়াছেন কিন্তু আপনারা জানিবেন যে, আমার নিজের কাজ করিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনো এত পরিতৃপ্তি লাভ করি নাই। পাশ্চাত্য দেশে থাকিতে পুস্তকস্থ বিদ্যার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের স্বরূপটি বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া সেই মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাহা মানসপটে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। সংসারের দুঃখতাপে তাহার মাধুর্য্য আমাদের মনকে সরস করিবে। বিশেষতঃ শান্তিনিকেতন আশ্রমের হাস্যোজ্জ্বল শান্তিময় স্নিগ্ধ স্মৃতি আমাদের সর্ব্বদা আনন্দদান করিবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভারতবর্ষ তাহার লুপ্ত গৌরব একদিন ফিরিয়া পাইবে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনের দ্বারাই সেটি সম্ভব হইবে। ভারতবর্ষকে বিশ্বমানবের অভিব্যক্তির মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাকে মনুষ্যত্বের বিরাট যজ্ঞে বিশ্বের সর্ব্বজাতিক মৈত্রী সংঘে যোগদান করিতে হইবে। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে নেপালে গিয়াছিলাম। সেখানে আমি লক্ষ্য করিয়াছি সে দেশবাসীদের যদিও এখন শিল্পসাহিত্যসম্পদ নাই, তবুও সেখানে একটি সহজ সুখ ও স্বাস্থ্য আছে। স্বাধীন বাধা মুক্ত আনন্দের যে সরল উচ্ছ্বাস সেদেশে সাধারণ লোকের মধ্যে দেখিয়াছি, ভারতবর্ষে তাহা নাই।

কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় নয়, সংস্কারে ও আচারে মিথ্যা দাসত্ব হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত হইতে হইবে। স্বাধীন সবল চিত্তবৃত্তিকে লাভ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা Classicsকে The humanities এই আখ্যা দিয়া থাকি। এই কথাটি গভীর অর্থপূর্ণ। কারণ পাশ্চাত্য দেশের ছাত্রগণ গ্রীক দেশীয় হিব্রুদেশীয় ভাষা ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া বিরাট মানব সভ্যতার সহিত চিত্তের যোগস্থাপন করিতে শেখে। ঐ ছাত্রেরা সকলেই ঐ বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলেও তাহারা স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যাপকতর মনুষ্যত্বের ও অতীত সভ্যতার সহিত পরিচিত হইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষও একদিন এইরূপে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আন্তর্জাতিক মিলনের পুনর্ব্বার সহায়তা করিবে এবং শিল্প সাহিত্যে বিজ্ঞানে গরীয়ান হইয়া উঠিবে, আমার এই আশা আছে। বিশ্বভারতীতে সেই শিক্ষার আয়োজন করা হইয়াছে। এই শিক্ষা ভারতবর্ষের অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্রে পাওয়া যায় না।

আপনাদের ও বন্ধুত্বের জন্য আমি আপনাদের সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং বিদেশী বলিয়া

আমাদের ব্যবহারে যদি কখনও কোন ক্রটি ঘটিয়া থাকে তবে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

পরে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' এই গানটি গাহিয়া সভা শেষ হয়।

সভাস্থলে আশ্রমস্থ মহিলারা অধ্যাপক পত্নীকে একটি অভিভাষণ উপহার দিয়াছিলেন। পরদিবস বিশ্বভারতীর ছাত্রীরা অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নীকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন।

২৬শে শ্রাবণ প্রাতে নয়টার গাড়ীতে আচার্য্য লেভি ও তাঁহার পত্নী আশ্রম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। পূজনীয় গুরুদেবও তাঁহাদের সহিত কলিকাতা গিয়াছিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে আমলকী কুঞ্জের তোরণ দ্বারে তাঁহাদিগকে মাল্যচন্দনে সুশোভিত করিয়া "আমাদের শান্তিনিকেতন," গান গাহিতে গাহিতে বিদায় দেওয়া হয়—বিশ্বভারতীর একদল অধ্যাপক ও ছাত্র ষ্টেসন পর্য্যন্ত তাহাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন। আমলকীকুঞ্জে এবং ষ্টেসনে অধ্যাপককে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তাঁহার আর পা উঠিতেছে না—এই জ্ঞানতপস্বী কিছুতেই আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছেন না—তাঁহার দুইচক্ষু বারম্বার অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেছিল। আশ্রমবাসী সকলেরই পক্ষে এই বিদায় দৃশ্যটি বড় শোকাবহ হইয়াছিল। ট্রেনে উঠিবার পূর্ব্বে তিনি বলিতেছিলেন—আমরা পশ্চিমের লোক আধুনিক সময়ে যে কি অশান্তির মধ্যে বাস করি, তাহা যদি তোমরা জানিতে, তবে শান্তিনিকেতনে আসিয়া এই কয়েকমাস জীবনের মধ্যে যে কত গভীর শান্তিলাভ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতে।"

কলিকাতায় 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' রামমোহন লাইব্রেরীতে অধ্যাপক মহাশয়ের বিদায় সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ১লা ভাদ্র অধ্যাপক সপত্নীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি স্বদেশের পথে মহীশূর সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থান হইয়া যাইবেন। চীনে বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ওয়েগারের (Weiger) এর সঙ্গে, জাপানে অধ্যাপক নাগাসাকির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করিবেন। জাপানে বৌদ্ধ সাহিত্যের Corean version এর অনুসন্ধান করিবার তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা আছে। সেখান হইতে আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। তিনি নেপালে যে কর্ম্মের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা সমাপ্ত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার আর একবার নেপালে আসিবার ইচ্ছা আছে। তাঁহার এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হইলে আমরা হয়ত আর একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইতে পারি। এই জ্ঞান তপস্বী, ভারতের সত্য বন্ধু, বালকের ন্যায় সরল, হাস্যোজ্জ্বল অমায়িক পণ্ডিত দীর্ঘজীবি হউন, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

গত বৎসরের মত এবারও বিশ্বভারতীর গায়কের দল কলিকাতায় বর্ষামঙ্গলে গিয়াছিলেন। প্রথমদিন রামমোহন লাইব্রেরীতে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভ্যদিগের জন্য, দ্বিতীয়দিন কর্পোরেসন ষ্ট্রীটের Variety Theatre এ এবং তৃতীয় দিন Alfred Theatre এ জন সাধারণের জন্য টিকিট বিক্রয় করিয়া 'বর্ষামঙ্গলের' আয়োজন হইয়াছিল তিন দিনই গান বেশ জমিয়াছিল। গুরুদেব তিন দিনই বর্ষার কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন; টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিশ্বভারতীর অর্থভাণ্ডারে দেওয়া হইয়াছে।

বর্ষামঙ্গলের পর গুরুদেব আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছে। শেলী ও ব্রাউনিংএর কাব্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে ইতিমধ্যে একদিন তিনি আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ছুটির পূর্ব্বে 'শারোদোৎসব' নাটকটি কলিকাতায় অভিনীত হইবে।

পূজার ছুটিতে গুরুদেব এবার সিংহলে যাইবেন, সেখানে তাঁহাকে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

মিঃ এণ্ডুজ বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের ইংরেজী একটি ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেছেন। শীঘ্রই লক্ষ্ণৌসহরে All India Railway Conference এর একটি অধিবেশন

হইবে। মিঃ এণ্ড্রুজ সেই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

এমাসে বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগে চট্টগ্রাম হইতে একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষু পালি, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে পালিভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সিংহলে গিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মিঃ মরিস গত গ্রীষ্মাবকাশের পর এবার এখনও আশ্রমের কার্য্যে আসিয়া যোগদান করেন নাই—তিনি পূজার পর আসিবেন। ইতিমধ্যে তিনি বিশ্বভারতীর সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া বোম্বেতে কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইতেছেন।

বিশ্বভারতীর জার্ম্মান ভাষার শিক্ষয়িত্রী Dr. Kramrisch 'ভারতীয় কলাবিদ্যা' সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিতেছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তকখানি প্রকাশিত ও মুদ্রিত করিবেন।

আশ্রমের পাকশালার অধ্যক্ষ আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী কৃষিবিভাগে যোগদান করিয়াছেন—তাঁহার স্থানে অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান রামদাস উকীল নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগের কার্য্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর গুহ আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। ইনি বহুদিন আমেরিকা কাজ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া কৃষিবিদ্যালয় লাভবান হইয়াছে।

কৃষিবিভাগে একটি জাপানী সূত্রধর সপরিবারে অনেকদিন যাবৎ কার্য্য করিতেছেন—সম্প্রতি আরও একটি জাপানী সূত্রধর কৃষিবিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষিবিভাগের ছাত্রদের থাকিবার জন্য চারিটি নূতন বাড়ী হইতেছে। কৃষিবিভাগের কামারশালার কাজ আরম্ভ হইয়াছে—কারখানা ঘরের জন্য একটি বড় বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে।

কৃষিবিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে ইতিমধ্যে একদিন আশ্রমের বালকদের কপাটি খেলার একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। এই খেলায় আশ্রম জিতিয়াছিল।

কিছুদিন হইল বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগের পরিচালক মিঃ এলম্‌হার্ষ্ট শারীরিক অসুস্থতার জন্য নৈনিতাল গিয়াছিলেন, তিনি সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

কৃষিবিভাগের হইতে সুরুল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম গুলি হইতে ম্যালেরিয়া রোগ দূর করিবার জন্য নানারূপ আয়োজন ও চেষ্টা চলিতেছে। গ্রামবাসীদিগের এই বিষয়ে উৎসাহ হইতেছে কিন্তু অর্থের অভাবে, কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হওয়া কঠিন হইতেছে।

আমাদের বড় সৌভাগ্যের বিষয়, চেকো শ্লোভেকিয়ার প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্‌ পণ্ডিত ডাঃ উইণ্টারনিট্‌স্‌, আগামী নভেম্বর মাসে এখানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে আসিতেছেন।

প্যারী সহর হইতে Melle Andree Karpeles নামে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পূজার ছুটির পরে এখানে আসিয়া বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের কার্য্যে যোগদান করিবেন। ইনি পূর্ব্বে আরও কয়েকবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইনি কলাভবনে স্বহস্তে অঙ্কিত গুরুদেবের একটি তৈলচিত্র উপহার দিয়াছেন।

আশ্রমসম্মিলনীর কাজ ভালই চলিতেছে। ছেলেদের হাতের লেখা পত্রিকাগুলি বাহির হইতেছে। সাহিত্য সভা হইতেছে, কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে কয়েকটি সাহিত্য সভা যেমন জমিয়াছিল, এবার তেমন হইতেছে না। ছেলেদের চিত্তবিনোদনের জন্য সায়াহ্নে নিয়মিত গল্প বলা হইতেছে।

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press—Santiniketan.

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ | কার্ত্তিক, সন ১৩২৯ সাল। | ১০ম সংখ্যা

## মন্দির

(বুধবার ২০শে ভাদ্র ১৩২৯)

গান

এই যে তোমার প্রেম, ওগো হৃদয় হরণ,
এই যে আমার দেহে করে অমৃতক্ষরণ।

সকাল বেলাকার আলোককে শুধুমাত্র আলো বলে মানুষের মন খুসী হল না, বল্‌লে এই ত তোমার প্রেম। তার কারণ মানুষ আপনাকে যে জানে সে ত কেবল প্রাণ-বিশিষ্ট দেহ বলে জানে না। দেহীর চেয়ে গভীরতর সূক্ষ্মতর আত্মপরিচয় তার নিজের মধ্যে আছে। তার দেহী 'আমি' আলোককে আলো বলেই থামে, তার সূক্ষ্ম 'আমি' সেইখানেই থাম্‌তে পারে না। সেই সূক্ষ্ম 'আমি' এই জগতের মধ্যে তার নিজের একটি জগৎকে স্পর্শ করতে চায়, সেই জগৎ হচ্চে অধ্যাত্মলোক, আনন্দলোক। তাই সে গান গেয়ে বলতে চায়, এই আলো কেবল আলো নয়, এই আলো হচ্চে আনন্দ, এই আলো হচ্চে প্রেম।

জীবপর্য্যায়ে মানুষের বিকাশ হল কোন্ পথে? উন্নতির পথে একথা সকলেই স্বীকার করি অথচ দেখ্‌তে পাই জন্তুদের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ যতদূর উৎকর্ষলাভ করচে, মানুষের মধ্যে তার চেয়ে অনেকদূর পিছিয়ে পড়েচে। কুকুরের চেয়ে তার ঘ্রাণ শক্তি কম, শকুনির চেয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। অনেক পাখী পতঙ্গের যে দিগ্‌বোধ আছে মানুষের তা নেই। এমন কি মানুষের মধ্যে আজও যারা বর্ব্বরশ্রেণীভুক্ত তাদের ইন্দ্রিয়বোধের তীক্ষ্ণতা সভ্য জাতিদের চেয়ে প্রবল। স্পষ্টই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে যে মানুষের বিকাশ বাইরের দিক্ থেকে অন্তরের দিকে।

এই অন্তর্লোকে আমরা বহির্লোকের আদর্শ নিয়ে গিয়ে মেলাতে পারিনে। সেই অন্তরলোকের একটি সত্য আছে তাকে আমরা ভাষায় বলি কল্যাণ বহির্লোকে সুখের যে মূল্য অন্তর্লোকে কল্যাণের মূল্য তার চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এত বেশি যে বহির্লোকের দুঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই তার পরিমাপ হয়।

লোকহিতের জন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন বিসর্জ্জন দেব? কখনই এ হিসাব করে নয়, যে, আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থ সকলের স্বার্থের অন্তর্গত। কেন না, বিশ্বের কল্যাণের জন্যে আমাদের প্রাণ দিতে হবে এমন

দাবী আছে। সেই প্রাণত্যাগে নিজের সকল স্বার্থহিত নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিতে হয়। উত্তরে এমন কথা বলা যেতে পারে যে, মৌমাছিও তার মৌচাকসমিতির জন্যে নিজের প্রাণ সমর্পন করতে পারে। কিন্তু মৌমাছির পক্ষে মৌচাক হিতব্রত একটা অবশ্য বোধের ক্রিয়া। মনুষ্যের মধ্যে সেই অবশ্যবোধ অন্তত তেমন প্রবল পরিমাণে নেই তার প্রমাণ ত সর্ব্বত্রই দেখা যায়। শুভবুদ্ধির জন্যে মানুষকে নিজের চেষ্টায় সাধনা করতে হয়; মানুষের এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে বলেই এই শুভবুদ্ধির এত বেশী মূল্য; তার বাধা আছে বলেই তার বাধাবিজয়ী শক্তির সত্যতা প্রবলভাবে সপ্রমাণ হয়। বিশ্বজগতে প্রাণ মাত্রের মধ্যেই ত্যাগের তত্ত্ব আছে। তার কারণ, প্রাণ কেবল আপন বর্ত্তমানটুকুর মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করে না। তার একটা ভবিষ্যৎ আছে যা তার অগোচর, তার একটা স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে যা তার উপস্থিত অবস্থার চেয়ে বড় এবং অপ্রত্যক্ষ। নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে তাকে আরাম বিশ্রাম ত্যাগ করতে তার ভবিষ্যতের জন্যে জাতিরক্ষার জন্যে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করতে হয়। প্রাণের পক্ষে তার বর্ত্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ, প্রত্যক্ষের চেয়ে অপ্রত্যক্ষ বড় সত্য। কিন্তু মানবজগতের মধ্যে এই প্রাণের ক্রিয়া অনেক অংশই স্বাধীন ইচ্ছার বাইরে। নিম্নপর্য্যায়ের প্রাণীর মধ্যে প্রাণক্রিয়ার যে একটা অবশ্যশক্তি আছে মনুষ্যের মধ্যে সেই শক্তির কার্য্যভার অনেকটা পরিমাণে তার ইচ্ছা শক্তির উপরে পড়েচে। এই জন্যই মানুষের শুভবুদ্ধির শক্তি তার ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই কল্যাণ নাম ধারণ করে। নিজের মধ্যে মানুষের এই যে কল্যাণ বোধ আছে সেই কল্যাণ বোধের সত্যকে সে অনন্তের মধ্যে উপলব্ধি করতে চায়। এই সত্যের স্বরূপটা হচ্চে প্রেম; সেই প্রেম যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল তার মনের মধ্যেই উৎপন্ন এবং বিলীন হয়, তার আত্ম-অনুভূতির জোরেই এ কথা সে মান্‌তে পারে না। গাছের মধ্যে জীবজন্তুর মধ্যে যে কল্যাণ শক্তি কাজ করচে সেই কল্যাণ শক্তির সঙ্গে মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সহযোগিতা করবে, আনন্দের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে তার সহিত মিল্‌বে মানুষের অন্তরের মধ্যে এই সাধনা আছে। মানুষের অন্তরলোকের সম্পদ হচ্চে কল্যাণ,—এই কল্যাণকে সে চরম বলে জেনেই অন্য কোনো হিসাব বা তাগিদ মনে না রেখে এই কল্যাণের জন্যেই কল্যাণকে গ্রহণ করবে এইটেই হচ্চে মানুষের ধর্ম্ম।

যদি মানুষের ধর্ম্ম হয় কল্যাণ, তবে তার ব্যতিক্রম দেখি কেন। মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা হিংস্রতার যে প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখি জন্তুদের মধ্যেও তা দেখি নে। তার সেই সমস্ত দারুণ রিপুর তীব্রতায় সংসারে সে যে ভীষণ দুঃখ আনে আর কোনো প্রাণীর দ্বারা তা ঘটতে পারে না। দুঃখ সে যে সৃষ্টি করে তার মানে কল্যাণের বিরুদ্ধতা তার অধর্ম্ম, অসত্য। সে তার অধর্ম্ম বলেই মানুষের মধ্যে রিপুর প্রবলতা থাকা সত্ত্বেও সেই রিপুকে বরণ করে' তারই মধ্যে সে স্তব্ধ হয়ে থাকেনি, তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তার এত প্রাণপণ প্রয়াস। এই নিষ্কৃতিকে সে মুক্তি বলে। যার যেটা ধর্ম্ম তার থেকে সে মুক্তি চায় না—স্বধর্ম্মের মধ্যে বিরাজ করাই স্বাধীনতা। মানুষ এই স্থূল জগতের ধর্ম্ম থেকে তার অন্তর জগতের মধ্যে মুক্ত হয়ে স্বধর্ম্ম পেতে চায়।

এই যে তার স্বধর্ম্ম এর ত একটা প্রতিষ্ঠা আছে। এ যদি তার আপন মনের ঘরগড়া জিনিষ হয় তবে ত এ'কে সত্য বলা যায় না। এমনও যদি হ'ত সকল মানুষেরই মধ্যে এই ধর্ম্মবোধ প্রবল আছে, কোথাও এর ব্যত্যয় নেই, তা হলেও সেই প্রমাণের জোরে অন্তত সার্ব্বজনীন মানবচরিত্রের মধ্যেই এই সত্যের একটা ভিত্তি পাওয়া যেত। কিন্তু তা যখন নেই এবং বিরুদ্ধতা যথেষ্ট পরিমাণ আছে, অথচ যখন দেখি এই ধর্ম্মের আদর্শ বাধার ভিতরে ভিতরে কাজ করে যাচ্চে তখন এ প্রশ্ন মনে আসে এই সত্যের ধ্রুব ভিত্তি কোথাও আছে। সেই ধ্রুব প্রতিষ্ঠার অভিমুখেই হাত যোড় করে বলি নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

পূর্ব্বেই বলেচি কল্যাণের স্বভাব হচ্চে শুভ ইচ্ছা। জড় বা প্রাণীর অবশ্যধর্ম্ম থেকে আমরা যে-কোন উপকার পাই

তাকে কল্যাণ বলি না। আমাদের মধ্যে সেই কল্যাণ, গাছের ফল ফলানোর মত, অবশ্য ক্রিয়া নয় বলেই আমরা আমাদের এই কল্যাণের যেখানে সত্যপ্রতিষ্ঠা অনুভব করি সেখানে ইচ্ছাশক্তিকে উপলব্ধি না করে থাকৃতে পারিনে। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার পূর্ণ সম্বন্ধ হচ্চে প্রেমের সম্বন্ধ। একটি পরম সত্যের মধ্যে এই প্রেম সম্বন্ধের শাশ্বত আশ্রয় মানুষ লাভ করবার জন্যে ব্যাকুল।

কিন্তু কেবল তর্ক করে' হিসাব করে' এই আশ্রয়কে যদি আমরা কল্পনা করে নিই তাহলে জোর পাব কেন? আপনার পরম সত্যকে মানুষ তর্ক করে পায় নি, পেতে পারে না। পূর্ব্বেই বলেচি মানুষ বহির্জগৎ থেকে বের হয়ে ক্রমে অন্তর থেকে অন্তরতম লোকে প্রবেশ করতে যাচ্চে। বহির্জগতের প্রমাণ বাহিরের বোধ অন্তর্জগতের প্রমাণ অন্তরের বোধ। আলো যে দেখ্‌ছি এর প্রমাণ হচ্চে আমি চোখ দিয়ে আলো দেখ্‌চি। যে অন্ধ সে আমার কথা শুনে মেনে নেয় যে আলো বলে পদার্থ আছে। তেমনি যখন অন্তর্জগতের আলো দেখি তখন তার প্রমাণ চোখের দেখা নয়, অন্তরের আনন্দ। সেই আনন্দ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা তর্ক করে পান নি, তাঁরা আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা পেয়েচেন। সেই জন্য তাঁরা এমন আশ্চর্য্য কথা বল্‌তে পেরেচেন, যে, আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছু হয়েচে। যে আনন্দ স্থূল নয়, যন্ত্র নয়, প্রত্যক্ষগোচর নয়, সেই আনন্দ থেকেই সমস্ত কিছু হয়েচে, তারই মধ্যে সমস্ত কিছু আছে, তারই অভিমুখে সমস্ত কিছু যাচ্চে, এমন সৃষ্টি ছাড়া কথা মানুষ এত জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারে এই জন্যেই যে মানুষ অন্তরতম লোকের সত্যকে আনন্দের স্পর্শের দ্বারাই জান্‌তে পেরেচে। তাই মানুষ বলেচে, ব্রহ্মকে, ইন্দ্রিয় দ্বারা তর্কের দ্বারা নয়, পরন্তু আনন্দের দ্বারা যিনি জেনেচেন তাঁর আর কিছুতেই এবং কখনই ভয় থাকে না। কারণ ভয় আছে তারই বাহিরকেই যে চরম সত্য জানে। লোভও তারই।

অধ্যাত্মলোকের মধ্যে মানুষ সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে পারে নি, বহির্লোকের নাড়ির টান তার কাছে খুবই প্রবল। দ্বিধাপীড়িত মানুষ সেই জন্যেই বারবার এই বাণীর দ্বারা আপন মনকে প্রতিদিন ধ্বনিত করতে থাকে, "পিতানোহসি" তুমি আমাদের পিতা। সেই পিতার স্বরূপই আমার যথার্থ স্বরূপ এই কথা প্রেমের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই অধ্যাত্মলোকের সত্যকে আশ্রয় করবার বাধা দূর হতে থাকে। এই জন্যেই বারবার বলি নমস্তেঽস্তু। মানুষের যথার্থ নমস্কার ধনের কাছে নয়, মানের কাছে নয়; আত্মার নমস্কার পরমাত্মার কাছে। এইজন্যেই মানুষের সব চেয়ে বড় প্রার্থনা এই যে, আত্মার পক্ষে যা কিছু অসত্য তার থেকে আমাকে আত্মার সত্যলোকে নিয়ে যাও, আত্মার পক্ষে যা অন্ধকার তার থেকে আমাকে আত্মার জ্যোতির্লোকে নিয়ে যাও, আত্মার পক্ষে যা মৃত্যু তার থেকে আত্মার অমৃতলোকে নিয়ে যাও। হে পরমাত্মন, আত্মার মধ্যে আমি যেন তোমাকেই প্রকাশ করি। হে রুদ্র, বাহিরের দুঃখ তাপ ক্ষতি বাহিরের বাধাকে ভেঙে ফেলে অধ্যাত্মলোকে, তোমারই যে প্রসন্ন মুখের জ্যোতি তাহার দ্বারা আমাকে নিত্য নিয়ত রক্ষা করুক।

---

## সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে?

(বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে মিঃ এল কে এলমহার্ষ্টের "মাটীর উপর দস্যুবৃত্তি" প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আলোচনা)

আজকার বক্তৃতার গোড়াতে বক্তামহাশয় বলেছেন যে আমরা মাটি থেকে উৎপন্ন আমাদের যা কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ যে পরিমাণে লাভ করছি মাটিকে সে পরিমাণে ফিরিয়ে না দিয়ে তাকে দরিদ্র করে দিচ্ছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে সংসারটা একটা চক্রের মত। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে

চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত* হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে, তারপর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ করে' বৃষ্টিরূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায়, তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না আর অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে কত দিন থেকে চলছে তা আমরা জানি না। গাছপালা জীব জন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে, তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্ত্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর একটি জগৎকে সৃষ্টি করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান ও প্রদানের যোগ প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সে ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মানুষের মত বুদ্ধিজীবি প্রাণীর পক্ষে এই সকল আয়োজন উপকরণ অনিবার্য্য সেকথা মানি তবুও একথা তাকে ভুললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে তার যে প্রাণময় সত্তার উদ্ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সত্যকে লঙ্ঘন করলে সে দীর্ঘকাল টিঁকতে পারে না। মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিক মত চলে তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি আর জমার বড় একটা দেখতে পাইনে তখন বুঝতে পারি দেউলে হতে আর বড় বেশি বাকি নেই।

বক্তামহাশয় বলেছেন প্রাচীনকালে পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা আবির্ভূত হয়ে আবার নানা বাধা পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সভ্যতাগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জনতাবহুল সহরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং তাতে করে পূর্ব্বে যে মাটিতে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হ'ত অথচ তা দরিদ্র হ'ত না, সে মাটি সহুরে মানুষদের দাবীদাওয়া সম্পূর্ণরূপে মিটাতে পারল না। এমনি করে সভ্যতাগুলির ক্রমে ক্রমে পতন হ'তে লাগল। অবশ্য আধুনিক কালে অন্তর্বাণিজ্য হওয়াতে সহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এক জায়গাকার মাটি দেউলে হয়ে গেলেও অন্য জায়গার অতিরিক্ত ফসলের আমদানী হচ্ছে। এমনি করে খাওয়া দাওয়া স্বচ্ছন্দে চলছে কিন্তু মাটিকে অবহেলা করলে মানুষকে নিশ্চয়ই একদিন কোনোখানে এসে ঠেকতে হবে।

যেমন প্রাণের চক্র আবর্ত্তনের কথা বলা হয়েছে তেমনি মনেরও চক্র আবর্ত্তন আছে, সেটাকেও অব্যাহত রাখ্‌তে হবে সে কথা মনে রাখা চাই। আমরা সমাজের সন্তান, তার থেকে যে দান গ্রহণ করে মনকে পরিপুষ্ট করছি তা যদি তদনুরূপ না ফিরিয়ে দিই, তবে খেয়ে খেয়ে সব নষ্ট করে ফেলব। মানুষের সমাজ কত চিন্তা কত ত্যাগ কত তপস্যায় তৈরী, কিন্তু যদি কখনো সমাজে সেই চিন্তা ও ত্যাগের স্রোতের আবর্ত্তন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষের মন যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে প্রথার অনুসরণ করে তাহলে সমাজকে ক্রমাগত সে ফাঁকি দেয়; এবং সে সমাজ কখনো প্রাণবান প্রাণপ্রদ হতে পারে না, চিত্তশক্তির দিক থেকে সে সমাজ দেউলে হতে থাকে। ভারতবর্ষে সমাজের ক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হচ্ছে পল্লীগ্রামে। যদি তার পল্লীসমাজ নূতন চেষ্টা চিন্তা ও অধ্যবসায়ে না প্রবৃত্ত হয় তবে তা নির্জীব হয়ে যাবে।

বক্তামহাশয় বলেছেন যে ধানের খড় গাড়ী বোঝাই হয়ে গ্রাম থেকে সহরে চলে যাচ্ছে আর তাতে করে কৃষকের ধানক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং সহরের উচ্ছিষ্ট গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে বলে তা মাটির থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা ঠিক এমনি করেই সহরের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছে বলে আমাদের পল্লী সমাজ তার মানসিক প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না। যে পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আমার আছে, আমি দেখেছি সেখানে কি নিরানন্দ

বিরাজ করছে। সেখানে যাত্রা কীর্ত্তন রামায়ণ গান সব লোপ পেয়েছে, কারণ যে লোকেরা তার ব্যবস্থা করত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের শিক্ষাদীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, তার গতি অন্যদিকে। পল্লীবাসীরা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রাণবান হতে পারছে না, তাদের মানসিক প্রাণ গানে গল্পে গাথায় সজীব হয়ে উঠছে না। প্রাণরক্ষার জন্য যে জৈব পদার্থ দরকার, মনের ক্ষেত্রে তা পড়ছে না। প্রাণের সহজ সরল আমোদ আহ্লাদই হচ্ছে সেই জৈব পদার্থ, তাদের দ্বারাই চিত্তক্ষেত্র উর্ব্বর হয়। অথচ সহরে যথার্থ সামাজিকতা আমরা পাই নে। সেখানে গলিতে গলিতে ঘরে ঘরে কত ব্যবধানের প্রাচীর তাকে নিরন্তর প্রতিহত করে। সহরের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তা-বন্ধন সম্ভবপর হয় না, গ্রামেই মানবসমাজের প্রাণের বাধা-হীন বিকাশ হতে পারে। আজকাল ভদ্রলোকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া নাকি কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ তাঁরা বলেন যে সেখানে খাওয়া দাওয়া জোটে না, আর মনের বেঁচে থাকবার মত খোরাক দুষ্প্রাপ্য। অথচ যাঁরা এই অনুযোগ করেন তাঁরাই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাতে তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রামের এই দুর্দ্দশার কথা কেউ ভাল করে ভাবছেন না, আর ভেবে দেখলেও স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছেন না। কেবল বিদেশীর সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে বাঁচনের রাস্তা নেই। বাঁচতে হলে পল্লীবাসীদের সহবাস করতে হবে। পল্লীগ্রামে যে কি ভীষণ দুর্গতি প্রশ্রয় পাচ্ছে তা খুব কম লোকেই জানেন। সেখানে কোন কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীন ধর্ম্ম এমন বিকৃত, বীভৎস আকার ধারণ করেছে যে সে সব কথা খুলে বলা যায়না।

এলম্‌হার্ষ্ট সাহেব আজকার বক্তৃতায় প্রশ্ন করেছেন যে প্রাণরক্ষার উপায় বিধান কোন্ পথে হওয়া দরকার। আমারও প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন দিকে? একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে গ্রামে যারা মদ খায়, তারা হাড়ি ডোম মুচি প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীরই লোক। মধ্যবিত্ত লোকেরা দেশী মদ তো খায়ই না, বিলাতি মদও খুব অল্পই খেয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে দরিদ্র লোকদের মদ খাওয়া দরকার হয়ে পড়ে, তাদের অবসাদ আসে। তারা সারাদিন পরিশ্রম করে। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে যে ভাত নিয়ে যায় তাই ভিজিয়ে দুপুর বারটা একটার সময়ে খায়, তারপর ক্ষিদে নিয়ে বাড়ী ফেরে। যখন দেহ প্রাণে অবসাদ আসে তখন তা প্রচুর ও ভাল খাদ্যে দূর হতে পারে, কিন্তু তা তাদের জোটে না। এই অভাবপূরণ হয় না বলে তারা ৩।৪ পয়সার ধেনো মদ খায়, তাতে কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ তারা নিজেদের রাজা-বাদশার মত মনে করে সন্তুষ্ট হয়,—তার পর তারা বাড়ী যায়। আচার ও চরিত্রের বিকৃতির মূলেও এই তত্ত্ব।

আমি যে পল্লীর কথা জানি সেখানে সর্ব্বদা নিরানন্দের আব-হাওয়া বইছে, সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত থাকে। মন যদি কথকতা পূজা পার্ব্বণ রামায়ণগান প্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য যোগান্ হয় কিন্তু এখন সে সকলের ব্যবস্থা নেই, তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে জবরদস্তি করে, ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে, সেই গোড়াকার দুর্ব্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে, তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে, সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবাহ করতে হবে।

অপরদিকে আমরা সহরে অন্যরূপ মত্ততা ও উন্মাদনা নিয়ে আছি। আমাদের এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে যে আমরা দেশের সমগ্র অভাব উপলব্ধি করি না, তাই অল্পপরিসরের মধ্যে উন্মাদনার আশ্রয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে শান্ত করি। উচ্চৈঃস্বরে রাগ করি, ভাষায়, লেখায় বা অন্য

আকারে তাকে প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা যতক্ষণ যথার্থভাবে দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের জন্য প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ না করব পূর্ণ আত্মত্যাগ না করব, ততক্ষণ মনের এই গ্লানি ও অসন্তোষ দূর হবে না তাই ক্ষুব্ধ কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে প্রশান্ত করবার জন্য আমরা নানা উন্মাদনা নিয়ে থাকি, বক্তৃতা করি, চোখ রাঙাই—আর আমার মত যারা কাব্যরচনা করতে পারেন তারা কেউ কেউ স্বদেশী গান তৈরী করি। অথচ নিজের গ্রামের পঙ্কিলতা দূর হল না সেখানে চিত্তের ও দেহের খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা হল না। তাই হাড়ি ডোমেরা মদ খেয়ে চলেছে আর আমাদের ও মত্ততার অন্ত নেই।

কিন্তু এমন ফাঁকি চলবে না। প্রতিদিন আপনাকে দেশে ঢেলে দিতে হবে, পল্লীবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি একদল ছেলেকে জানি তারা নন্-কোঅপারেশনের তাড়নায় পল্লীসেবা করতে এসেছিল। যত দিন তাদের কলকাতার সঙ্গে যোগ ছিল, কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, ততদিন কাজ চলেছিল, তার পর সব বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁরা হাড়ি ডোমের ঘরে কি তেমন করে সমস্ত মন দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন? পাড়াগাঁয়ের প্রতিদিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাঁরা কি দীর্ঘকাল-সাধ্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হতে পেরেচেন? এতে যে উন্মাদনা নেই, মন লাগে না। কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধির কোনোরূপ খাদ্য তো চাই, সেই খাদ্য প্রতিদিন জোগাবার সাধ্য যদি আমাদের না থাকে তাহলে কাজেই মত্ততা নিয়ে নিজেদের বীরপুরুষ মহাপুরুষ বলে কল্পনা করতে হয়।

আজকাল আমরা সমাজের তিনস্তরে তিন রকমের মদ খাচ্ছি,—সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রশান্ত করবার মত মদ। হাড়ি ডোমদের মধ্যে এক রকম মদ, গ্রামের উচ্চস্তরের মধ্যে আর এক রকম মদ, আর সহরের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও এক প্রকারের মদ। তার কারণ সমাজে সব দিকেই খাদ্যের জোগানে কম পড়েচে।

---

# আলোচনা

## "বিসর্জ্জন"

[ বিশ্বভারতীর পূর্ব্ব বিভাগের বাংলা ক্লাশে "বিসর্জ্জন" নাটকের প্রথম অঙ্ক অধ্যাপনা কালে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত ]

"বিসর্জ্জন" এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন করে হয়েছে? আমরা দেখতে পাই যে নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা-বিসর্জ্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আরেক বিসর্জ্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণবিসর্জ্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল।

সুতরাং প্রতিমা বিসর্জ্জন এই নাটকের শেষ কথা নয় কিন্তু তার চেয়েও বড়কথা হল জয়সিংহের আত্মত্যাগ—কারণ তখনই রঘুপতি সুস্পষ্টভাবে এই সত্যকে অনুভব করতে পারল যে প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেমের দ্বারাই হয়। এই মৃত্যুতে সে বুঝতে পারল যে সে যা হারাল তা কত মূল্যবান্। ছাগশিশুর পক্ষে প্রাণ কত সত্য জিনিষ সে কথা অপর্ণাই বুঝেছিল কিন্তু রঘুপতির পক্ষে তা বুঝতে সময় লেগেছিল—সে প্রিয়জনকে নিদারুণভাবে হারিয়ে তারপর অনুভব করতে পারল যে প্রাণের মূল্য কত বেশী, তাকে আঘাত করলে তার মধ্যে কত বেদনা।

এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দ মাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল।

রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল তার চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম জয়যুক্ত হল।

নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথমেই দেখা দিলেন রাণী গুণবতী। তাঁর সন্তান হয় নি বলে সন্তানলাভ করবার আকাঙ্খা দেবীকে জানাতে মন্দিরে এসেছেন। তিনি দেবীকে বললেন,—"আমাকে দয়া করে সন্তান দাও! আমার সব আছে দাস দাসী প্রজা কিছুর অভাব নেই কিন্তু আমার তপ্ত বক্ষে আমার প্রাণের মধ্যে আরেকটি প্রাণকে অনুভব করবার ইচ্ছা হয়েছে। আমি এমন একজনকে পেতে চাই যার প্রতি প্রেম আমার নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী হবে। এই বক্ষ বাহু—তা কতখানি ভালবাসা পেতে চায়। শিশু তো একটুকু প্রাণের কণিকা কিন্তু তাকে স্নেহ করবার জন্য মার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে আছে। তাকে জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে সে তার প্রতি তার সমস্ত সঞ্চিত ভালবাসা অর্পণ করবে।"

নাটকের গোড়াটা গুণবতীর এই ব্যাকুল প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে কেন? তার কারণ হচ্ছে প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে একটুখানি যে প্রাণ, প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশী। একদিকে রাণী 'মানত' করচেন যে বিশ্ব মাতার কাছে ছাগশিশু বলিদান দেবেন, অন্যদিকে তিনি সে বলির পরিবর্ত্তে একটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালবাসাটুকু ভোগ করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ অন্যদিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড় জিনিষ তা বুঝেছেন। সুতরাং রাণীর মনে এক জায়গায় প্রাণের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছে, তিনি জানছেন যে ভালবাসা এত প্রগাঢ় হতে পারে যে তার জন্য লোকে নিজের প্রাণকে ও তুচ্ছ করে; আবার অপর পক্ষে অসহায় প্রাণীদের প্রাণের ক্রন্দন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে নি।

তার পর প্রথম অঙ্কে অপর্ণা এল সেই কথাটাই বোঝাতে। সে বললে,—"তুমি যদি একদিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে লালন পালন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্য বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছ—তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও? বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণহত্যায় খুসী হন?—যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে এ ভিক্ষা তাঁর কাছে করছ?"—মায়ের ভিতর দিয়ে প্রাণের মমতা কি করে বিশ্বে প্রকাশ পায় অপর্ণা প্রথম দৃশ্যে সেই কথাটা বলে গেল। গুণবতী সন্তান পাবার জন্য একশত ছাগ বলি দিতে চান, তিনি এত প্রাণের অপচয় করতে রাজি আছেন,—অথচ চিন্তা করে দেখলেন না যে এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে।

প্রাণের মূল্য কত গভীর একদল সে কথা বুঝেছে, অন্যদল তা বোঝে নি—তাই দুইদলে বিরোধ বাধল। গুণবতী ও রঘুপতি একদিকে এবং গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ ও অপর্ণা অন্যদিকে।

জয়সিংহ রঘুপতিকে পিতার মত ভক্তি করত, সে বাল্যকাল থেকে মন্দিরের সকল অনুষ্ঠান ও পশুবলি দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই, যেখানে ভালবাসা সেখানে রক্তপাত চলে না—এই উপলব্ধি তার মনে সম্পূর্ণরূপে স্থান পেতে দেরী হয়েছিল। অপর্ণার ক্রন্দনেই প্রথমে তার পূর্ব্ব বিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হতে সুরু হল। গোবিন্দমাণিক্য এই পশুবলির মধ্যে লিপ্ত ছিলেন না কিন্তু জয়সিংহ শিশুকাল থেকে রঘুপতির কাছে মানুষ হয়েছে—যখন তার বিচার করবার শক্তি জন্মায় নি তখন থেকে এই রক্তপাত দেখে দেখে তার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তাই তার মনে দুই ভাবের বিরোধ উপস্থিত হল—রঘুপতির প্রতি ভক্তি ও বলির জন্য চিরাভ্যাসের জড়তা। এই অভ্যাসের কঠিন বন্ধন তার মনকে কতকটা অসাড় করে দিয়েছিল অথচ সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছিল যে কত বড় অন্যায়কে সে সমর্থন করে এসেছে।

অপর্ণা এসে জয়সিংহের মনকে চঞ্চল করে দিল। যে জীবকে অপর্ণা কোলে করে পালন করছে তারই রক্তধারা মন্দিরের সোপান বেয়ে পড়ছে, এই দৃশ্য দেখে সে কেঁদে উঠ্‌ল। জয়সিংহের মন তাতে নাড়া খেল, সে প্রতিমার দিকে ফিরে বলল, "একি তোমার মায়া? এই হত্যায় মানুষের প্রাণ কেঁদে উঠছে আর তুমি বিশ্বজননী হয়ে এতে সায় দিচ্ছ, তোমার কি দয়া নেই?" জয়সিংহের মন প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সে এই প্রথম আঘাত পেল, তারপর ক্রমে তার মনের মধ্যে এই সংগ্রাম বর্দ্ধিত আকার ধারণ করল। দুই শক্তি জয়সিংহকে দুইদিক হতে আকর্ষণ করতে লাগল। একদিকে অপর্ণা তাকে মন্দির ত্যাগ করতে বলছে, অপরদিকে রঘুপতি তাকে মন্দিরের সীমানায় ধরে রাখতে চায়।

রঘুপতির মনে দয়ামায়া নেই, সে নিষ্ঠুর প্রথাকে পালন করে এসেছে এবং এমনিভাবে শক্তিলাভ করে বড় হয়ে উঠছে। সে দেবীর সেবক বলে লোকের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়ে এসেছে। সে জয়সিংহকে তার সপক্ষে আনতে চায়, মন্দিরের প্রথার গণ্ডির মধ্যে বাঁধতে চায়। কিন্তু অপর্ণা আরেক বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ে জয়সিংহের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বললে যে, "এই নির্দ্দয় পূজার মধ্যে তুমি বাস কোরো না তুমি মন্দির ত্যাগ করে বেরিয়ে এস।"—জয়সিংহের মনে তখন বিরোধ বেধে গেল। একদল লোক বাহ্য শক্তি ও প্রাচীন প্রথাকে চিরন্তন করে রাখতে চায়—অন্যদল বলছে প্রেমই সব চেয়ে বড় জিনিষ। জয়সিংহ এই দোটানার মাঝখানে পড়ল এবং কোনটা শ্রেষ্ঠ পথ তা চিন্তা করে বার করবার চেষ্টা করতে লাগল।

রঘুপতি পণ্ডিত, বৃদ্ধ, সম্মানিত ও শক্তিশালী আর অপর্ণা বালিকা, ভিখারিণী ও সমাজে অখ্যাত। কিন্তু যে শক্তি এই নাটকে জয়ী হয়েছে অপর্ণা তাকেই প্রকাশ করছে। বাইরে থেকে তাকে দুর্ব্বল বলে মনে হয় কিন্তু কার্য্যত তারই জয় হল। অথচ রঘুপতি শক্তিশালী—তারদিকে শাস্ত্রমত, দেশাচার, লোকমত সব রয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার বেশে সত্য প্রেমের দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে বিশ্বমাতার মূর্ত্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। প্রেমের সৈন্যসামন্ত অর্থ প্রতিপত্তি কিছুই নেই—কিন্তু হৃদয়ের গোপন দুর্গে তার শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে।

---

# শোক-সংবাদ

গত ১লা আশ্বিন ১৩২৯ শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হৃদ্‌রোগে হঠাৎ মারা গিয়াছেন। আশ্রমের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহার জীবন বহুকাল ধরিয়া জড়িত ছিল। আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও গৃহস্থদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই বাহিরের লোকেরও বিপদ আপদে উৎসবে প্রাণপণে সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর দূর দূরান্তর হইতে গ্রামের লোকেরা তাঁহার সংবাদ লইতে আসিয়াছে। এখানকার সাধারণ লোকদের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। অতিথি অভ্যাগতদের সম্মান এবং আদর যত্ন করিবার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সকলের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

১২৬৯ সালের ১৫ই কার্ত্তিক কলিকাতায় ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে ৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তিনি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ীর অন্যান্য বালকদের সহিত গৃহশিক্ষকের নিকট হয়। তারপর তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবেশ করেন।

শিক্ষার শেষে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব তাঁহাকে জমিদারীর তত্ত্বাবধানের ভার দেন। কার্য্যপরিচালনার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। এই কারণে মহর্ষিদেব তাঁহাকে খুব ভাল-বাসিতেন, শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপনের পর তিনি তাঁহাকে আশ্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ভার দেন। আশ্রমের

মন্দির ও ছাতিমতলার বেদী ইত্যাদি তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়।

চল্লিশ বৎসর বয়স হইতে তিনি আশ্রমে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মহর্ষিদেব তাঁহাকে শান্তিনিকেতনের অন্যতম ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে তিনি উহার অর্থসচিব নির্ব্বাচিত হন।

---

## আশ্রম-সংবাদ

এবার পূজার ছুটি ৫ই আশ্বিন হইতে ১৯শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ছিল। এই ছুটিতে গুরুদেব আশ্রমের বাহিরেই আছেন। বিদ্যালয় বন্ধ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি আশ্রমের কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র লইয়া কলিকাতায় 'শারদোৎসব' অভিনয়ের জন্য গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি বম্বে, মান্দ্রাজ, মহীশূর হইয়া সিংহলে গিয়াছেন। তিনি বোম্বাই নগরে বক্তৃতা দিবেন। সিন্ধুদেশেও তাঁহার যাইবার কথা আছে।

কলিকাতায় 'শারদোৎসব' একদিন আলফ্রেড থিয়েটার এবং আর একদিন প্যালেস অব ভ্যারাইটিতে অভিনীত হইয়াছিল। গুরুদেব 'সন্ন্যাসী', শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 'লক্ষেশ্বর' শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার 'রাজা' সাজিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'ঠাকুর্দ্দার' অংশ অভিনয় করা স্থির ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের গুরুতর অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হয়। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মিঃ এলমহার্ষ্ট ও এই অভিনয়ে যোগদান করেন। অভিনয়ের মধ্যে অনেকগুলি নূতন গানও হইয়াছিল। অভিনয়ের দল কলিকাতা যাওয়ার পূর্ব্বে আশ্রমে একদিন অভিনয় হইয়াছিল। তাছাড়া অভিনয়ের রিহার্সাল নাট্যঘরেই হইত বলিয়া আশ্রমের শিশুদের 'শারদোৎসব' প্রত্যহই হইত। ছুটিতে বাড়ী যাওয়ার পূর্ব্বে কয়েকদিন রাত্রিদিন 'নীল আকাশে কে ভাসালে' 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' প্রভৃতিগানের কলোচ্ছ্বাসে আশ্রম ভরিয়া উঠিয়াছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অ্যাণ্ড্রুজ কার্য্যোপলক্ষে একবার মুলতান গিয়াছিলেন। তিনিও এবার ছুটিতে গুরুদেবের সহিত আশ্রমের বাহিরেই আছেন। ছুটির পূর্ব্বে তিনি সান্ধ্য সভায় কয়েকদিন 'ভারতবর্ষের কাছে বর্ত্তমান জগতের দাবী,' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। যন্ত্রভার পীড়িত কর্ম্মক্লান্ত সভ্যজগতের মুক্তির যে বাণী ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে নিহিত আছে তপস্যা এবং সাধনার দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তাহাকে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া সেই দেবাধিদেবকে—যাঁহার জাতি নাই এবং যিনি অবর্ণ—আমাদের অর্ঘ্য নিবেদন করিব—বিশ্বমানব তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া আছে, পরম দুঃখের মধ্যেও এই কথাটিকে আমাদের মনে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

ছুটির পূর্ব্বে এক বুধবার প্রাতে শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশির নেতৃত্বে তাঁহার পুরাতন যাত্রাটির অভিনয় হয়। যাত্রার মধ্যে যুদ্ধাভিনয় থাকা একান্ত প্রয়োজন; আমাদের বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন চৌধুরী কিন্তু এবার রণক্ষেত্রে সত্যই রক্তপাত করিয়াছিলেন আর কি! অতিকষ্টে এবার তাঁহার বিপক্ষ যোদ্ধাবেচারীর প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে!

বালকেরা বাড়ী যাইবার আগের দিন সন্ধ্যায় কয়েকটি হেঁয়ালীনাট্য অভিনয় করার কথা ছিল কিন্তু দ্বিপেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য হইতে পারে নাই।

ছুটির পূর্ব্বে আশ্রমের খেলোয়াড়দের সঙ্গে একদিন কলিকাতার মেছুয়াবাজারের Y. M. C. A. Hostel এর ছেলেদের এবং আর একদিন Tomery Hostel এর ছেলেদের ফুটবলম্যাচ খেলা হইয়াছিল। টমারির দলকে আশ্রমের দল পরাজিত করিয়াছিল কিন্তু Y. M. C. A র সঙ্গে খেলায় আমাদের পরাজয় হয়।

Y.M.C.A. Hostel-এর একটি ব্যায়াম ক্রীড়ার পর সন্ধ্যায় শরীরের প্রায় সকল স্থানের মাংসপেশী নাড়ানো কসরতের আশ্চর্য্য খেলা দেখাইয়া সকলকে প্রীতি দান করেন। সেইদিনই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন মহাশয় নানারূপ কৌতুকাবহ অভিনয় করিয়াছিলেন।

সেই সময় চেকোশ্লোভেকিয়া হইতে একটি যুবক পর্য্যটক আশ্রমের আতিথ্য স্বীকার করেন। বর্ত্তমান জগতের উদ্দাম উত্তেজনা প্রবাহ হইতে দূরে নিভৃতে এখানে যে শান্তির এবং তপস্যার সাধনায় ধারা নিঃশব্দে কাজ করিতেছে তাহা তাঁহার চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

পরলোকগত আশ্রমভ্রাতা ৺সর্ব্বেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতি উপলক্ষে প্রতিবৎসর এই সময় "সর্ব্বেশ কাপ" ফুটবল খেলা হয়, এবার কার্য্যবিভাগের ছাত্রেরা এই কাপটি জিতিয়াছেন।

আচার্য্য সিল্‌ভাঁালেভি।—

গত ২১শে সেপ্টেম্বর আচার্য্য ডাক্তার সিলভাঁালেভি বোম্বাই নগরের "স্যঁ ফ্রাঁসে" নামক সম্মিলনের ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সভ্যদিগের নিকট "ভারতবর্ষ ও বিশ্বমানব" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতাতে বলিয়াছেন যে যদিও মধ্য যুগে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শুষ্ক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনাই অধিক হইত তথাপি তাহারা সক্রেটিস প্লেটো ও এরিষ্টটলের, মানুষ ও তাহার সমাজ সম্বন্ধে যে মতগুলি গ্রীক সভ্যদিগকে বৈশিষ্ট প্রদান করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই। সক্রেটিস্ এরিষ্টটল ও প্লেটোপন্থীগণ পারিপার্শ্বিক মানব সমাজের সহিত সম্বন্ধ রেখে, মানুষকে পৌরজন রূপেই দেখিয়াছেন। এই ধারণাটির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর যাবতীয় জনপদের ধারণা তাঁহাদের মন অধিকার করিয়া বসিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারা নিজের দেশটিকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের এক অংশ বলিয়া বুঝিতেন। এইরূপ তাঁহারা অপর জীবনধারার লোকদিগকে বুঝাইয়া দেখিতেন; গ্রীকগণ অন্য জাতীয় লোকদিগকে তাঁহাদের উচ্চারণের অস্পষ্টতার জন্য "বারবেরিয়ন" বলিতেন কিন্তু ব্রাহ্মণগণের "ম্লেচ্ছ" কথাটির ভিতর যে ঘৃণার ভাব ছিল, "বারবেরিয়ন" এই গ্রীক কথাটির মধ্যে তাহা ছিল না। হেরোডোটাস্ "Barbarian," দেশ সমূহে ভ্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ম্লেচ্ছ দেশযাত্রা বর্জ্জনীয় ছিল।

ভারতবর্ষের সহিত ইরান চীন ও সমস্ত পশ্চিম দেশের সভ্যতার ধারার তুলনা করিলে দেখা যায় যে এই দিক দিয়া ভারতবর্ষের সহিত তাহার মিল নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম যদিও ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু তাহা অত ভাব পায়ও নাই ভারতবর্ষেই। বোধ হয় একমাত্র "শকুন্তলা" ও পৃথিবীর দার্শনিক কবিতার শ্রেষ্ঠতম "ভগবদ্গীতা" বাদ দিলে মানুষ মানুষকে সার্ব্বজনীনতার ক্ষেত্রে দেখিতেছে এরূপ ভাব সমস্ত সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ভারতবর্ষ সর্ব্বমানবের পরমাত্মার ধ্যানে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছে, মানব সত্তার গান গাহিয়াছে কিন্তু বাস্তব মানুষকে দেখে নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কোনও ভৌগলিক, কোনও ঐতিহাসিক, প্লেটো বা এরিষ্টটলের ন্যায় কোনও বিশ্বমানববাদী দার্শনিক দেয় নাই। বিশ্বমানব ভারতবর্ষের চিন্তার বাহিরে ছিল।

যাহা হউক ভারতবর্ষ বর্ত্তমান যুগে বিশ্বমানবের জীবনে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা ভবিষ্যতে যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর যাবতীয় মানবের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিবে, এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, কারণ তিনি সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে ক্রমাগত দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠিন পরীক্ষায় যে সমস্ত সত্যে উপনীত হইয়াছে তাহার সারভাগ অত্যন্ত ধীরতার ও নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছেন এবং ভাবজের যাহা শ্রেষ্ঠসম্পদ তাহার সহিত ইউরোপের পরিচয় সাধন করাইয়া দিয়াছেন। [illegible]

বৌদ্ধ-সংঘে আচার্য্য লেভি—

বোম্বাই নগরের বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ডাক্তার এ, এল, নায়ারের গৃহে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আচার্য্য লেভি তাঁহার পত্নী ও পুত্র সহ একটি সান্ধ্য সম্মিলনীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

বোম্বাই বৌদ্ধ সংঘের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুক্ত জি, কে, নরিমন্ সংস্কৃত ভাষায় একটি অভিনন্দন পাঠ করেন, তাহাতে তিনি আচার্য্য লেভিকেই বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন ও বলেন যে যখন বিভিন্ন-দেশীয় আচার্য্যগণ পালি, সংস্কৃত, চীন ও তিব্বতী প্রভৃতি এক একটি ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনাতে ব্যস্ত তখন আচার্য্য লেভি এককালে ঐ চারিটি ভাষায় প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ণ-স্বরূপটির আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি নেপালের মহারাজের সৌজন্যে তিনি সেখানে মধ্যমাগমের যে অংশগুলি পাইয়াছেন তাহা পালী মজ্ঝিম নিকায়ের সহিত মিলাইয়া দেখিতেছেন।

কলিকাতায় দুইদিন শারদোৎসব অভিনয়ের পর ১৯শে সেপ্টেম্বর গুরুদেব সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেন। মিঃ এল্মহার্ষ্ট তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা ২১শে সেপ্টেম্বর পুনায় পৌঁছিয়া অল্প কয়েকদিন সেখানে ছিলেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মিঃ মরিস ও আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য সিলভাঁ লেভি কয়েকদিন তাঁহাদের সহিত সেখানে কাটাইয়াছেন।

পুনার অবস্থানকালে তিনি 'India has her Renaissance' নামে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মিঃ এণ্ড্রুজও শান্তিনিকেতন হইতে পুনায় গিয়া গুরুদেবের সহিত ব্যাঙ্গালোর যাত্রা করেন। যাত্রাপথে বেলগাঁও ও হুবলি ষ্টেশনে স্থানীয় লোকেরা তাঁহাদের অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্গালোরে গুরুদেব 'The vision of India's History' নামে একটি লিখিত প্রবন্ধ সভায় পাঠ করেন। পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন।

ব্যাঙ্গালোর হইতে গুরুদেব ২৯শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজে পৌঁছান। মাদ্রাজে তিনি 'The vision of Indian History' এবং "Ideals in education" নামক দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১লা অক্টোবর তাঁহারা কৈম্বাটোরে পৌঁছান। কৈম্বাটোরে মিঃ এণ্ড্রুজ গুরুদেবের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় বিশেষভাবে তিনি শান্তি-নিকেতন বিশ্বভারতীর ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বলেন। গুরুদেব সেখানে 'An Eastern University' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার উদ্যোগ শান্তিনিকেতনে আরম্ভ হইয়াছে এবং সত্যান্বেষণই এই বিশ্বভারতীর একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

কৈম্বাটোর হইতে একদিন মোটরে গুরুদেব 'vatha-malaplayam' নামে একটি ক্ষুদ্রগ্রামে আহূত হইয়া যান। এখানে বহু দিন পূর্ব্বে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব একবার গিয়াছিলেন। গ্রামবাসীদের হৃদয়ে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি এখনও জাগরূক আছে। তাঁহারা গুরুদেবকে শ্রদ্ধার সহিত আশ্রমের জন্য ১৮৩৲ টাকা উপহার দেন। এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গুরুদেব বিশ্বভারতীর বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আচার্য্যদেবকে কৈম্বাটোর হইতে অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কিছুদিন বিশ্রামের জন্য ব্যাঙ্গালোর যাইতে হয়। সেখানে মিঃ এণ্ড্রুজ বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। ৮ই অক্টোবর তাঁহারা পুনরায় মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা সিংহল যাত্রা করেন। সিংহলে, কলম্বো, ক্যাণ্ডি, নুয়ারা এলিয়া প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া গুরুদেবের ত্রিবাঙ্কুর যাইবার কথা আছে—সেখানে রাজঅতিথিরূপে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছেন। সেখান হইতে তিনি পুনরায় মাদ্রাজ, বোম্বে প্রভৃতি স্থান হইয়া বোধ হয় ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিবেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার করাই তাঁহার এই পর্য্যটনের উদ্দেশ্য।

ছুটির মধ্যে মিঃ পিয়ার্সন আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছুটির মধ্যে যে অল্প কয়েকটি ছাত্র ও অধ্যাপক আশ্রমেই

ছিলেন, শারদোৎসব বিজয়াদশমী, লক্ষ্মীপূর্ণিমা ও কালী পূজার দিন সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত আঁদ্রে কার্পলের বিশ্বভারতীতে কলাবিভাগের কার্য্যে যোগদানের সংবাদ "শান্তিনিকেতনের" পাঠকেরা পূর্ব্বেই অবগত আছেন—তিনি আগামী ১৭ই নভেম্বর কলম্বো পৌঁছাইয়া খুব সম্ভব গুরুদেবের সঙ্গে একত্রে আশ্রমে আসিবেন।

বিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিত উইন্টারনিট্‌স্‌ও আগামী ২০এ নভেম্বর বোম্বে পৌঁছাইবেন, তাঁহারও গুরুদেবের সহিত এক সঙ্গেই আশ্রমে আসিবার কথা আছে।

আমাদের বড় সৌভাগ্যের বিষয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্যাট্রিক গেডিস ও তাঁহার পুত্র গত ৩রা নভেম্বর আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আশ্রম, সুরুল এবং আসপাশের গ্রামগুলি পরিদর্শন করিয়া গৃহনির্ম্মাণ, পুষ্করিণী সংস্কার, ম্যালেরিয়া দূর করা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে উপদেশ দিয়া তিনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

আমেরিকা হইতে Miss Gretchen Green নামক একটি বিদুষী মহিলা সুরুলে কৃষি-বিভাগে আসিয়া পল্লীসেবা বিভাগের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন—তাঁহার দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির রুগ্নব্যক্তিদের বিশেষ সাহায্য হইতেছে।—গ্রামের ছোট ছেলেদের তিনি ইতিমধ্যেই গীত অভিনয় স্বরচিত থিয়েটার প্রভৃতির সাহায্যে বশ করিয়া লইয়াছেন। ইতিমধ্যে সুরুলে একদিন গ্রামের ডোমপাড়ার লোকেরা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। গ্রামে প্রতিদিন যাহাতে কীর্ত্তন ও কথকতার ব্যবস্থা হয় সে জন্য সুরুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

হাসপাতালের পশ্চিমের পুষ্করিণীটি বহুকাল হইতে আশ্রমের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতার একটি আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রেরা মিলিয়া ছুটির পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীটির চারিধার কতকটা পরিষ্কার করিয়াছিলেন—অধ্যাপক গেডিস মহাশয় এই পুষ্করিণীটি বুজাইয়া ফেলার বিরোধী; ইহাকে যাহাতে সুন্দর করিয়া রাখা যায় সে সম্বন্ধে তাঁহার প্ল্যান তিনি আমাদের শীঘ্রই লিখিয়া পাঠাইবেন বলিয়াছেন।

ছুটির পূর্ব্বে ছেলেরা উৎসাহের সঙ্গে ফুল বাগান ও রাস্তা করিতেছিল। শিশুবিভাগের বাগানটি সকল ঘরের বাগান অপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে।

আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশি 'বুধবার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শান্তিনিকেতন' প্রেস হইতে প্রকাশিত করিতেছেন। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা।

ছুটীর পূর্ব্বে আশ্রমে কয়েকজন অতিথির সমাগম হইয়াছিল। 'রেলওয়ে গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ টি, ই, থম নদীয়া জেলার ভজনঘাট আশ্রমের স্বামী চিদানন্দের সহিত আশ্রম পরিদর্শনার্থ শান্তিনিকেতনে আসিয়া দুইদিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়েই St. Pauls College এর অধ্যক্ষ Rev. E. C. Dewich এবং St. Pauls School এর প্রধান শিক্ষকও আশ্রম পরিদর্শনার্থ আসেন। ইঁহারা সকলেই ছাত্র ও অধ্যাপকদের সঙ্গে এই কয়েকদিন আহার করিয়াছিলেন।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত আমেরিকার মিঃ রবার্টস্‌ও কয়েকদিন আসিয়া আশ্রমবাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখাইয়া শিশুদের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।

ছুটির পূর্ব্বে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় এখানে আসিয়া হাঁসপাতালের কার্য্যে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন,—এই জন্য আমরা তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ | অগ্রহায়ণ, সন ১৩২৯ সাল। | ১১শ সংখ্যা

## ২৯এ পৌষ, মন্দির

পৃথিবী মানুষকে খাটিয়ে নিচ্ছে। ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় মানুষ অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে খাটছে, বলেই বেঁচে থাকতে পারছে, জীবপ্রবাহও রক্ষা হচ্ছে। কিন্তু কাজ করে মানুষের শুধু জীবন রক্ষা হয় না, সে আনন্দও পায়। শরীর রক্ষা ছাড়া আত্মার জন্যও আমাদের বড় বড় কাজ ও অনুষ্ঠানের সন্ধান করতে হয়। অর্থাৎ আত্মার জন্য শক্তি চালনার এমন ক্ষেত্র চাই যা, তার ক্ষুদ্র প্রয়োজনের অতীত। যেখানে আত্মা আপন মুক্ত স্বরূপকে অনুভব করতে পারে, জানতে পারে যে সে কেবল ভোক্তা নয় সে কর্ত্তা, যেখানে তার বিশুদ্ধ অত্মোপলব্ধিই তার সকলের চেয়ে বড় লক্ষ্য। সেই উপলব্ধিতে সঞ্চয় নেই, ত্যাগ আছে; অহঙ্কার নেই আনন্দ আছে; সেখানে কর্ম্ম বন্ধন নয়, কর্ম্মই মুক্তি।

সমুদ্র পার হতে বড় বড় জাহাজের দরকার, মানুষ মহাসমুদ্রের যাত্রী। পাড়ি দেওয়ার বাহন হচ্ছে বড় কাজ, ত্যাগের কাজ। একাজে আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ এমন কি আমাদের প্রাণের ভয়ও ভুলিয়ে দেয়। আমরা এর ভিতরে আমাদের সত্যস্বরূপ দেখতে পাই, আমরা আমাদের বড় করে জানতে পারি।

ছোটবেলা থেকেই আমরা ছোট সুখদুঃখের গণ্ডীর, মধ্যেই মানুষ হতে থাকি বলে আমরা যখন বড় কাজের ক্ষেত্রে যাই তখন সেখানেও আমাদের জটিলতা, আমাদের মনের কুটিলতা বড় দীনভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এই জন্য বড় কাজের মধ্যে যে সত্য-মূর্ত্তি আছে সেটা দেখতে পাওয়া বড় দরকার, এই দেখতে পাওয়াই আমাদের সাধনা। যেই একবার সে সত্য-মূর্ত্তিটী দেখতে পাব অমনি আমরা আনন্দে সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভুলে যাব।

খাওয়াদাওয়া, সংসার, জীবনরক্ষার জন্য আমাদের যে চেষ্টা সেটা আমরা একেবারে দূর করে দিতে পারি না, সে আমাদের লাগবেই—কিন্তু দেখতে হবে, পাছে সংসারকে ভূমার আসনে না বসাই। পৃথিবীর মধ্যে বড় বড় দেশ বড় বড় কাজের ভার নিয়েছে, যারা নেয়নি তারা বর্ব্বর হয়ে নিজেদের স্বার্থপরতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। কোনো কোনো দেশে মানুষ ছোট সংসার পেরিয়ে নিজের দেশের মধ্যে নিজের স্বরূপকে জানতে চাচ্ছে। তারা তাদের ছোট দেশকে বড় করে তুলতে প্রাণমন দিচ্ছে, বলছে আমার রাজ্য পৃথিবীর বারোআনা ভাগ। এরা বস্তুর দিক থেকে বড় হয়েছে। বস্তুর দিক থেকে বড় হলেও মানুষ বড় হয়। যে লোক মুদীর দোকান করেচে তার থেকে যে লোকের ব্যবসা পৃথিবী-

জোড়া তার আত্মা খানিকটা বড় হবেই—কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নয়। তাতে পাপ যে কত বাড়তে থাকে তার সাক্ষ্য আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই বড় বড় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কত দানবেরই কাণ্ডই না চলছে।

কারাগার একটু বড় আয়তন বলে মানুষ যদি তার মধ্যেই বাস করতে থাকে তবে সে ক্রমে ক্রমে মুক্তির কথা ভুলে যায়। তেমনি স্বার্থপরতাও খানিকটা মুক্তির রূপ ধরে আজ মানুষকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু এ ভুল ভয়ানক। নিজের ছোট সংসার ছাড়িয়ে একটু বড় করে বুদ্ধি খাটাতে হয় বলে মানুষ এই নিদারুণ স্বার্থপরতাতেও তৃপ্তি পায়।

আসল কথা হচ্ছে সংসারকেও বড় করতে হবে আত্মাকেও বড় করতে হবে। বস্তুর ক্ষেত্রকেও বড় করতে হবে নইলে জাতির মধ্যে স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ হবে না। কিন্তু বস্তুর ক্ষেত্রই একান্ত না হয়ে উঠে। আত্মাকে বড় করতেই হবে, বাইরের দারিদ্র্য সেও ভাল আত্মার সম্পদে যেন মানুষ বড় হয়ে উঠে। যে আমি দীন যে আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত সে আমিই একান্ত হয়ে উঠলে পাপের সৃষ্টি হয়, সেইজন্যই এমন স্থান চাই যেখানে "আমি" সত্যিকার ক্ষেত্র পায়। আমার এই অহংটা ভিক্ষুকের মত সব জিনিষই আঁকড়ে ধরবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম এই ভিক্ষুকের ধর্ম্ম নয়, আত্মার ধর্ম্ম নিজেকে দান করা। সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে দিয়ে, আপনাকে ত্যাগ করে আনন্দ পান, আত্মাও তেমনি যেখানে নিজেকে দিতে পারে সেখানেই আনন্দ পায়, সেখানেই সৃষ্টি কর্ত্তার সঙ্গে তার সুর মিলে যায়। এই দেওয়ার দ্বারাই আমরা যে তাঁর সরিক, তাঁর সহযোগী তা বুঝতে পারি।

কিন্তু যেখানে অহমের ক্ষেত্র সেখানে এক কুকুর আর এক কুকুরকে কামড়াতে যায়, আমার দশহাজার সৈন্য নিয়ে যখন তোমার দেশকে মারতে লজ্জা বোধ হয় না। মানুষ তখন মানুষকে দেখতে পায় না আপনার স্বরূপ ভুলে যায়। এইজন্য মানুষের বড় সৌভাগ্য মানুষ যদি আত্মার প্রসারণের জন্যে বড় ক্ষেত্র পায়। আমরা যেখানেই থাকি না কেন কর্ম্মকে স্বার্থের বন্ধন থেকে মুক্ত করে যদি দেখতে পাই তবেই তাকে সত্য করে দেখা হবে।

সংসারে আমাদের ছোটঘরে ছোট একটা প্রদীপ জ্বাললেই ঘরের সব জিনিষ আমরা দেখতে পাই কিন্তু পৃথিবীর নদী, পর্ব্বত দেখতে গেলে আমাদের প্রদীপের আলো জ্বাললে হবে না তখন দরকার সূর্য্যের আলোর। আমাদের তখন শুধু দরজা খুলে বাইরে তাকাতে হবে। ছোট প্রদীপটী জ্বালিয়ে সংসার গড়তে পারি কিন্তু যদি সংসারকেই একান্ত না করি তবেই সূর্য্যের প্রয়োজন। এই যে বড় পৃথিবীতে, বড় আকাশের মধ্যে জন্মেছি, এই যে বিশ্বপ্রকৃতির বড় সৌন্দর্য্যরূপ এর মধ্যে বড় করে চাষ করব, বড় করে বাণিজ্য করব সেটা রয়েছে গৌণ—কিন্তু তাঁর এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে বিরাট রূপকে দেখব এবং তাঁর সঙ্গে আত্মার অন্তরতম যোগকে জানব এই লক্ষ্যই হচ্ছে মুখ্য।

এইজন্যই কর্ম্মকে কেবল স্বার্থসাধনের উপায় করলে চলবে না—বড় করতে হবে। মানুষ কি কেবল দোকানদার, মানুষ কি কেবল কেরাণী? তাহলে এই অগণ্য নক্ষত্রখচিত আকাশ কেন? তাহলে অসীম তার বাঁশী বাজিয়ে ডাক দিয়েচে কেন, এস, এস? বলছে কেন, বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস? ঘর বলে, 'থাক, থাক, এই ছোট টুকুর মধ্যেই থাক,' কিন্তু কেন সমস্ত বিশ্বজগৎ বলছে, 'ভয় নেই, বেরিয়ে এস, তুমি ঐ টুকুর ভিতরেই যদি থাকবে তবে আকাশের থালায় এত আলো জ্বলল কেন?'

শুধু কি বাইরে থেকে এই ডাক আসচে, আত্মার মধ্যেও একটা কান্না আছে। এতটুকুর মধ্যে সে সুখ পায় না, তার অভাব পূরণ কেবল সংসারের মধ্যে মেলে না। তাই, কর্ম্মকে কেবল স্বার্থসাধন থেকে মুক্ত করতে হবে। আপনাকে দেওয়ার যজ্ঞক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। বাংলা-দেশে এমন যজ্ঞক্ষেত্র কোথায়? এমন কি, বিদ্যালয় পর্য্যন্ত কেরাণীর জায়গা হয়ে উঠেছে। দেশে এমন অনুষ্ঠান বড় কম যেখানে মানুষ নিজেকে দান করতে পারে।

ধর, আমরা এই আশ্রম যদি তপস্যার ক্ষেত্র করি তবে

বাইরের ফলের দিকে একান্ত করে তাকাব না। প্রতিদিনই তাঁকে আমাদের কর্ম্মের মধ্যে জানতে হবে। জোড়হাত করে রোজ বলতে হবে "নমঃ শিবায়চ"। আমি নিজকে দান করব, তাঁর হাতেই ফিরিয়ে দেব আত্মাকে "য আত্মদা"। এ দান প্রয়োজনের বাইরে। এ কথা মনে রেখে রোজ জোড় হাত করে যেন বলি—

অসতোমা সদ্গময়
তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা মৃতং গময়
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
হরিঃ ওঁ

---

# "বলাকা"র ব্যাখ্যা

বলাকা ( ১৭ )

"হে ভুবন আমি যতক্ষণ তোমারে না বেসেছিনু ভালো"—

(১ম শ্লোক)

যতক্ষণ বিশ্বকে ভাল বাসি নি ততক্ষণ আমার জীবনে তার দান কিছু কম পড়েছিল। তখন তার আলোতে সব সম্পদ পূর্ণ হয় নি—কারণ যখন আলোর মধ্যে আনন্দকে দেখি তখনই আমার কাছে তার সার্থকতা আছে। আলো আছে বলেই গাছ পালার অস্তিত্ব আছে কেবল এই ব্যাপারটি যখন আমার কাছে সপ্রমাণ হল তখনও তার আসল তাৎপর্য্য (significance) আমার কাছে সুস্পষ্ট হয় নি। কিন্তু যখন ভুবনের দিকে চেয়েথেকে আনন্দের উদ্বোধন হল তখন যে আলো আমার মনের সঙ্গে মিলন সম্পাদন করল তার সত্য আমার কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। আমি যতক্ষণ ভুবনকে ভাল বাসি নি ততক্ষণ সমস্ত আকাশ দীপ হাতে চেয়েছিল—আমার আনন্দের দ্বারা তার আলোর সত্য পূর্ণতা লাভ করবে বলে'। আকাশ সূর্য্যচন্দ্রতারার বাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করে আছে। কখন্ আমি প্রেমের আনন্দদৃষ্টি দিয়ে তার সত্যকে উপলব্ধি করব। সে বহুবৎসর ধরে দীপ জ্বালিয়ে এই আনন্দের অপেক্ষা করে আছে, কখন আমার জীবন তারার পূর্ণ সত্যকে পাবে।

(২য় শ্লোক)

যেদিন প্রেম গান গেয়ে এল—তোমার সঙ্গে আমার মিলন হল, সেদিন কি যেন কানাকানি হল। ভুবনের সঙ্গে আমার পরিণয় হল, সে বললে—আমি তোমায় বরণ করলুম। আমার প্রেম বিশ্বের গলায় আপন মালা পরিয়ে দিয়ে হেসে দাঁড়াল। সে তার দিকে হেসে চাইল—তারপর একটা কিছু দিল। যা গোপন বস্তু কিন্তু যা চিরদিনের জিনিষ, সে তাকে সেই আনন্দ সম্পদ্ দিয়ে গেল যা তার তারার আলোয় চিরদিনের মত গাঁথা হয়ে রইল।—এই সম্পদ উপহার পাবে বলেই ভুবন তারার দীপ জ্বালিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে পথ চেয়ে বসেছিল—কবে আমার প্রেমের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হবে, সে এসে ভুবনের গলায় মালা পরিয়ে দেবে। তারার আলোর মধ্যে এই প্রতীক্ষা ছিল। যেদিন প্রেম এল, সেদিন সে এমন কিছু দিয়ে গেল যা ধ্রুব-তারায় ধ্রুব হয়ে রইল, যা ভুবনকে পরিপূর্ণতা দান করল।

বলাকা ( ১৮ )

"যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি"

(১ম শ্লোক)

আমি যতক্ষণ স্থির হয়ে আছি ততক্ষণ বস্তুসমূহ ভার-স্বরূপ হয়ে থাকে। তখন জীবনের বোঝা, সঞ্চয়, ধন,—আমার পক্ষে দুর্ব্বহ হয়। যখন আমার চলা বন্ধ হয়ে যায়, তখন ধনজন যা কিছু জমতে থাকে তা কিছুই চলে না, তারা আমাকে ঘিরে ফেলে। সেই সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমি জেগে আছি। বইয়ের পোকা যেমন তার পাতার মধ্যে বসে বসে তাদের কাটে আর খায়, তেমনি আমি এই জায়গায় বসে বসে কেবল খাচ্ছি আর জমাচ্ছি। আমার চোখে ঘুম নেই—মনের মাথায় বোঝা ভারী হয়ে উঠেছে। দুঃখ নূতন নূতন হয়ে বেড়ে চলেছে, বোঝাই হয়ে উঠছে আমি স্থির হয়ে আছি বলে সতর্ক বুদ্ধির ভারে, সংশয়ের শীতে জীবনের চুল পেকে গেল, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

(২য় শ্লোক)

আমি যেই চলতে সুরু করলেম, অমনি মন তার মাথায় পিঠে যে বোঝা চারিদিক থেকে এঁটে দিয়েছিল, চলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সংঘাতের দ্বারা তার আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল, ব্যথার সঞ্চয়ের ক্ষয় হল। চলার সংঘর্ষে আনন্দের আবেগে যে আবরণ জড়িয়ে ধরেছিল তা ক্ষয় হতে থাকে। মন মতামতের (opinionএর) দুর্গে বদ্ধ হয়ে বাঁধা আইডিয়ার মধ্যে থাকলে সে বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যা চলে না, স্থির হয়ে জমতে থাকে তা মলিনতার আবর্জ্জনা। মন যতই নূতন পরিবর্ত্তনের মধ্যে চলছে ততই সে নব নব সম্পদে ভূষিত হচ্ছে। সনাতনের অচলতার দ্বারা মন নবীভূত (Purified) হতে পারে না। চলার স্নানেই সকল বস্তু ধৌত নির্ম্মল হয়ে যাচ্ছে। জরা জীবনকে যে পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন করে রাখে, জীবনের চলার প্রাণশক্তি ( vigour ) সেই সঞ্চিত স্তূপকে ফেলে এগিয়ে চলে। স্থবিরতা কেবলই পুরাতনকে আঁকড়ায় সে বোঝা ফেলে দিয়ে হালকা হতে চায় না, তাই সে মলিন স্তূপের দ্বারা জড়িত হয়ে থাকে। এর থেকে বাঁচবার উপায় হচ্ছে মনকে নিত্যনবীন পথে চালনা করা। চলার আনন্দ-রস পান করে মনের যৌবন বিকশিত হয়।

(৩য় শ্লোক)

আমি থামব না। আমি বলব না যে, "আমার চলা সারা হয়ে গেল,—সুতরাং এখন আমি যা সঞ্চয় করেছি তাই দিয়ে থুয়ে আমি গৃহস্থ হয়ে বসলাম।"—আমি যাত্রী, আমি সম্মুখপানে চলব। কে পিছন থেকে ডাকছে, আমি তার কথা শুনব না। আমি আর সঞ্চয়—স্থবিরতা—মৃত্যুর গোপন প্রেমে ঘরের কোণে লুকাবো না, আমি ঘর-ছাড়া হয়ে পথের পথিক হব। আমি চিরযৌবনকে মালা পরাব! ঐ যে চিরযৌবন চলেছে, পথিকের বেশে তাকে আমি আমার যা কিছু নিজের রচনা, সৃষ্টি, নিজের যে সব দেবার জিনিষ সমস্তই দেব। যে বার্দ্ধক্য সঞ্চয়ের দুর্গে সতর্ক বুদ্ধির দেওয়ালে বদ্ধ হয়ে বসে আছে, তার আয়োজনকে আজ দূরে ফেলে দিয়ে আমি হালকা হয়ে চলব।

(৪র্থ শ্লোক)

হে আমার মন, অনন্ত গগন যাত্রার আনন্দ গানে পূর্ণ হয়ে গেছে। যে রথ তোমায় নিয়ে চলেছে বিশ্বকবি তার মধ্যে বসে আছেন। গ্রহতারারবি যাত্রার গান গাইতে গাইতে চলেছে। মন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চলার আনন্দে পূর্ণ হয়েগেছে।

বলাকা ( ১৯ )

"আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে"

আমি জগৎকে ভাল বেসেছি বলে এতে আমার আনন্দ আছে। আমি জীবন দিয়ে এই বিশ্বকে ঘিরে ঘিরে বেষ্টন করে রেখেছি। আমি বিশ্বের প্রভাত-সন্ধ্যায় আলো-অন্ধকারকে আমার চেতনা দিয়ে পূর্ণ করেছি—তারা আমার চৈতন্যের ধারার উপর দিয়ে ভেসে গেছে। আমি অনুভব করেছি যে জীবন ভুবনের সঙ্গে মিলে গেছে, এরা তফাৎ নয়। আমি জীবনকে আলাদা ভালবাসিনা বলে আমার কাছে জগতের আলোকে ভালবাসা মানেই আমার প্রাণকে ভালবাসা। আমি জীবনকে কখনো জগৎ-ছাড়া দেখি না, তাই আমার ভয় হয় না পাছে জগতের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়। আমি যদি জগৎ থেকে দূরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতুম তবে এই অনুভূতি হয় তো থাকতো না। কিন্তু আমি জগতে বাস করছি বলে আমার কাছে জীবন ও ভুবনের ভালবাসা এক হয়ে আছে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জগৎ ও আমার চৈতন্য এক হয়ে গেছে বলে, চৈতন্য থেকে বিরহিত জগৎটা আমার কাছে একটা abstraction। জীবন ও ভুবন যখন মিলিত হচ্ছে তখনই উভয়ে সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভ করছে।

(২য় শ্লোক)

—এও যেমন একটা সত্য; তেমনি এই বস্তুবিশ্বে একদিন আমাকে মরতে হবে এই ব্যাপারটাও তেমন সত্য। এমন একদিন আসবে যখন আমার যে বাণী ফুলের মত ফোটে, তা বাতাসের স্পর্শে ফুটে উঠবে না। আমার চোখ প্রতিদিন আলো আহরণ করছে, কিন্তু সেই দিন আমার চোখের সঙ্গে আলোর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন আমার হৃদয় অরুণোদয়ের আহ্বানে ছুটছে, সে দিন

তা ছুটবে না। একদিন রজনী কানে কানে তার রহস্যবার্ত্তা বলবে না—সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তির কাজ ফুরিয়ে যাবে। তাই পার্থিব জীবনের যে এমনি করে অবসান হবে এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

( ৩য় শ্লোক )

জগৎ জীবনকে এমন একান্ত করে চাচ্ছে। আলো-অন্ধকারের মধ্যে, প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে সে কত করে জগৎকে চাচ্ছে এবং উভয়ের মিলনের দ্বারা এই চাওয়ার সার্থকতা হচ্ছে। এ সত্য; তেমনি একদিন এই জগতের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, আমাকে মরতে হবে, সেও সত্য। তবে কি করে এই Contradiction হতে পারে, এই দুই সত্যের মধ্যে কি মিল নেই? যদি মিল না থাকে, তবে জগৎকে সে চাইলুম, সে যে আমাকে ভোলালে. তা যে একটা মস্ত প্রবঞ্চনায় গিয়ে ঠেকল। বিশ্বের সঙ্গে জীবনের যে আনন্দ সম্বন্ধ স্থাপিত হল তা যদি একদিন মিথ্যা হয়ে যায়, যদি এমন করে সব ছাড়তে হয়, তবে তো কোনো মানে থাকে না।

অথচ কোনো ক্রূরতা তো বিশ্বে বঙ্কীরেখা আঁকে নি। যদি বিশ্ব এতদিন এত বড় প্রবঞ্চনাকে বহন করে এসে থাকে, যদি মৃত্যুর নিরর্থকতায় সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়,—তবে তার কোনো চিহ্ন এই পৃথিবীতে কেন দেখছি না? তা হ'লে তো বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য্য থাকত না। পুষ্পকে কীট কাটলে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি মৃত্যুও সত্য হত তবে সব মৃত্যু বিশ্বে তার দংশনের ছিন্ন ফুটো রেখে দিয়ে যেত। তবে মৃত্যুকীট অনায়াসে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো করে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্য-ফোটা ফুলের মত আমার সামনে রয়েছে? এই সৌন্দর্য্যের Emphasis এর মানেই হচ্ছে যে মৃত্যুই সর্ব্বগ্রাসী abyss নয়, মৃত্যুই চরম সত্য নয়। কারণ যদি তাই হত তবে তার প্রত্যেক দংশন ভুবনকে ছিদ্রে আচ্ছন্ন করে কালো করে শুকিয়ে ফেলত।

[ আলোচনা ]

(১)

"এমন একান্ত করে চাওয়া"—এমন করে যে জগৎকে চাচ্ছি আর এমন করে যে জগৎকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি এই দুটোই যদি সমান সত্য হয়েও দুটো Contradictory হয় তবে জগতে এই ভয়ানক অসামঞ্জস্যের ভার এই প্রবঞ্চনা থেকে যেত, তবে তার সৌন্দর্য্যের মধ্যে ক্রূরতার চিহ্ন দেখতাম। কিন্তু তা তো কোথাও দেখি না। তবে এই দুই সত্যের মিল কোথায়?

এর উত্তর এই কবিতায় নেই,—কিন্তু সেটাকে এমনি ভাবে বলা যেতে পারে।—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না গেলে সীমার পুনরুজ্জীবন ( renewal ) হয় না। [ 'ফাল্গুনী'তে আমি এই কথাই বলেছি। 'ফাল্গুনী' 'বলাকা'র সমসাময়িক। ] সীমাকে পদে পদে মরতে হয়, পুনঃপুনঃ প্রাণসঞ্চার না হলে সে যে জীবন্মৃত হয়ে রইল। রূপ form যদি স্থবির হয়—fluid জীবন যদি অসীমের মধ্যে ব্যক্ত না হয়, তবেই সেই অচল-রূপেই তার সমাধি হল। মৃত্যু রূপকে ক্ষণে ক্ষণে মুক্তি দেয়। যদি তার জীবন এক জায়গায় থেমে রইল তবে তো তার প্রসারণশীলতা ( Elasticity ) রইল না। ইতিহাসে তাই দেখতে পাই মানুষ যখন প্রথার গণ্ডীতে বদ্ধ হয়ে থাকার দরুণ তার মনের প্রসারণশীলতা চলে গেল তখন আবার একটা নবযুগ তার বাণীকে বহন করে এনে সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিল। অসীমের প্রকাশ ( manifestation ) সীমাতে হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যেই সীমার চরম অবসান নয়—মৃত্যু তার বিশিষ্ট রূপকে ভেঙ্গে দিয়ে তাকে নব নব আকারে পুনরুজ্জীবিত করে। আনন্দ হচ্ছে জীবনের positive দিক, তার negative দিকটার কাজ হচ্ছে সীমার বেড়াকে ভেঙ্গে দিয়ে তার প্রবাহকে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা।

এই নিরবিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতির বোঝাকে যে বইতে হবে, তা নয়। মানুষের জীবনের শৈশবকাল থেকে একটা ঐক্যধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে—

বিস্মৃতির সিংহদ্বার দিয়ে সেই ধারাকে আসতে হয়েছে। আমাদের সচেতন জীবনের মধ্যেও কত বিস্মৃতির ফাঁক আছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ রয়েছে। যে সত্য আমার দেহে আবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তা আজ আমার চেতনার আলোয় বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই আলোরও মেয়াদ ( term ) আছে, এই বেড়ারও অবসান আছে।

এক এক সময়ে ঠেলা আসে, তখন তার ধাক্কায় সব বিদীর্ণ হয়ে যায়। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের অবস্থানও ঠিক এই রকমের। সে যতক্ষণ পরিণতি লাভ করেছে, ততক্ষণ তার বৃদ্ধির সেই সীমাবদ্ধ জায়গাতেই আছে, কিন্তু এই পরিণতির শেষ হলেই তাকে বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে যেতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনেরও এমনি করে adjustment হয়, তার পরিণতির দ্বারকে ভাঙ্গতে হয়—বিশালতর মুক্তিক্ষেত্রের জন্য।

এটা কোনো দার্শনিক speculation এর কথা নয়, এ হচ্ছে poetryর কথা।—সত্যের positive দিক হচ্ছে আনন্দ। কিন্তু তার negatvie দিকও আছে। যদি সেটাকেই বড় করে দেখতুম তবে পদে পদে মৃত্যুর পদচিহ্ন চোখে পড়ত, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জরারই ছায়ার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে, সে চলেছে। যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে সত্যের positive দিকটা। তবে এদুটো দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যখন সীমার রূপের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা ছাড়া অসীমের অন্য গতি নেই তখন তাকে কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলেই বার বার শাশ্বত স্বরূপকে দেখাতে হবে।

( ২ )

ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে আমার বিলাতে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তাঁরও এই মত। আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা চক্র ( cycle ) আছে, সেটাকে যখন সম্পূর্ণ করব তখন স্মৃতির ধারা পূর্ণতা লাভ করবে। এখন আমার মনে নেই আমার পূর্ব্বকার জীবনে কি হয়েছিল, এখন আমার সামনের দিকেই গতি। একটা অধ্যায় যখন পূর্ণ হবে তখন পিছন ও সামনের সঙ্গে আমার যোগ হবে।

"জীবন দেবতা"র group এর কবিতাগুলিতেও এই ব্যাপারটি ঘটেছে। আমার প্রথম কবিতাগুলিতে আমি নিজেই জানি না কি বলতে চেয়েছি। "কে সে জানি নাই তারে" —এই ভাবের মধ্যে দিয়ে grope করতে করতে অজ্ঞাতভাবে আমার কবিতার ভিতর দিয়ে একটা অভিজ্ঞতাকে পেলুম। আমার চক্র সম্পূর্ণ হল, আমার অনুভূতির রেখাটি আবর্ত্তন করে এসে আরেক বিন্দুতে মিল্‌ল,—ঐক্যটি পরিস্ফুট হল, আমি বুঝতে পারলুম।

তেমনি করে জীবনের এক একটা চক্র রেখা ( cycle ) আছে, যখন তা সম্পূর্ণ হবে তখন অনুভূতির ভিতর দিয়ে মর্ম্মগত ( Significant ) সত্যটিকে বুঝতে পারা যাবে। নভেল যখন সবটা শেষ করি তখনই সব অধ্যায়ের সমষ্টিগত উপাখ্যানে ধারাটি পূর্ণ হয়। পিছনে যা ফেলে চললুম, তা দেখবার সময় নেই—আমাকে সামনে চলতে হচ্ছে। চলা যখন শেষ হয়ে চক্র পূর্ণ হল তখন সম্মুখ-পশ্চাৎ মিলিত হল, আমার স্মৃতিগুলি ঐক্য ধারায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হল।

তর্কের দ্বারা এই সত্যের প্রমাণ হয় না, এ ব্যাপার আমাদের instinct এর। যে পাখীর ছানা ( chick ) ডিমের খোলসের মধ্যে আছে, তার কাছে প্রমাণ নেই যে বাইরে একটা জগৎ আছে। তার আবেষ্টনটি বাইরের জগতের সম্পূর্ণ উল্টো, কিন্তু এই বাইরের জগতের প্রমাণ আছে তার instinct এ— তারই প্রেরণায় সে ক্রমাগত খোলসে ঘা দিচ্ছে। তার ভিতরে তাগিদ ( impulse ) আছে, তার বিশ্বাস তাকে বলে দিচ্ছে,—'এখানে স্থিতি, এখানে গতি নয়, কৃত্রিম আশ্রয়কে ভেঙ্গে ফেল।' অথচ খোলসের গণ্ডীর মধ্যে এই মুক্ত জগতের কোনো প্রমাণ নেই।

মানুষের অভিজ্ঞতায়ও তেমনি আমরা দেখতে পাই যে সব ধর্ম্মের Systemএ একটা অকৃতজ্ঞতার ভাব আছে। তা কেবল বলছে যে এই যে যা দেখচ তা শেষ কথা ( absolute ) নয়। সব ধর্ম্মতন্ত্র বলছে যে বিরুদ্ধে যেতে হবে। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বর্ত্তমান আছে যে,

যা দেখছি তার চেয়ে যা অগোচর অপ্রত্যক্ষ তা ঢের বেশী মূল্যবান্। সেই প্রেরণা, বিদ্রোহ আমাদের instinctএ আছে। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এ তো ঠিক কথাই—বিষয়ী লোকেরা এই কথা বলছে কিন্তু মানুষ কিছুতেই মনে করতে পারছে না যে এতেই সব শেষ। সে তর্ক করুক আর যাই করুক তার instinct তার দেওয়ালে এই ধাক্কা মারতে ত্রুটি করছে না; যা প্রত্যক্ষ-গোচর তাকে সে আঘাত করছে, ঠোকর মারছে।

সব মনুষ্যত্বের বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই প্রেরণা (urging) চলে আসচে। যা প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক, যাকে তর্কের দ্বারা বোঝানো যায়—তাকে মানুষ অবিশ্বাস করে এসেছে। বর্ব্বরদের তো এ বিদ্রোহের ভাব নেই, কারণ তাদের জ্ঞানানুশীলন (culture) নেই। যখন আমার বুদ্ধি আমাকে স্থির রাখতে পারল না, এগিয়ে নিয়ে গেল, তখনই সত্যকে পেলুম। যে সত্য আমার গণ্ডীকে অতিক্রম করে বর্ত্তমান আছে তাকে তখন আমি লাভ করলুম। মানুষ যেন জ্ঞান-জগতে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি আমার অধ্যাত্মজগতের যে আবেষ্টন আছে তার মধ্যেকার সত্যকে নেবার জন্য আমার personality তে 'ভূমৈব সুখম্' এই বিশ্বাসের প্রেরণা রয়েছে। আমরা জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে মেনে নিচ্ছি না, তাই ক্রমাগত আবেষ্টনে ঠোকর দিচ্ছি। এই বিশ্বাসের দ্বারা যারা অনুপ্রাণিত 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তারাই অমৃতকে লাভ করে।

(৩)

প্রত্যেক form এর মধ্যে দুটো জিনিষ রয়েছে—খানিকটা তার প্রকাশিত আর বাকিটা তার আচ্ছন্ন। যা আচ্ছন্ন রয়েছে একটা বিরুদ্ধ শক্তি তাকে ঘা না দিলে তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। মৃত্যু প্রকাশের প্রবাহকে ক্রমাগত মুক্তিদান করে চলেছে। মৃত্যুতে form এর কোন বিনাশ হয় না, তার renewal বা নূতন নূতন প্রকাশ হয়।

---

# চিঠি

কল্যাণিয়েষু

পৃথিবীতে একদল লোক আছে যারা কাজ করে আর একদল লোক আছে যারা খেলা করে। তোমরা মনে করো না যে একদলেরই দরকার আছে অন্যদলের নেই, বা প্রথম দল শ্রেষ্ঠ এবং শেষের দল নিকৃষ্ট।

পৃথিবীতে ডাঙা জমি আছে সেখানে চাষ বাস বাণিজ্য ব্যবসা যুদ্ধ বিগ্রহ চলে—পৃথিবীতে সমুদ্র আছে, সেখানে কেবলই ঢেউ খেলচে আর কলধ্বনি উঠচে। যারা সমজদার লোক তারা জানে অকর্ম্মণ্য সমুদ্রের খেলার সঙ্গে আর ব্যস্ত-বাগীশ ডাঙার কাজের গভীরতর যোগ আছে। বৃষ্টি জিনিষটা ছেলেখেলা বই কি, উনপঞ্চাশ বায়ু তার বাহন—তার না আছে হাল লাঙল গোরু মহিষ, না আছে ঠিক ঠিকানা, না আছে অধ্যবসায়,—আর ফসল ফলা ব্যাপারটা, যাকে আমাদের সাময়িক পত্রের সমালোচকেরা বলেন, "সারবান," —কিন্তু,—আর অধিক বলবার দরকার নেই।

আমার শেষ পত্রে তোমাকে আভাস দিয়েছিলুম যে আমি হচ্চি জগতের খেলাঘরের মানুষ। শুনে তোমার মনে হল আমি বুঝি স্বাভাবিক বিনয় গুণে নিজেকে খাটো করে দেখলুম। তাই তুমি প্রমাণ করতে বসেচ যে আমি এত তুচ্ছ নই, বিধাতা আমাকে তাঁর খেলা ঘরে না—প্রত্যুত কাজের ক্ষেত্রেই পাঠিয়েচেন। তোমার মুখ থেকে এমন কথা শুনে মনে দুঃখ হল। তুমি ত জান আমি বিশ্বজনের সাম্নে আমার অন্তর্যামিনীকে বলেচি "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" কথাটা বিশ্বাসই করলে না! কিম্বা হয়ত ঠাওরেচ, দেবী আমার আবেদন নামঞ্জুর করে দিয়েচেন—অতএব আমাকে দেশ উদ্ধার করতেই হবে—এই শেষ বয়সে চরখা এবং খদ্দর প্রচার করে আমার জীবলীলা সমাধা হবে! বাল্যকাল থেকেই আমার আত্মীয় স্বজন আমার হিতৈষীবর্গ আমার আশা ছেড়ে দিয়েচেন—তুমি কে হে—

হঠাৎ আমার উপরে তোমার এমন শ্রদ্ধা কি করে হল! হয় ত কোন্ দিন বলে বসবে যে, দৈনিক সাপ্তাহিকের সাব-এডিটরী করতে পারি এত বড় যোগ্যতাও আমার আছে!

তুমি এক সাক্ষী খাড়া করেচ বিশ্বভারতী। হায়রে, তুমি কবি হয়েও ওর স্বরূপটা বুঝতে পারলে না! ওটা কি কাজ? ওটা আমার কাজ কাজ খেলা। সেই জন্যেই ত আমাদের দেশের প্রবীন কাজের লোকে কেউ ওকে গ্রাহ্যই করলে না। ওটা যে উনপঞ্চাশ বায়ুরই কীর্ত্তি বিশেষ সেটা গৌড়জনের কাছে ধরা পড়ে গেচে। ফাঁকি দিয়ে কলঙ্ক-ভঞ্জন সকলের ভাগ্যে হয় না। শুধু গৌড়জন কেন, সেদিন দুজন গুজরাটি আশ্রমে তাদের ছেলে দেবে বলে, এসেছিল—জিজ্ঞাসা করলে এখানে চরকা কয় ঘণ্টা চলে—শুনলে চলে না। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলে এখানকার সমস্ত জিনিষটাই ফাঁকা কবিত্ব,—অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চলে গেল। আমার একটা এই সান্ত্বনা রইল মনে যে, আর যাই হোক পরিচয়টা পেয়ে গেল—বুঝলে, ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই। ভারাকর্ষণের একটা নিয়ম আছে, সে হচ্চে, পদার্থই পদার্থকে আকর্ষণ করে। আমার কারবার যত অপদার্থকে নিয়ে তাতে খেলা জমে ভাল—কেবল মুস্কিল; সপদার্থক এসে কৈফিয়ত তলব করে—তখন বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। সপদার্থরা পদার্থতত্ত্বই বোঝে, তারা নিরর্থতত্ত্ব বোঝে না—এই জন্যে সেটাকে তারা অনর্থ বলেই ঠাওরায়। তারা বলে, দেশে আগুন লেগেচে, তোমার বালতি কোথায়? আমি অকিঞ্চন তার জবাবে মাথা চুলকিয়ে বলি, আমার বালতি নেই, কেবল ফুঁ আছে। শুনে তারা বোঝে আমি দলের লোক নই। কিন্তু সে কথা বুঝে তাদের মন শান্ত হয় না। কারণ যারা দল-চর জীব, দলে না থাকাটাকেই তারা অপরাধ বলে গণ্য করে। এ জন্মে সে অপরাধের ক্ষালন আমার দ্বারা হবে না। সে জন্য দায়ী আমার লগ্নাধিপতি—তিনি রাতের আকাশে স্বপ্ন সমুদ্রে সন্তরণ করে বেড়ান—আমরা পরীক্ষা দিতেও পারলুম না, আর সাব-এডিটারী করবার মত বুদ্ধিও ঘটে জোগাল না। শেষ বয়সে বিশ্বভারতী নাম দিয়ে একটা মস্ত খেলা ধরেচি। যাবার বেলায় হয়ত ও পুঁতুলটাকেও ভেঙে দিয়ে যেতে হবে—এমন অনেক পুতুলকেত ভেঙেচি। "সাধনা" নামক এক কাগজের খেলনা ছিল—সেটা ভেসে গেল কেন? যেহেতু ওটা অপদার্থের লীলা। অতএব তোমরা আমার কাছ থেকে এমন কিছুই প্রত্যাশা কোরোনা যাতে কাজের সুবিধা হতে পারবে। কারণ আমার দরবারের অধিষ্ঠাত্রী আমাকে কাজে পাঠাতে চান না—কাছে রাখতেই চান। ইতি ১৬ই বৈশাখ ১৩২৯।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

## পুরাতন চিঠি।

আমি এই খোলা নদীতে নির্জ্জন চরের মধ্যে এসে ভারি আরাম বোধ করচি! বেশ বুঝতে পারচি একজন আছেন যিনি আমাদের সমুদয় বেসুরোকেই ধীরে ধীরে সুরে বেঁধে তুলছেন—জীবনের বীণাটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিলেই হল, আর কিছু নয়। নিজে ওটাকে নিয়ে দুরন্ত ছেলের মত নাড়াচাড়া করতে গেলেই সমস্ত গোলমাল করে ফেলি। আর তাঁর হাতে একেবারে তুলে দিতে পারলে কি আরাম! আজ আমার মনে হচ্চে সমস্ত জল-স্থল-আকাশ যেন আমার ভার নিয়েছে—সূর্য্যালোকিত দিনগুলির প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন অতি নিঃশব্দে আমার শুশ্রূষা করচে। এই আমার ঘর, আমার আপন ঘর, সুনীল সুন্দর সমুজ্জল সহাস্য শান্তি, এই যে উদার বিস্তার, এই যে অবাধ আকাশ, এই যে আপনাকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে দিয়ে সম্পূর্ণ মেলে দেবার উদার প্রাঙ্গন। এমনি করে আপনাকে প্রতিদিন বাইরে মেলে দিতে পারলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রন্থিগুলো খুলে আসতে থাকে—আর আপনার মধ্যে সমস্ত জড়িয়ে মড়িয়ে রাখতে গেলেই কেবল জটার উপরে

জটা পড়ে যেতে থাকে—মনে হয় মৃত্যু এসে তার খাঁড়া দিয়ে ছিন্ন করে না দিলে শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থি যেন কিছুতেই সরল হবে না। কিন্তু সরলরাস্তা সহজ উপায় একেবারেই হাতের কাছে পড়ে রয়েছে। ইতি ১৮ই কার্ত্তিক ১৩২৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# আশ্রম-সংবাদ

গুরুদেব ও মিঃ এণ্ড্রুস শীঘ্রই আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছেন। গুরুদেব নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে বম্বে আসিয়াছেন। তাঁহার ২৬শে নভেম্বর পার্শী সমাজে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। বম্বের বাঙালীরা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য 'গোড়ায় গলদ' নাটকটি অভিনয় করিবার আয়োজন করিতেছেন। পর্য্যটন কালে তাঁহার অনেক লোকের সঙ্গেই বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হইয়াছে। তাঁহারা কেহ কেহ শীঘ্রই আশ্রমে আসিবেন।

Mr. De Fonseka কলম্বো হইতে সস্ত্রীক ডিসেম্বর মাসে আশ্রমে কিছুদিন বাস করিবার জন্য আসিতেছেন। ইনি অক্সফোর্ড য়ুনিভারসিটির গ্রাজুয়েট ইঁহার রচিত "Decorative art" নামক গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য।

সিংহল হইতে Mr. W. A. De Silva ও ডিসেম্বর মাসে সস্ত্রীক আশ্রমে আসিবেন। ইঁহাদের বাটীতেই গুরুদেব এবার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ইনি সিংহলের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একজন নেতা।

ত্রিবাঙ্কুর হইতে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপত শাস্ত্রী মহাশয় আগামী মার্চ্চমাসে আশ্রমে কিছুকাল থাকিবার জন্য আসিতেছেন। ত্রিবাঙ্কুর হইতে ইনি 'Trevendrum Sanskrit Series' সম্পাদন করিয়াছেন, সেই গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনি ভাসের লুপ্ত নাটক উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আমাদের বিশেষ আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় বিশ্বভারতীতে পুনরায় একজন ওস্তাদ বীণকার তামিল, ত্রিবাঙ্কুর হইতে আসিতেছেন। বেহালা ও বীণা বাদনে ইঁহার বেশ দক্ষতা আছে। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ বুৎপন্ন।

সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কলিন্‌স কিছুদিন হইল আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি দুই তিন মাস এখানে থাকিয়া বিশ্বভারতীর কাজের সহায়তা করিবেন। ইনি ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত। গত ২৪শে নভেম্বর অধ্যাপক কলিন্স কলাভবনে ভষাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তাঁহার এ বিষয়ে আরো কয়েকটি বক্তৃতা দিবার কথা আছে। প্রথম দিনের বক্তৃতায় ভাষাতত্ত্বের মূল তথ্যগুলির তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভূতত্ত্বে যেমন পৃথিবীর সৃষ্টি-কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মতবাদ আছে, ভাষার সৃষ্টির মধ্যেও সেইরূপ স্তরের পর স্তর আছে। তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষা হইতে উদাহরণ দিয়া বক্তৃতাটিকে সরস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে ধার করা, যেমন, পুষ্প, পূজা, চম্পক, গঙ্গা, অম্বা ত্র্যম্বক ইত্যাদি। দ্রাবিড় ভাষায় ফুল অর্থে পুষ্প শব্দ আছে, তাহা হইতেই তিনি পুষ্প শব্দটির উদ্ভবের সম্ভাবনা বলিয়া মনে করেন।

গত ১৮ই নভেম্বর কলিকাতা বিশ্বভারতী সম্মিলনীর আফিসগৃহে সংসদের একটি অধিবেশন হইয়াছিল ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিশ্বভারতী হইতে অতঃপর এদেশের এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে যোগদান করিতে পারিবে, এই সভায় ইহা স্থির হইয়াছে। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আগামী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারিবে অন্যত্র গিয়া তাহাদের ইহার জন্য টেষ্ট পরীক্ষা দিতে হইবে না।

বিশ্বভারতীর ছাত্রীনিবাসে রাজপুতদেশীয়া একটি ছাত্রী আসিয়াছেন। মহিলা ছাত্রীরা এবার শিশুদের বিশেষভাবে যত্ন লইতেছেন। তাঁহাদের জিনিষপত্র মেলানো, গল্প বলা সমস্ত কাজই তাঁহারা খুব উৎসাহ সহকারে করিতেছেন। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার রাত্রে রন্ধনশালার রান্নার সমস্ত কাজের ভার তাঁহারা লইয়াছেন।

বিশ্বভারতীর পূর্ব্ববিভাগের ছাত্রেরা গত অমাবস্যার আশ্রম-সম্মিলনীতে উত্তর-বঙ্গের প্লাবনের সাহায্যার্থ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবার আলোচনা করে। তাহারা নানারূপ ম্যাজিক অভিনয় করিয়া ইতিমধ্যেই কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে আরও নানা উপায়ে তাহার চেষ্টা চলিতেছে। ছুটীর পূর্ব্বে কিছু অর্থ এবং বস্ত্র এখান হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে।

৭ই পৌষ আগত প্রায়। এই সময় শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। এবার ৭ই, ৮ই পৌষ দুইদিনই যাহাতে মেলা বসে এবং মেলায় নানা বিভাগের প্রদর্শনী খোলা হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। আগামী ৯ই পৌষ বিশ্বভারতীর সংস্থিতিপত্র অনুযায়ী বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম সভার অধিবেশন হইবে। উৎসবের সময়ে প্রায়শ্চিত্ত অভিনয়ের কথা চলিতেছে।

বিশ্বভারতী সম্মিলনী ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে কিছু-দিন পূর্ব্বে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন এম, এ মহাশয় মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সেবার আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতায় হেমন্তঋতুর উৎসব উপলক্ষে সঙ্গীতাদির আয়োজন হইয়াছিল।

আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় পুনরায় বিশ্বভারতীর কার্য্যে আসিয়া যোগ দিতেছেন। তিনি কিছুদিনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে এখানকার কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত না থাকিলেও, তাঁহাকে আমরা আমাদের মধ্যে নানাভাবে পাইয়াছি।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মিঃ মরিস শীঘ্রই গুরুদেবের সঙ্গে আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি বিশ্বভারতীরই প্রচার কল্পে এই কয়েকমাস আশ্রম হইতে দূরে বোম্বাতে ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ ও চেষ্টার ফলে বিশ্বভারতীর আজীবন সভারূপে আমরা বম্বে হইতে কয়েকজনকে পাইয়াছি। আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (জ্যোতিশের ভাই) বম্বে থাকিয়া স্থপতিবিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়াছেন। মরিস সাহেবের এই চেষ্টায় তিনিও যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন।

বিশ্বভারতীর লাইব্রেরীর ক্রমশই প্রসার হইতেছে। পুরাতন গৃহের পূর্ব্বে, উত্তরে ও পশ্চিমে নূতন ঘর বাড়ানো হইয়াছে। ছাত্র ও অধ্যাপকদের অধ্যয়নের সুব্যবস্থা ও স্থান এখন অনেক বাড়িয়াছে। দ্বিতল-গৃহ নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আশ্রমের শিল্পিগণ লাইব্রেরীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

পুস্তকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা জার্ম্মাণী হইতে পুস্তক আসিবার সংবাদ দিয়াছিলাম। সেই পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ১২০০। ইহার মধ্যে ভারতীয় সাহিত্য ধর্ম্মও দর্শন সম্বন্ধে শিল্পকলা ও জার্ম্মান সাহিত্য সম্বন্ধে পুস্তকই বেশী।

ফরাসীদেশ হইতে পুনরায় তিন বাক্স পুস্তক আসিয়াছে। ইহার মধ্যে ফরাসী ইতিহাস, এসিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের ইতিহাস ও ফরাসী সাহিত্যের পুস্তকই অধিক। জৈন সমাজ নিয়মিত তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদি আমাদের উপহার দিয়া কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান পুস্তকের সংখ্যা ১৫০০০ এর উপর। এতদ্ব্যতীত বাঁধাই ও অবাঁধাই পত্রিকার সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। সাধারণ পাঠাগারে বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি, উর্দ্দু, তামিল, তেলেগু, কানাটী মালয়ালাম সিংহলী, ইংরাজী

আমেরিকান, ফরাসী জার্ম্মান ভাষার নানাবিধ মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা আমরা নিয়মিত পাইয়া থাকি।

এই পত্রিকার পাঠক ও পাঠিকাগণের নিকট আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য সচেষ্ট হন। আমাদের বিশ্বাস এই গ্রন্থগারের মতো এমন বিচিত্র ভারতীয় ভাষার পুস্তক ও পত্রিকার সংগ্রহ ভারতের আর কোথাও একত্র পাওয়া যাইবে না।

বিশ্বভারতীর কৃষি-বিভাগের পল্লী-সেবা বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ এখন সুরুলে সপরিবারে বাস করিতেছেন।

আমেরিকা হইতে আগত মিস গ্রেচেন গ্রীণের তত্ত্বাবধানে সুরুলের হাঁসপাতালের কাজ সুচারুরূপে চলিতেছে—গত পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তিনি এক হাজারেরও অধিক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন। ইহাদের অনেককে পথ্যাদিও দেওয়া হইয়াছে। পল্লীসেবার এই বিভাগের জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা ইহার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার চেষ্টা করুন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা সভা গড়িয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে।

কৃষিবিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর গুহ মহাশয়ও এখন সুরুলে সপরিবারে বাস করিতেছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ইনকিউবিটার যন্ত্রদ্বারা ডিম হইতে মুরগীর বাচ্চা ফুটান হইতেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের তত্ত্বাবধানে কৃষিবিভাগের গোশালায় কলিকাতা থুব হইতে ভাল জাতের কয়েকটি মুলতানী এবং হানসী গাভী আনা হইয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই কৃষিবিভাগের গোশালার দুগ্ধ দ্বারাই বিদ্যালয়ের দুগ্ধের অভাব মিটিবে এলাহাবাদ হইতে দুইটি ভাল ছাগলও আনা হইয়াছে।

কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন নূতন অসুবিধা ও অভাব প্রতিদিনই কিছু না কিছু দেখা গেলেও কৃষিবিভাগের ছাত্র ও অধ্যাপকদের পরস্পরের মধ্যে এক পরিবারের ভাব ক্রমশ প্রগাঢ় হইতেছে। ছাত্রেরা নূতন ঔষধালয়, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে নৈশ-বিদ্যালয়, সাঁওতালদের বাগান প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য নিজেরা একটি কমিটি গঠন করিয়াছে। ক্রমশই সব দিক দিয়া তাহারা কর্ম্মঠ হইয়া উঠিতেছে।

## বৈদেশিক সংবাদ

শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী যে আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আদর্শ লইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রতিষ্ঠান হইতেছে। জাতিবর্ণের উপরে সমস্ত মানবজাতির যে একই মানব-ধর্ম্ম সেই সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার দিকেই বর্ত্তমান যুগের সমস্ত চেষ্টার প্রবাহ গূঢ়ভাবে, মগ্নচৈতন্যের মধ্যে কাজ করিতেছে।

ডেনমার্কের Helsingor নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে একটি কৃষি আয়তনের নিকটে ইউরোপের যুদ্ধের পরই সর্ব্ব মানবজাতির মিলনের জন্য একটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। নানাদেশের তরুণ তরুণীরা যাহাতে মিলিত হইয়া সংসারক্ষেত্রে শ্রমিকদের আন্দোলন (labour movement) সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি সর্ব্বমানবের নানা হিতকর অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইতে পারে, তাহাই এই কলেজ স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

League of nations দ্বারা জাতিতে জাতিতে মিলনের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যথার্থ প্রাণে প্রাণে মিলিতে পারে এই সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রে।

১৯২১ খৃঃ অব্দে ১লা অক্টোবর মাত্র ২৪টি ছাত্র লইয়া এই কলেজের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইজন আমেরিকান, একজন অষ্ট্রীয়ান, নয়জন ডেনমার্ক দেশীয়, তিন জন ইংরেজ, একজন আইরিস, একজন স্কচ, পাঁচজন জার্ম্মাণ, দুইজন চেকোশ্লভেকিয়াদেশীয় ছাত্র।

এই একবৎসরের মধ্যেই ছাত্রেরা জাতিগত পার্থক্যের উপরেও তাহাদের মধ্যে যে একটি বৃহৎ মিলনের ক্ষেত্র আছে

সেকথা বুঝিতে পারিয়াছে। আশা করা যায়, যে তাহাদের এই হৃদয়ের যোগ ভবিষ্যৎ জীবনেও বর্ত্তিয়া থাকিবে।

এখানকার প্রত্যেক ছাত্রকেই দিনে তিন ঘণ্টা বাগানে বা ক্ষেতে চাষের কাজ করিতে হয়—ছাত্রদের পরস্পরের মিলনের পক্ষে এই অনুষ্ঠানটিই সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক হইয়াছে।

ডেনমার্কের মধ্যে Elsinoke এর দৃশ্য খুব চমৎকার। কলেজটি কোপেনহাগেনের নিকটেই সুতরাং সেখানকার বিখ্যাত অধ্যাপকরা সময়ে সময়ে আসিয়া কলেজে বক্তৃতা দিয়া যান।

কলেজের কাছেই কৃষিক্ষেত্রটি থাকায় ছাত্রেরা ডেনমার্কের কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় এবং তা ছাড়া কলেজের আহার্য্য এবং অধ্যাপনার ব্যয়েরও অনেক সুবিধা হয়।

এই কলেজে ইতিহাস, সাহিত্য, আধুনিক বিভিন্ন ভাষা, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব্যবস্থা আছে। আগামী বৎসরে বিশেষভাবে ভূগোল ইতিহাস এবং নানাজাতির বর্ত্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে কলেজে আলোচনা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে 'The Danish Folk High Schools,' 'The Danish Co-operative movement' এবং 'International co-operation in Intellectual work. প্রভৃতি বিষয়েও বক্তৃতা হইবে। সর্ব্বমানবজাতির ঐক্যের আদর্শ লইয়াই কলেজে আধুনিক রাজনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যগত, এবং ধর্ম্মজাগতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, এবং আমেরিকাতে তিনটি কমিটি আছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের ইচ্ছা যে পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় দেশেই এই বিদ্যালয়ের এক একটি করিয়া কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলে Secretary, British committee 39, tavistock street, Nelson, Lancshire এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হয়।

---

# শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ | পৌষ, সন ১৩২৯ সাল। | ১২শ সংখ্যা

## ৭ই পৌষ ১৩২৯

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে,
পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখ মোরে তব কাজে,
নবীন কর এ জীবনে হে।
খুলি মোর গৃহদ্বার
ডাক তোমারি ভবনে হে।

---

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠ্‌ল বেজে যেই
নীড়-বিরাগী হৃদয় আমার উধাও হল সেই।
নীল অতলের কোথা থেকে
উদাস তারে করল যে কে
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক ঠিকানা নেই।
"সুপ্তিশয়ন আয় ছেড়ে আয়"
জাগে যে তার ভাষা।
সে বলে "চল্ আছে যেথায়
সাগর পারের বাসা।"
দেশ বিদেশের সকল ধারা
সেইখানে হয় বাঁধন হারা
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতি সমুদ্রেই।

---

উদ্বোধন।—

সুর যেমন সুরকে খোঁজে, আলোকের চরণধ্বনি যখন আকাশে বেজে ওঠে তখন সেই ধ্বনি তেমনি আমাদের অন্তরের আলোক-স্পন্দনের প্রত্যাশা করে।

সংসারের কাজে প্রতিদিন যে পরিমাণে চৈতন্যের আলো-টুকু জ্বালাই সে ছোট্ট আলো। তারই পরিধির অন্তর্ভূত ছোট্ট জগতে বড় সত্যের মূর্ত্তি দেখতে পাই নে; তাকে দেখবার কোনও আয়োজনও করি নে। আমাদের সঙ্কীর্ণ চৈতন্যের আলো যেখানে পৌঁছয় না সেইখানে তাকে রেখে দিই, নিজের ছোটোখাটো সুখদুঃখের সংসারের উপরই সব আলো সংহত করি। এমনি করে বড় সত্যের মধ্যেই যে আমাদের প্রকৃত আশ্রয় সেই বিশ্বাস ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে যায়। বড়কে ছোট করার ফলে ছোটই বড় হয়ে উঠে' আমাদের উপর অত্যাচার করতে থাকে; ছোট ছোট চিন্তা দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়, ছোট ছোট সম্বন্ধ-বন্ধন শৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

আমাদের চৈতন্যের সব আলো জ্বালি না, তাই আলো সকালে এসে আমাদের অন্তরাকাশে তার সাক্ষীকে খুঁজে পায় না; সে যে কত বড় বিরহ দুঃখ তা জানিও না। প্রতিদিন তাই জঞ্জাল জমে উঠতে থাকে। বৎসরের অন্তত এই একটি দিন—এই উৎসবের দিনে, কি আলো জ্বলবে না?

প্রতিদিনের কাজ সঙ্কীর্ণ আত্মীয়তার মণ্ডলীর মধ্যে। সেখানে আমাদের ঘরের কোণের প্রদীপই যথেষ্ট। কিন্তু যাকে আমরা শুভকর্ম্ম বলি, যে-শুভকর্ম্মের যোগে উৎসব হয়, সেই কর্ম্মের দ্বারা সকলের সঙ্গে আমরা আমাদের সম্বন্ধ স্বীকার করি,—সেই সম্বন্ধবোধই কল্যাণ। এই শুভকর্ম্মের উৎসবে প্রদীপ শিখার কার্পণ্য ত চলে না, সেদিন আমাদের সকল আলো জ্বালিয়ে তুলতে হয়।

আমরা যে-সংসারটিকে নিয়ে থাকি তার সঙ্কীর্ণ পরিধিটুকুর পরিচয় ও ব্যবহারের জন্যে আত্মার সমস্ত আলোর দরকার হয় না। সেই দাবীর অভাববশত সমস্ত আলো জ্বলেও না, সেই আলোর অভাববশত আত্মা নিজের কাছে নিজে দীপ্যমান হয়ে ওঠে না। কিন্তু সংসারের অতীত নিত্যআশ্রয় একটি আমাদের আছে। সেই হচ্চে অমৃতলোক, সেই হচ্ছে অধ্যাত্ম লোক। সেই লোকের মধ্যে নিজের অধিকারকে উপলব্ধি করতে হলে চৈতন্যের পূর্ণ নির্ম্মল দীপ্তির দরকার হয়। সেই অমৃতলোকের ক্ষেত্রে আজ আমাদের উৎসব। অতএব সেখানে সংসারের দীপটুকু নিয়ে চল্‌বে না। আজ জ্বলুক আমাদের অন্তরাত্মার সমস্ত আলো। আজ বাইরের থেকে যে আলোক-দূত এসেচে তার সঙ্গে আমাদের অন্তরলোকের আলোকের মিলন হোক্।

ঋষি বলেছিলেন, দেখেছি এঁকে, তমসঃ পরস্তাৎ—অন্ধকারের পরপার থেকে। তাঁর চিত্তে সব আলো সে দিন উদ্ভাসিত হয়েছিল, চৈতন্যের সব দীপ্তি। তাই বাঁধা তার আপন সুরের তারকে যেমন বুঝে নেয় তাঁর অন্তরের আলো চিরন্তন আলোককে তেমনি করেই পেয়েছিল।

আজ এই যে পাখী ডাকছে, ফুল ফুটছে আনন্দের উৎস উৎসারিত হচ্ছে, এর ভিতরকার সত্যটি কোথায়? যিনি বলেছিলেন "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং" যিনি জেনেছিলেন, তাঁর চোখে এই প্রাণ এই গান এই আলো একদা অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আমাদের ধ্যানের মন্ত্র হচ্চে, ওঁভূর্ভুর্বঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। বাহিরের আলোকে দীপ্যমান এই বিশ্বজগৎকে চৈতন্যের আলোকের দ্বারা চৈতন্যের উৎসস্বরূপের সঙ্গে যুক্ত করে উপলব্ধি করবার এই ধ্যানমন্ত্র। বাহিরে তাঁর যে-তেজ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র-রূপে প্রকাশিত, আমাদের অন্তরে তাঁর সেই তেজই চৈতন্য-রূপে প্রতিভাত। বাহিরের বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অন্তরের চৈতন্যের মিলনকে যখন ধ্যানের দ্বারা পরমসত্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা এই বিশ্বলোকের মধ্যেই অমৃত-লোককে পাই। এই অমৃতলোকের পরিচয় পাওয়া, অন্তরে বাহিরে এই পরমসত্যকে স্বীকার করে' মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করা, এই জন্যেই আমাদের এই উৎসব। এই উৎসব আজ সার্থক হোক্।

গান

আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাইরে দাঁড়া!
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরাণ দিক না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া!
বোস্‌না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন ল'য়ে
অরুণ আলোর স্বর্ণ-রেণু—
মাখা হ'য়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া;
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া!

এই আশ্রমের যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ তাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিক দিন।

দীক্ষা বল্‌তে কি বুঝি? মানুষ অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে পৃথিবীকে ভোগ করবে বলে জন্মেছে। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় মর্ত্যপ্রাণের নানা আকাঙ্ক্ষা সে মেটাতে থাকে, দৈহিক মানসিক নানাবিধ খাদ্য সে সংগ্রহ করে। কিন্তু এতেও শেষ হলনা, এই আকাঙ্ক্ষার উপরেও আর এক মহৎ আকাঙ্ক্ষা তা'র আছে। এমন কি, সে বলে, অন্য আকাঙ্ক্ষাটির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি চাই। এই তার এক-আপন থেকে আর-এক আপনের মুক্তি। তার ছোট থেকে তার বড়র মুক্তি। এ মুক্তি তার আত্মঘাত নয়, তার আত্মপ্রকাশ—যেমন মুক্তি বীজের বদ্ধতা থেকে অঙ্কুরের উদ্ভিন্নতা—তাতে বীজের ধ্বংস নয় তাতেই বীজের উদ্ধার, কারণ এই অঙ্কুরেই তার সত্যের বিকাশ।

মানুষের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সকল ক্ষেত্রেই কাজ করছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখি অন্যান্য জীবজন্তুর মত জীবন-যাত্রার উপযোগী অভিজ্ঞতাটুকু নিয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে না; জ্ঞানের যে ছোট বেড়া তার থেকে আপন জিজ্ঞাসাকে সে মুক্তি দিতে চেয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে উত্তর মেরুর তুষারক্ষেত্রে আফ্রিকার পথহীন অরণ্যে—গ্রহনক্ষত্রের সুদূর সীমান্তে অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানের মধ্যে তার সন্ধান ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইন্দ্রিয়বোধের সহজ বেষ্টনীটুকুর মধ্যে জ্ঞানবুভুক্ষু চিত্তকে কেউ ধরে রাখতে পারলে না।

মানুষের মধ্যে যেমন এই জ্ঞানের মুক্তির প্রেরণা তেমনি প্রেরণা কর্ম্মের মুক্তির। যে-কর্ম্ম নিজের ছোট স্বার্থের বেড়ার মধ্যেই বদ্ধ সেই কর্ম্মের মধ্যেই ত মানুষের পরিতৃপ্তি হল না। ভোগের কর্ম্ম জীবমাত্রেরই, ত্যাগের কর্ম্ম মানুষের। ভোগের যে অনুষ্ঠান যে আয়োজন তাতে ক্ষয় লেগে আছে। তাতে যা ব্যয় হয় তা নষ্ট হয়, এই জন্যেই ভোগের ক্ষেত্রে জন্তুতে জন্তুতে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই। এই কাড়াকাড়ি মারামারির চেষ্টাকেই মানুষ আপন জীবনের একমাত্র নিত্য চেষ্টা বলে' স্থির করে' বসে' নেই। তার যে-কর্ম্মে আত্মত্যাগের চেষ্টা প্রকাশ পায় সেই কর্ম্মই তার মুক্ত কর্ম্ম। সেখানে সে যে-ফললাভ করে সে ফল তার অন্তরে: টাকাকড়ির মত সে-ফল নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে না। মানবদের মধ্যে যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা নিজের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাই প্রকাশ করেচেন যে, ভোগের জগতেই বন্ধন, ত্যাগের জগতেই মুক্তি।

প্রাকৃতিক শক্তির তাড়নায় আমরা জীব-লোকের বাসনা-রাজ্যে ঘুরে বেড়াই কিন্তু অমৃতলোকের অধিকার পাবার জন্যে আমরা দীক্ষা গ্রহণ করি। প্রাকৃতিক শক্তি আমাদের যে-বাসনা উদ্রেক করে তাকে আমরা বলি প্রবৃত্তি, তার মধ্যে আত্মকর্ত্তৃত্ব নেই। কিন্তু দীক্ষা হচ্চে সেই ইচ্ছাকে স্বীকার করা যা আত্মার। তার মধ্যে তাড়না নেই, আছে সাধনা।

একদা প্রিয়জনের মৃত্যুঘটনায় মহর্ষির মনে দীক্ষার প্রথম উদ্বোধন জাগে। প্রেম মৃত্যুকে স্বীকার করতে চায় না, সে নিজের মধ্যেই অমৃতলোকের সাক্ষ্য পায়। প্রেম কোনো না-পদার্থকে মানে না—তার নিজের অস্তিত্বই পূর্ণতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য প্রেম যখন মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়ায় তখন তার সম্মুখে মৃত্যুই অমৃতলোকের বার্ত্তা বহন করে, সে বলে "না-পদার্থ কোথাও নেই, সমস্তই পরিপূর্ণতার মধ্যে।" এই কথাই ঋষির বাণী অবলম্বন করে' দীক্ষামন্ত্ররূপে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ।" এই দীক্ষাবাণী নিয়ে বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখ্‌তে পাওয়াই ত অমৃতলোককে উপলব্ধি করা। এই পূর্ণতার উপলব্ধি দ্বারাই মানুষ ত্যাগের সাধনা গ্রহণ করতে পারে। সেইজন্যে যে-মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিপূর্ণতার কথা আছে সেই মন্ত্রেরই দ্বিতীয় অংশে আছে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিৎধনং।" অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপকে যিনি জেনেচেন, তাঁর আনন্দ ভোগের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারা। পূর্ণই যে সত্য, একথা ত্যাগের দ্বারাই আমরা বুঝি। এই বুঝেই আমাদের মুক্তি। ঐ মন্ত্রে আছে, "মা গৃধঃ", লোভ কোরোনা। কেননা, লোভ যে বন্ধন।

এই বন্ধন থেকেই যত যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি। সকল পাপের মূলে এই লোভ। লোভ অসীমকে অস্বীকার করে, সঙ্কীর্ণের মধ্যেই আত্মাকে বদ্ধ করতে চায়।

প্রবৃত্তির রাজ্যে আমরা যাকে সমৃদ্ধি বলি সে হচ্চে সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের দ্বারা বস্তুকে বহুগুণিত করা, উপকরণের প্রসার সাধন। দীক্ষায় আমাদের যে রাজ্যের পথনির্দ্দেশ করে সেখানকার সমৃদ্ধি হচ্চে ত্যাগের দ্বারা আত্মার প্রসার সাধন। সেখানে বাহিরে বস্তুর মধ্যে আপনাকে অবরুদ্ধ করা নয়, ভূমার মধ্যে আত্মাকে মুক্তিদান করা।

মহর্ষির এই মুক্তির দীক্ষা ভিতরে ভিতরে আমাদের আশ্রমে কাজ করেচে। সেই দীক্ষা আমাদের সাধনক্ষেত্রের সীমা ক্রমশই বাড়িয়ে আজ আমাদের মহামানবের দ্বারে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েচে। অন্য জীবজন্তুর জন্মগত সম্বন্ধ তার মা বাপের সঙ্গেই। কোনো কোনো জন্তুর সমাজবন্ধন আছে কিন্তু সে-সকল সমাজ সঙ্কীর্ণ। মানুষের জন্মগত সম্বন্ধ সমস্ত মানবলোকের সঙ্গে—সেই মানবলোক দেশে কালে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষ জন্মমাত্রই সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের তপস্যার অধিকারী হয়। সকল মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের এই বিরাট সম্বন্ধ আছে বলেই মানুষ এত বড়। কারণ এই ঐক্য সম্বন্ধই মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে সত্য। এই সম্বন্ধ যেখানেই পীড়িত, খণ্ডিত, সেইখানেই মনুষ্যত্বের খর্ব্বতা। এই জন্যেই কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক দিকে নয় সাংসারিক দিকেও পরস্পরের যোগেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। সেই সার্থকতা লাভ কেবলমাত্র সুবিধাকে লাভ নয় সত্যকে লাভ। সেই লাভেই আমাদের ধর্ম্ম আমাদের শান্তি আমাদের আনন্দ। মানুষ যখন নিজের ব্যক্তিগত সত্তাকে বড় করে পরিবারের মধ্যে নিজেকে সত্য বলে উপলব্ধি করে তখন সে যে কেবল কতকগুলি পারিবারিক সুবিধা লাভ করে তা নয়, মানবসম্বন্ধের বিস্তারজনিত আনন্দ লাভ করে। এই জন্যই এই সম্বন্ধের কাছে সে আপনার ব্যক্তিগত সুবিধা ও স্বার্থকে বিসর্জ্জন করতেও প্রস্তুত হয়। মানুষ যেখানে আপনার দেশের লোকের মধ্যে আপনাকে সত্য বলে উপলব্ধি করে সেখানেও এই কথা খাটে—এমন কি, সেখানে আপন পারিবারিক সুবিধা ও স্বার্থকেও বিসর্জ্জন করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের সীমা কি এইখানেই? মানুষে মানুষে ভেদ, যে বুদ্ধিতে বড় নাম ধরে' ধর্ম্মের স্থান অধিকার করতে উদ্যত হয়েচে সেই বুদ্ধি মানুষের সত্যকে আচ্ছন্ন করচে। সত্যের এই অপলাপেই পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি, এই ভেদবুদ্ধির উগ্রতাই মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে পরাস্ত করে। যুদ্ধের অবসানে আজ য়ুরোপে যে নিদারুণ হিংস্রতা, নির্লজ্জ মিথ্যাচার, ক্রোধ ও লোভের যে বীভৎস মূর্ত্তি দেখা দিয়েচে, যা বিনাশের পন্থায় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্চে তার কারণ ত ঐখানে। রাষ্ট্রীয় ভেদবুদ্ধিকে য়ুরোপ দীর্ঘকাল ধরে পূজা করে এসেচে। অপদেবতার পূজা অতি ভয়ঙ্কর,—কারণ তাতে উপস্থিত কিছু ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সেই ফল বিষফল, এবং তার বিষ একদিন হঠাৎ অনপেক্ষিত মুহূর্ত্তে সাংঘাতিকরূপে নিজেকে জানান্ দেয়। য়ুরোপ আজ সে কথা জান্তে পারচে—কিন্তু জেনেও নিজেকে সাম্‌লাতে পারচেনা। আমাদের আশ্রমের দীক্ষায় যে-প্রার্থনা-মন্ত্রকে আমাদের কাছে ধরেচে, সে হচ্চে অসতো মা সদ্‌গময়—অসত্যবুদ্ধি থেকে আমার চিত্তকে সত্যের মধ্যে মুক্তি দাও। যাঁরা এই মুক্তিকামী, যাঁরা সকল মানুষকে এই মুক্তি দিতে চান তাঁরা সকল দেশ থেকে এইখানে আসুন। সর্ব্বমানবের যে সাজি তাতেই দেশবিদেশের সাধনার ফুল ও ফল একত্র সাজিয়ে আমরা বিশ্বদেবতাকে উৎসর্গ করব। একদিন আমরা বলেছিলেম বিদেশীফুলে আমাদের দেবতার পূজা হয় না—কিন্তু আমাদের এখানে আজ আমরা যেন বল্‌তে পারি সকল দেশের ফুল ছাড়া দেবতার পূজা সম্পূর্ণ হতেই পারে না। মৃত্যোর্মামৃতংগময়—হে পরমাত্মন্, যে মোহ ছোটর মধ্যে মৃত্যুলোকে আমাদের ধরে রাখে তার বন্ধন থেকে আমাদের চিত্তকে অমৃতলোকে মুক্তি দান কর।

গান

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়
পূর্ব্ব-দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়।

এস অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়।
এস নব জাগ্রত প্রাণ
চির যৌবন-জয়গান।
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা
জড়ত্ব নাশা
ক্রন্দন দূর হোক্ বন্ধন হোক্ ক্ষয়।

---

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক্ জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক্ জয়।
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক্ জয়।
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক্ জয়।
এস নির্ম্মল এস এস নির্ভয়
তোমারি হউক্ জয়।
প্রভাত সূর্য্য এসেছ রুদ্র সাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক্ জয়।

---

## ৮ই পৌষ ১৩২৯

( আমবাগানে প্রাতে প্রাক্তন ছাত্রদের বাৎসরিক সভায় )

এই আটই পৌষে প্রতিবৎসর আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে যে সভা হয়, এতে প্রায় আমাদের বাইরের কাউকে না কাউকে সভাপতি করা হয়। কারণ আমরা যারা এর ভিতরে থেকে কাজ করি তারা হয়ত এর সম্পূর্ণ রূপটি সকল সময়ে দেখতে পাই না; বাহিরের যাঁরা একে দেখছেন এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করেছেন তাঁরা এসে মনের ভাব প্রকাশ করলে আমাদের কাজের সহায়তা হয়, উৎসাহ বাড়ে।—আজও আশা করেছিলুম বাইরের কাউকে সভাপতি করে তাঁরই মুখ থেকে কিছু শুনব। কিন্তু এর অনুষ্ঠাতা যাঁরা, তাঁরা আমাকেই আজ সভাপতি করতে চেয়েছেন। আমার মনে হল এর বিশেষ একটু কারণ আছেও বা। সম্প্রতি আমি দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে বিশ্বভারতীর কাজ নিয়ে দীর্ঘকাল আশ্রম থেকে দূরে ভ্রমণে রত ছিলুম—তাই নানা দেশের নানা লোকের চোখ দিয়ে একে দেখবার অবকাশ আমার হয়েছে। যখন আমরা আমাদের কর্ম্মের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকি তখন উপস্থিত প্রয়োজনের নানা ছোটখাট খুঁটিনাটি অত্যন্ত বড় আয়তন নিয়ে আসে, দৃষ্টিকে একেবারে অবরুদ্ধ করে দেয়। তাই দূরে গিয়ে এই সমস্ত অবরোধের উপরে উঠে আশ্রমের বৃহৎ পরিচয়টি গ্রহণ করার খুব প্রয়োজন আছে। আমি সেই দিক থেকে প্রাত্যহিক কর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরের দিক থেকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কিছু বলতে ইচ্ছা করি।

বীজ আপন অন্তর্নিহিত সঙ্কল্পকে আবৃত করে' কেবল ক্ষুদ্র নিজেকেই প্রকাশ করে। যে মুহূর্ত্তে তার অঙ্কুর উদ্গম হয়, পূর্ব্বের সঙ্গে তার পরের পরিচয়ের পার্থক্য তখন এতই অত্যন্ত হয় যে মনে হয় বীজের সঙ্গে বুঝি বা তার কোনও সাধর্ম্ম্য নেই। কিন্তু বস্তুত বীজ যখন আপন ক্ষুদ্র রূপটিকে পরিহার করে তখনি তার সত্য পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বীজ বহুদিন প্রচ্ছন্নভাবে যে সাধনা বহন

করছিল অঙ্কুর উদ্গম হবামাত্র তারই বৃহৎ রূপটি প্রকাশিত হয়।

এতদিন বৎসরে বৎসরে আমাদের বালকদের নিয়ে এখানকার ব্যবস্থা শিক্ষাদীক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করেছি, তাদের কল্যাণ সাধনের পথে যে সব বাধা আছে তা দূর করবার, চেষ্টা করেছি, তার সফলতা নিষ্ফলতার সম্বন্ধে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু এই সমস্তকে ছাড়িয়ে উঠে আজ আশ্রম যে মূর্ত্তি ধারণ করেছে এক বৎসর পূর্ব্বে তা আমরা স্পষ্ট করে দেখিনি।

এ সম্বন্ধেই আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের বিশেষ করে বলা দরকার হবে। একদা তাদের আশ্রয় এখানে যা ছিল তার পরিণাম কোথায় দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে তা বলতে হবে। তাদের কাছে এটা এত নূতন ঠেকতে পারে যে তারা ভাবতেও পারে যে পূর্ব্বের সঙ্গে পরের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

আজ আমরা মনে করচি আমরা নিজের ইচ্ছায় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলুম। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এক সময়ে আমরা বল্লুম বটে এখানে শিক্ষার ব্যবস্থাকে বড় করব, ভারতীয় সকল শাস্ত্রআলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার এখানে সমাবেশ হবে, তাহলেই এখানে শিক্ষার যে আয়োজন করেছি তা পূর্ণাঙ্গ হবে। এই বলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছি। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা যিনি, যিনি আমাদের অগোচরে কাজ করেন এবং আমাদের চিত্তকে উপাদান করে বড় বড় জিনিস গড়ে তোলেন, তিনি পিছনে থেকে একে চালনা করছিলেন, এবং মনের মত করে গড়ে তুলছিলেন। দেখলুম আমাদের হাতে গড়া পরিধির মধ্যে এ কুললো না, তার চাইতে এ বড় হল। সমস্ত বিশ্বের অতিথি দ্বারে এসে এর কাছে অন্ন দাবী করেছেন, অনাহূত হয়ে এসেছেন, এই অতিথিসেবার মস্ত দাবীর সঙ্গে আমাদের কর্ম্মের আয়োজনকে মিলিয়ে চলতে হবে। একথা বলতে পারব না যে, আমরা পাঁচজনে মিলে যা গড়েচি তাই চূড়ান্ত; আমাদের এই গড়া জিনিষের সঙ্গে আর-সব কিছুকে মিলে চলতে হবে। আমার মন অন্তত এমন কথা বলে না, —আমি জানি না আমার সহকর্ম্মীরা, আশ্রমবাসী আমার সুহৃদরা কি মনে করছেন। বিশ্বভারতীকে আশ্রয় করে একটি বাণী এসেছে, তাকেই কার্য্যে পরিণত করা, জীবনে ব্যবহার করা, আশ্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে আমাদের চিত্তকে অনুকূল করতে হবে। যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, করছেন, যাঁদের সঙ্গে যোগে আমাকে কাজ করতে হবে তাঁদের অত্যন্ত উৎসুক হয়ে ডেকে বলচি—সমস্ত যুগের বাণী আজ দ্বারে এসেছে, সমস্ত চিত্তকে অনুকূল করে তাকে গ্রহণ করুন এই আমার একান্ত ইচ্ছা!

অব্যক্ত বাণী মানুষের ইতিহাসে ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়, সে কোনও বিশেষ যুগের নয়, সে সর্ব্ব যুগের। বৃন্তের এক প্রান্তে যে ফুলটি ফোটে সে ফুল সেই বৃন্তটুকুর নয়, সমস্ত গাছেরই সে। মানুষের ইতিহাসে একমাত্র যে কথাটি চিরদিনই আছে আজকের যুগে সেই চিরযুগের চিন্তাটি সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সে হচ্চে এই যে মানুষ সমস্ত মানুষের মধ্যেই সার্থক। এই সত্য প্রাচীন মন্ত্রে ভারতবর্ষে উচ্চারিত হয়েচে। ঈশোপনিষৎ বলেচেন আপন আত্মার মধ্যে সকল আত্মাকে এবং সকল আত্মার মধ্যেই নিজের আত্মাকে যিনি দেখেচেন ন ততো বিজুগুপ্সতে, তিনি আর প্রচ্ছন্ন থাকেন না। অর্থাৎ তাঁর সত্য প্রকাশিত হয়।

মানুষের ভিতরকার এই যে পরমসত্য মানুষের ইতিহাসে ব্যক্ত হবার চেষ্টা করচে সব সময়ে তার যে আনুকূল্য দেখতে পাই তা নয়। অনেক সময়েই উল্টো দেখি। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে ভগবানের শত্রুতা করেও তাঁকে পাওয়া যায়—শত্রুতার দ্বারা পরাভূত হয়ে সত্যকে পাই। মৈত্রীসাধনা এবং বৈরসাধনায় মিলে সত্যের সাধনা হচ্চে, ইতিহাসে এইত দেখতে পাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির ভেদ বিভেদ নিয়ে যারা মাতামাতি করেছে তারা, সত্যের বিরোধী হয়েছে। তারা মনে করেছে ভেদবুদ্ধিকে জয়ী করেই বুঝি মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমরাও আজকের দিনে ঈর্ষাভরে ভেবেছি এই ভেদবুদ্ধির সাধনা করেই আমরা ধনী হব মানী হব প্রবল হব। ভুলে গিয়েছি আমাদের শাস্ত্রেই

বলেছে অধর্ম্মের দ্বারা তখনকার মত মানুষের সমৃদ্ধি হয় শত্রুজয়ও হয়, কিন্তু মূলেতে তাকে বিনাশ এসে আক্রমণ করে।

সেই মূলের বিনাশমূর্ত্তি মানুষ আজ উপলব্ধি করচে। জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে যারা পূজার সামগ্রী করেছিল, মানুষ দেখেছে অপঘাতে তাদের অভিভব হল। নিজে বড় হব, নিজের জাতকে বড় করব এ অহমিকার দ্বারা মানুষের ভাল হয় না। উপস্থিত মত এতে কাজ হলেও সমস্ত বিশ্বশক্তি তাকে বাধা দেয়। 'বড়বাড়' যার হয় তাকে পড়তেই হয় একথা মুখে মুখে চল্‌চে। বৃদ্ধিটাই তাকে পতনের দিকে আপন প্রকাণ্ড ভার নিয়ে টান্‌তে থাকে।

---

# বিশ্বভারতী সম্মিলনী

## লেভি সাহেবের বিদায় সম্বর্দ্ধনার পরে

### আলোচন সভা

আজ সন্ধ্যায় অধ্যাপক লেভি চলে যাবেন, তাঁকে বিদায় দিতে হবে, তাই বেশী সময় হাতে নেই। আপনারা যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েচেন আপনাদের সকলের সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন যেমন জেগে উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধ্য দিয়ে এর ভিতরকার রূপটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ হয়, কারণ ভিতরের বড় আইডিয়ালকে বাইরে আকার দান করতে গেলে দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে কোনো আইডিয়ালের ভিতরের মহত্ত্বের মধ্যেকার ব্যবধান যখন চোখে পড়ে তখন গোড়াকার বাক্যাড়ম্বরের পরে তা' অনেকের কাছে হতাশার ও লজ্জার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে তোলা কারো একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দু'একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম্ম নয়, প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই তার যথার্থ পরিচয় নয়। হৃদয়, কর্ম্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্ম্মীর সহায়তায় তা ফুটে উঠতে থাকে। তার প্রথমকার চেহারা ভিতরকার সেই সত্যটিকে যথার্থ ব্যক্ত করতে পারে না। এইজন্যই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি কুণ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আদর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণ-সত্যটিকে অন্তরে ধারণ করে রয়েছে,—তা বাইরে থেকে সমাগত অতিথিরা এবং এর কর্ম্মভার প্রাপ্ত ব্যক্তিরা অনেকে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েও গ্রহণ করেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন। এতে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর যথার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি—এমন কি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্ত্তিটিকে না দেখে, এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ সংগ্রহ, প্রভৃতি বাহ্যরূপটিকে দেখ্‌ছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে আমি যে-ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই, বর্ত্তমান কালে সকলের চিত্ত সেদিকে নেই, তাঁরা কতকগুলি আকস্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড় প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিম্বা হয়তো বা আমার নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্যও এর কারণ হতে পারে। হয়তো আমার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অন্যদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আসে, তারই তাতে গরজ আর দায়িত্ব আছে। যদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম্ম দেশের কর্ম্ম হয়ে উঠতে পারছে না।

কিন্তু আমার আশা আছে যে সমস্তই নিষ্ফল হয়

নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিষ বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা সৃজনকার্য্য নিরন্তর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরী হয়ে উঠছে প্রতি শিশুটি পর্য্যন্ত তাদের অবকাশমুখরিত সঙ্গীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে! প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা যে টুকু কর্ম্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে, আশা আছে যে একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষরূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।

আমার মনে হয়েছে যে আমাদের এই প্রদেশবাসীদের মধ্যে (আমি 'দেশ'বাসীর কথা বলছি না) যে সব ছাত্রের উৎসাহ ও কৌতূহল আছে তারা কেন এই বৃক্ষের ফল ভোগ করবে না। বিশ্বভারতীতে আমরা যে-চিন্তা করছি, যে-সত্য সন্ধান করছি,—সেখানে স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা যে তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা যা কিছু দিচ্ছেন, ছোট জায়গায় সেই উৎপন্ন পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপব্যয় হবে। তা অল্পপরিধিতে বদ্ধ থাকলে তাতে সকলের গ্রহণ করবার সুযোগ হয় না। যদিচ শান্তি-নিকেতনই আমার কেন্দ্রস্থল, তবুও সেখানে যারা সমাগত হবে, যাদের হাতে-কলমে কাজ করাতে হবে তারাই যে শুধু আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগ্য তা তো নয়। তাই আমার মনে হয়েছে, এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুরা আমাকে বলেছেন, যে, বিশ্বভারতীতে যে-সৃষ্টি হচ্ছে, যে-সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে তা' যাতে কলকাতার ছাত্রমণ্ডলীও জানতে পারে,—যাতে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যার চর্চ্চা হচ্ছে না—সেজন্য সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলুম কিন্তু অতি সসঙ্কোচে। কারণ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই, ভয় হয়েছিল যে, যে-লোকেরা এতকাল এত ভুল বুঝে এসেছে হয়তো তারা বিদ্রূপ করবে। বড় আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রূপ করার মত এত সহজ জিনিষ আর নেই। যে খুব ছোট সেও কোনো বড় জিনিষে ধুলো দিতে পারে, তাকে বিকৃত করতে পারে।

এই আইডিয়ালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্য্যন্ত নিভৃত কোণে ছিলুম। এত গোপনে আমার কাজ করে গেছি যে, আমার পরমাত্মীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি,—আমি কি লক্ষ্য নিয়ে, কেন, অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে, অবকাশ ত্যাগ করে, কোন্ ডাকে, কোন্ আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি। আমার সহকর্ম্মীরাও অনেকে তা পুরোপুরি জানে না। তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে। এই সকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে দুই ভাবে দেখা যেতে পারে। প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা, দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শ পোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক, এবং আত্মীয়-সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রয়েছে।

কিন্তু লোকে তো একথা বলতে পারে যে, আমাদের এসব ভাল লাগে না, বিদেশ থেকে কেন এসব অধ্যাপকদের আনানো, ভারতবর্ষ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল? যাঁরা একথা বলেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতার এই "বিশ্বভারতী সম্মিলনীর" সভ্য হতে পারেন, তাতে কারো আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ

করে আনি তবে তাঁরা যে তা' শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই কিম্বা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন—এই যেমন ক্ষিতিমোহন বাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বল্লেন, বা আজ যে আচার্য্য লেভির বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা হল। এই পণ্ডিত বিদেশী হলেও তো এঁকে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না,—ইনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন, এঁর সঙ্গে যে পরিচয় সাধন হ'ল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করচে। কেন? আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষলপর্ব্ব কেন দেখা দিলে? পূর্ব্বে বলেচি মানুষের সত্য হচ্ছে—আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোট সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্য্যন্ত সত্য ছিল, ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড় হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙ্গে গেছে; জলে স্থলে দেশে দেশে যে সকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সে সব ক্রমশ অপসারিত হচ্চে। আজ আকাশপথে পর্য্যন্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশযানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোন অর্থই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েচে। কিন্তু এত বড় সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল। মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে-সাধনার পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত-যুগের জিনিস; সুতরাং তা বর্ত্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্ত্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েচে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে - নানাজাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে সত্যের সাধনা হচ্ছেনা। যে-সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেচে।

দারিদ্র্য যতই হোক্ বাইরে থেকে দুর্গতি তার যতই হোক এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। এ কথা আজ বোলোনা, "তুমি দরিদ্র পরাধীন তোমার মুখে এসব কথা কেন?" আমাদেরই ত এই কথা। ধনের গৌরব ত এ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ ত ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরমআশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মত বলতে পেরেচে যেনাহংনামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ সেই ত ধনঞ্জয়, সেই ত ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্ব্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করুক। দেশবিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্য সাধনার যে তপস্যা করেচেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে, বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণ গৌরব সাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হ'তে নিযুক্ত হোক্, এই আমাদের সঙ্কল্প।

## বলাকা

৩১

( ২০ জানুয়ারি ১৯২২ )

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে,
কোনোখানে অভাব কিছু নাই
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।

তোমার নিজের বিশ্বে তোমার অধিকারের কোনো থর্ব্বতা, কোনো বাধা নেই। তোমার মধ্যে কোনো অভাব নেই, তুমি পূর্ণ। অভাব যদি না থাকে তবে ত ঐশ্বর্য্য থাকার কোনো মানেই থাকে না। কেননা অভাবের অভাবকে ত ঐশ্বর্য্য বলে না, অভাবের পূর্ণতাকেই বলে ঐশ্বর্য্য। চাওয়া বলে তোমার কিছু নেই সুতরাং পাওয়া বলে তোমার কিছু থাক্‌তে পারে না। তাহলে তোমার ঐশ্বর্য্য তোমার আনন্দ থাকে কই ?

তাই ত একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার করে' লবে ;
এম্‌নি করেই হ'বে
এ ঐশ্বর্য্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।

তোমার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই বলেই আমার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজন সৃষ্টি করেচ। তোমার বিশ্বকে তুমি আমার ভিতর দিয়ে ফিরে পাচ্চ, যেন হারানো ধনকে নতুন করে লাভ কর্‌চ। তোমার যে-সম্পদ তোমার ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ হয়েই আছে সে ত তোমার পক্ষে অতীত, তাকেই তুমি নিয়ত আমার মধ্যে দিয়ে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের অভিমুখে বহমান করে দিচ্চ।

এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্য্যোদয়।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপ্‌নি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়॥

প্রতিদিনের জাগরণ দিয়ে আমি প্রতিদিন সোনার সূর্য্যোদয় কিনে থাকি। আমাকে যদি না কিন্‌তে হত তাহলে এ সূর্য্যোদয়ে কোথাও কোন আনন্দ থাক্‌ত না, এ সূর্য্যোদয়ে প্রভাতী গান জাগ্‌ত না। প্রতিদিন এ'কে নূতন করে পাই বলেই ত এ'তে আনন্দের মূল্য লাগে। এ'কে যাঁর পেতেই হয় না তাঁর কাছে এর আনন্দ কোথায় ? তাই ত আমার পাওয়ার ভিতর দিয়েই তোমার প্রভাতের আনন্দ তোমাকে স্পর্শ করে।

তোমার হাতে রসের পরশপাথরখানি আছে। কিন্তু তোমার মধ্যে যদি রস সম্পূর্ণ হয়েই থাকে তাহলে সেই পরশপাথরখানিকে তুমি চিন্‌বে কি করে ? ক্ষণে ক্ষণে তুমি তাকে যাচাই করবে বলেই ত আমি আছি। তোমার প্রেমের স্পর্শমণি লেগে আমার চিত্ত সোনা হয়ে ওঠে সেই সোনাই তোমার যথার্থ সম্পদ ; আমার অভাব, আমার অপূর্ণতা, আমার বাধার ভিতর দিয়েই তুমি তাকে লাভ কর। তোমার পরিপূর্ণতা যখন আমার শূন্যকে পূর্ণ করে তখনি তুমি আপন পূর্ণতার স্বরূপটিকে নতুন নতুন করে দেখতে পাও,—তোমার প্রেম আমার প্রেমের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে তোমার কাছে পৌছয়—তোমার কাছে তোমার প্রেমের পরিচয় আমারই মধ্যে।

---

## সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

(বিশ্বভারতীর ক্লাসে আচার্য্য উইন্‌টারনিট্‌সের প্রথম বক্তৃতা )

৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৩

এটা খুবই আশ্চর্য্য লাগে যে আমি একজন ইউরোপীয় ভারতে এসেছি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। ইউরোপেও আমার বন্ধুরা একথা শুনে আশ্চর্য্য

হয়েছিলেন। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আমি সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস শুধু ভারতের ইতিহাস বলে, আলোচনা কর্‌ছি না, এ ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসের একটা বড় অংশ বলেই আলোচনা কর্‌ছি। যে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছি এ সাহিত্য তিন হাজার বছর থেকে চলে এসেছে, এতে ধর্ম্ম গ্রন্থ, নাট্য, কাব্য, ব্যাকরণ কিছুরই অভাব নেই। এ সাহিত্য শুধু ভারতে আবদ্ধ নয়, এর প্রভাব চীন, তিব্বত, জাপান, শ্যামে বিস্তার করেছে, এর প্রভাব আধুনিক ইউরোপেও পৌঁচেছে—বিশেষতঃ গল্পসাহিত্যে ও দর্শনে।

ইউরোপে সংস্কৃত সাহিত্য যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বেশী সংখ্যক পণ্ডিত বোধ হয় জার্ম্মান। যে সব ইংরাজ পণ্ডিত Prinsep, Colebrooke, Jones প্রথম এর আলোচনা সুরু করেন—তাঁদের কাছে আমরা ঋণী। যে সব ভারতীয় পণ্ডিত Buler, Kielhorn, Maxmuller প্রভৃতিকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, শঙ্কর পণ্ডিত, তেলাং—প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। আবার ফরাসীদেশের প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Chezy যিনি শকুন্তলা সম্পাদন করেন, Burnouf, Senart, Sylvain Levi এঁদের কথাও বাদ দেওয়া যায় না। এ ছাড়া Kern La Ve Le Pousainর নাম করা যেতে পারে।

১৮১৯ সালেSchegel যখন প্রথম সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তিনি খুব কম বই পেয়েছিলেন, এখন কিন্তু সংস্কৃত পুঁথির তালিকায় হাজার হাজার বইএর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এ সব বই কেবল সংস্কৃত ভাষায় লেখা, তা ছাড়া অন্যভাষায় লেখাও অনেক বই রয়েছে। কিন্তু এত বেশী বই থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত সাহিত্যের ঠিক প্রকৃত ইতিহাস এখনও অন্ধকারে ঢাকা রয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, সংস্কৃত বইএর রচনার তারিখ ঠিক করা শক্ত। অনেক বইতে কোন তারিখই দেওয়া থাকে না। আবার অনেকে মনে করেন যে অনেক বই সেই আদিকাল থেকে চলে আস্‌ছে। তা ছাড়া অনেক বই একজন লেখকের রচনা নয়; অনেক পণ্ডিত মিলে লেখা, তার আবার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, লিপিকাররা নিজেদের ইচ্ছামত কত বাড়িয়েছেন।

পুঁথির বয়স ঠিক করার পক্ষে—শিলা বা তাম্রলিপি খুব সাহায্য করে। অশোকের শিলালিপিতে আমরা অনেক বৌদ্ধ বইয়ের উল্লেখ আছে দেখ্‌তে পাই। এ বিষয়ে গুপ্তলিপিও আমাদের অনেক সাহায্য করে। যে-সব বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনূদিত সংস্কৃত চীনা বই থেকেও আমরা সংস্কৃত বইয়ের বয়স স্থির করতে পারি।

এর থেকে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, যে—ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কবে থেকে? ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি—উত্তর সেমেটিকদের কাছ থেকে ধার করা। অশোকের সময় এ লিপি প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ লিপি হঠাৎ অশোকের সময় দেখা দেয় নি, তার উদ্ভবের জন্য অনেক সময়ের দরকার হয়েছিল। বেদেতে আমরা লিপির কোন উল্লেখ পাই না। বিনয়পিটকে দেখি যে ধর্ম্মগ্রন্থ শোনা ও কণ্ঠস্থ করার কথা আছে, কিন্তু সেগুলা লিখে রাখার কোন ব্যবস্থা নাই। তবে কি আমরা বলব যে সে সময়ে লেখার কোন ব্যবস্থা ছিল না? এখনও আমরা ত দেখি অনেকে শাস্ত্র কেবল মুখস্থ রাখেন, তবে আমরা কি বলব যে এখনও লেখার প্রথা নেই? অনেক মহাযান বইতে দেখা যায়—যে পুঁথি নকল করা খুব পুণ্য কাজ। প্রাচীন-কালে লেখারপ্রথা ব্রাহ্মণরা পছন্দ করতেন না, কারণ তাঁরা ইচ্ছা করতেন না যে শাস্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ হ'ক আর সাধারণ লোকে সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'ক। তাতে তাঁদের স্বার্থের হানি হবার সম্ভাবনা ছিল। সেই জন্য প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ মুখেমুখেই প্রচারিত হত। উপনিষদে আমরা দেখি যে ছাত্ররা আচার্য্যের নিকট যেত এবং তাঁর কাছ থেকে মুখে মুখে শিক্ষা করত। বেদও এই রকম মুখে মুখে চলে এসেছে, তাতে একটা লাভ এই হয়েছে যে পুঁথি-নকল-নবিসেরা নিজেদের খেয়াল মত বেদের উপর কলম চালাতে পারেন নি।

অশোকের সময় যে-লিপি প্রচলিত দেখতে পাই সেটি Buhler সাহেবের মতে North Semetic দের কাছে থেকে ধার করা। ভারতীয় বণিকেরা ব্যবসার খাতিরে মেসোপটেমিয়াতে যেত এবং সেই সূত্রে তাদের কাছ থেকে সেই লিপি নিয়েছিল। পরে ব্রাহ্মণরা সেই লিপি রাজাদেশ লেখবার জন্য ও অন্যকাজের জন্য ব্যবহার করেন। সেই লিপি পরে ব্রাহ্মীলিপি বলে খ্যাত হয়।

ভারতের জলবায়ুর এমনি গুণ যে এদেশে কোন পুঁথি বেশীকাল স্থায়ী হয় না। পুরাণ পুঁথি এদেশে পাওয়া শক্ত। যে-সব পুঁথি তালপাতায় বা ভূর্জপাতায় লেখা হত, তা তিন চার শতের বেশী পুরাণ নয়। নেপালে দশম শতাব্দীর আর জাপানে অষ্টম শতাব্দীর পুঁথি পাওয়া গেছে। মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে বালুরাশির নীচে A. Stein সাহেবের চেষ্টায় অনেক বৌদ্ধ পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মুসলমানদের সময় থেকে (১২০৩ খৃঃ অঃ) এদেশে কাগজে পুঁথি লেখার প্রথা চলিত হয়েছে।

আগে ভারতেও লাইব্রেরী বা সরস্বতী ভাণ্ডাগার বিদ্যমান ছিল। তাতে পুঁথি সংগ্রহ করা হত। কবি বাণের এই রকম একটি লাইব্রেরী ছিল, তাঁর একজন লোক ছিল বই পড়ে শোনাবার জন্য। ভোজরাজেরও একটি পাঠাগার ছিল। জৈনদের এখনও অনেক লাইব্রেরী আছে, তাতে অসংখ্য পুঁথি আছে। Colebrooke প্রথম পুঁথি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন, পরে ভারত গবর্ণমেণ্টও এ কাজে হাত দেন। অনেক পুঁথি এখনও ছাপা না হয়ে লাইব্রেরীতে পড়ে রয়েছে। সেগুলি প্রকাশিত হওয়া দরকার। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি সম্পাদন করার ভার নতুন পণ্ডিতদের দেওয়া হয়। ভারতেও কেন সে প্রথার চলন হয় না?

সাধারণতঃ, ভারতীয় সাহিত্য বলতে আমরা শুধু সংস্কৃত সাহিত্য বুঝব না, তার সঙ্গে (১) মুণ্ডা—সাঁওতাল (২) দ্রাবিড়ীয় ভাষা—তামিল, তেলেগু ভাষার সাহিত্যের কথাও ধরব। সংস্কৃত সাহিত্যকে মোটামুটি এ ভাবে ভাগ করা যেতে পারে ;—

(১) প্রাচীন সংস্কৃত (Ancient High Indian)
—প্রাচীন সংস্কৃত—বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক
— রামায়ণ ও মহাভারত

(২) মধ্য যুগ—পালি—বৌদ্ধ সাহিত্য
—প্রাকৃত—জৈন সাহিত্য
—অপভ্রংশ, পৈশাচী—

(৩) আধুনিক যুগ—বাংলা, হিন্দী, মারাঠি, প্রভৃতি।

---

# আলোচনা

## জালাল উদ্দীন রুমি

রুশীয় অধ্যাপক বগডানফ্ (Bogdanov) বিশ্বভারতীতে সম্প্রতি যোগদান করিয়াছেন। ইনি পশ্চিমের অনেক ভাষা জানেন; পারসীক ভাষায় ইনি সুপণ্ডিত। পারস্যদেশে দশবারো বছর ছিলেন। তাহার পর পিটারসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪।৫ বছর পারসী ভাষার অধ্যাপনা করিয়াছেন।

গত ২০শে পৌষ সান্ধ্য উপাসনার পর বিশ্বভারতীর বিশেষ সম্মিলনে একটি পারসিক কবিতা আবৃত্তি করার পর তিনি তাহার সারাংশ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া বলেন।

এই কাহিনীটি পারসী কবি জালালউদ্দিন রুমি কর্ত্তৃক রচিত। তাঁহার এই ধরণের প্রত্যেক গল্পেই কিছু কিছু দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত থাকে।

গল্পের সারাংশ :—পারস্যদেশের একজন বণিক ভারতবর্ষে বাণিজ্যে রওনা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন দাসদাসীর নিকট গিয়া কাহার জন্য কি আনিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার একটি ভারতবর্ষীয় তোতা ছিল। তিনি তোতার নিকট গিয়া বলিলেন ;—

"আমি তোমার দেশে যাইতেছি! তোমার জন্য সেখান হইতে কি আনিব ?"

তোতা বলিল "প্রভু, আমার জন্য কিছু আনিতে হইবে না। তবে যদি আমার দেশে বনেজঙ্গলে তোতা দেখ ত তাহাদের বলিয়ো যে আমি পারস্যে খাঁচায় বন্ধ হইয়া আছি। আমি যখন বন্ধনজর্জ্জর পরাধীন তখন তাহাদের কি আসমানে উড়িয়া বেড়ানো উচিত! তাহাদের কাছ হইতে ইহার জবাব আনিয়ো!"

বণিক ভারতবর্ষে গিয়া তাঁহার বাণিজ্য সমাপ্ত করিলেন। ফিরিবার পথে এক বনে তিনি কতকগুলি তোতাকে উড়িতে দেখিলেন। তিনি ঘোড়া থামাইয়া তাহাদিগকে আপনার তোতার কথা বলিতে লাগিলেন কিন্তু কেহই কান দিল না। শুধু একটি তোতা শুনিল ও কথা শেষ হওয়া মাত্র মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। বণিক ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। হঠাৎ এইরূপ দুঃখের সংবাদ শুনিয়া তোতা মরিয়া গেল ভাবিয়া তিনি অনুতপ্ত চিত্তে দেশে ফিরিলেন।

তোতাকে কিরূপে এই দুঃখের খবর দিবেন ভাবিয়া বণিক তাহার কাছে গেলেন না। একদিন তোতা নিজেই জিজ্ঞাস করিল "প্রভু, আমার জবাব আনিয়াছ কি?"

বণিক বলিলেন, "তোমার খবর আমি কতকগুলো তোতাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতে এক বেচারি এতই আঘাত পাইল যে তখনই মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল।"

এই কথা শুনিয়া খাঁচার তোতাটিও দাঁড় হইতে পড়িয়া মরিয়া গেল। বণিক নিজের বোকামি দেখিয়া আরো দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কি করিবেন—উপায় নাই তাই বিষণ্ণচিত্তে ঘরের বাহিরে গিয়া খাঁচা খুলিয়া তোতাটি ফেলিয়া দিলেন। মাটিতে পড়িবামাত্র তোতা উড়িয়া বাগানের গাছের সকলের উঁচু ডালে বসিল। বণিক ইহা দেখিয়া বোকাবনিয়া গেলেন। তিনি তোতাকে এ সমস্তের অর্থ বুঝাইয়া দিতে বলিলেন।

তোতা কহিল, "যে তোতাটি আপনার কথা শুনিয়া মরিয়া গিয়াছিল সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে আমারও মরা দরকার। সে শান্ত হইয়া বুঝাইয়া দিল যে আমিও যেন আর ছটফট না করি, আসক্তির বন্ধন আর না বাড়াই, আমার গানই আমাকে বন্দী করিয়াছে। তাই যদি আমি গান বন্ধ করিয়া দি তাহা হইলেই মুক্তি পাইব। এখন দেশে চলিলাম। আমাকে মুক্ত করিবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আশা করি আসক্তির বন্ধন আপনারও মোচন হইবে, আপনিও আমার মত একদিন মুক্তি পাইবেন।"

বণিক বলিলেন, "তাহাই হোক্, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও! ভগবান তোমাকে নির্বিঘ্নে দেশে পৌঁছাইয়া দিন।"

---

## লেভি সাহেবের বিদায়-সভায় বক্তৃতা

Acharyya,

When I came to France, I came to you attracted by your reputation as a scholar; and I wanted you to attend the opening ceremony of *Visvabharati* and help the students and scholars in their pursuit of truth and you kindly accepted my invitation. When you first arrived at Santiniketan, we received you in our Indian fashion, in our own ceremony of welcome to a scholar. But we made a great discovery while you were staying with us and while we came in close touch with your personality. To us, you were not a mere scholar but an ideal teacher for whom the love of truth and the love of man are the same. Therefore our first ceremony was not complete.

Today we are bidding you farewell and this is the proper time for the ceremony of acceptance. For, some partings are not real. A scholar can be received in a country and he can depart when his function is over. But you, who remained with us as a teacher, even when you take your leave you take your place in our heart and we regret we did not get the fullest opportunity of coming into closer touch with you. These words are not by way of a

more formal appreciation of you, but they come from the depth of our heart. The greatest homage that we can pay you today is, to let you know that we accept you as one of us, that we offer you our love, and that therefore you can never part from us. Today's ceremony is that of parting and acceptance. The real will will come to our heart. This ceremony we celebrate in Indian manner, and we accept you, who accepted the India of all times.

---

## আশ্রম-সংবাদ

গত ৩রা পৌষ ছাত্রদের বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগের ছাত্র শ্রীমান বিনায়ক মসোজী এবং পূর্ব্ব বিভাগের ছাত্র শ্রীমান সুশীলচন্দ্র দেববর্ম্মার নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন চৌধুরী, গোবিন্দ চৌধুরী, অতুলকৃষ্ণ বসু প্রভৃতির চেষ্টায় এবারও প্রাক্তনদের যশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল।

৭ই পৌষ অতি প্রত্যুষে বৈতালিক দল সময়োপযোগী মধুর সঙ্গীতে আসন্ন উৎসব দিবসের প্রভাত ঘোষণা করিয়াছিল। আশ্রমবাসী ও অতিথিবর্গ নিদ্রার আবেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই রসন চৌকীর সুললিত রাগিণীতে উৎসবের উদ্বোধন হয়। নির্দ্দিষ্ট প্রাত্যকৃত্যাদি সমাপনান্তে সকলে মন্দিরে সমবেত হইলে পূজনীয় গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করেন। উপাসনা শেষ হইলে, "কর তাঁর নাম গান" সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে সকলে ছাতিমতলায় গিয়া মহর্ষির সাধন-পূত আসনখানি প্রদক্ষিণ করেন।

দ্বিপ্রহরে, বার্ষিক মেলায় বিবিধ আমোদপ্রমোদ ও ক্রীড়াকৌতুক আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তন; কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেলা প্রাঙ্গনের অন্যস্থলে বাউলদিগের গান হইতেছিল। কুস্তীর কৌশলপ্রদর্শন কিঞ্চিৎপরেই আরম্ভ হয়। কলিকাতা হইতে কয়েকজন পালোয়ান এই উপলক্ষে আসিয়াছিল; তাহাদের ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া সকলেই খুসী হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে সাঁওতালদের নাচ আরম্ভ হয়। দলে দলে সাঁওতালরা আসিয়া নৃত্য গীত আনন্দে সমস্ত প্রাঙ্গন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে।

বিবিধ আমোদে দিন শেষ হইলে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে খোলা মাঠের মধ্যে বায়স্কোপের ছবি দেখান হয়। মেলায় সমাগত স্থানীয় ও দূরবর্ত্তী পল্লীবাসিগণের উহা খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। বায়স্কোপ দেখান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বাজী পোড়ান আরম্ভ হয়।

৮ই পৌষ এই দিন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রবর্গের বার্ষিক সভা হয়; পূজনীয় গুরুদেব এ বৎসর সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। এই আশ্রমের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন স্থানান্তরে তাহার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে। মধ্যাহ্নে মেলায় যাত্রাগান হয়; পূর্ব্বদিনের মত বাউলগানও চলিয়াছিল। তীরছোড়া ও মেঠো ঘোড়াদের দৌড়ের প্রতিযোগিতাও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। তীরছোড়ায় আশ্রমের কেহ কেহ সাঁওতালগণের প্রতিযোগী হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় বায়স্কোপ ও ম্যাজিকলণ্ঠনের ছবি দেখান হয়, তৎপরে পূর্ব্ব রাত্রির মত বিবিধ আতসবাজী পোড়ান হয়।

যেমন মেলায় স্থানীয় পল্লীবাসীদের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল আশ্রমের ভিতরেও তেমনি নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। পূজনীয় গুরুদেবের বৈকুণ্ঠের খাতা নামক বহিখানি এই উপলক্ষ্যে অভিনীত হয়। উদ্যোক্তৃগণের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

৯ই পৌষ সকালে ছাতিমতলায় আশ্রমের মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ সভা হয়। দ্বিপ্রহরে বিশ্বভারতীপরিষদের বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিকালে আশ্রমের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা হয়। কোন পক্ষ ইহাতে জয়লাভ করিয়াছিলেন অনেক গবেষণায়ও

আজও তাহা জানা যায় নাই। রাত্রে Macbeth act II এবং মুদ্রারাক্ষস ৩য় অঙ্ক অভিনীত হয়।

১০ই পৌষ খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে উপাসনা হয়। পূজনীয় গুরুদেব আচার্য্যের আসন হইতে একটী অতি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ দিয়াছিলেন।

এবারকার উৎসবে দুই শতাধিক অতিথি সমাগত হইয়াছিলেন। ডাঃ তারাপুরওয়ালা, মৌলভী শহীদুল্লাহ, ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী, অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মেলা ও প্রদর্শনী—

এবারকার মেলা দুইদিন স্থায়ী হইয়াছিল ও তৎসঙ্গে গ্রাম্যশিল্প ও কৃষি ইত্যাদির উৎসাহদানের জন্য ঐ সঙ্গে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় বার খানি ঘরে বিবিধ দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনী মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য।

বিশ্বভারতীর সুরুল কৃষি বিভাগের উৎপন্ন শস্য ও শাক্-সবজী প্রদর্শিত হয়। উদ্যান রচনা ও বর্ত্তমান উন্নত প্রণালীতে পাশ্চাত্য যন্ত্রাদির সাহায্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত ও আগাছা দূরীকরণ সম্বন্ধে উক্ত কৃষিবিভাগ হইতে হাতেকলমে দেখাইবার বন্দোবস্ত ছিল। বহু পল্লীবাসী অনায়াসে ঐ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছে। কৃষির সংসৃষ্ট গোপালন্ পক্ষীপালন প্রভৃতি সম্পর্কেও লোকদিগকে দেখাইবার আয়োজন ছিল। একটী বৃহৎকায় বৃষ ও শ্বেতকায় লেগহরণ মুরগী গুলি বিশেষভাবে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

সরকারী কৃষিবিভাগ হইতেও সুরুল কৃষিবিভাগের সাহায্যে এবং উদ্যোগে একটী ষ্টল খোলা হয়। উহাতে বিবিধপ্রকারের শস্যের বীজ নানাপ্রকারের উৎকৃষ্ট ফলমুলাদি প্রদর্শিত হয়। এতদ্ব্যতীত পল্লীবাসীরাও এই বিভাগে কিছু কিছু দ্রব্য উপস্থিত করিয়াছিলেন।

শিল্প—খাগড়ার বাসন, মুর্শিদাবাদের রেশমী কাপড়, তাঁতের কাপড়, খদ্দর ইত্যাদি জিনিষ প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল। স্থানীয় পল্লীশিল্পের ষ্টলটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুরুল পল্লীসংস্কারের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় এই বিভাগে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিষ সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে চাষী মেয়েদের হাতের বোনা মাদুর, পাখা, শিকে—কাঁথা ও মাটিরঘর সাজাইবার বিবিধ জিনিষ বিশেষভাবে শিল্পকলানুরাগীদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব ঐ সকল দ্রব্যের নির্ম্মাতাগণকে স্বর্গীয় দ্বিপেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামে যোগ্যতানুসারে কয়েকটি পুরস্কার দান করিয়াছেন।

চিত্রকলার দিক দিয়াও প্রদর্শনীতে দ্রষ্টব্য জিনিষের আয়োজন ছিল। কলাভবনের ছাত্রও অধ্যাপকগণের আঁকা ছোট ছোট বহু কার্ড দেখান হইয়াছিল। আশ্রমের মেয়েদের হাতের তৈরী পুতুল, খেলানা ইত্যাদিও প্রদর্শিত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল ভারতীয় রুচি—অনুসারে সজ্জিত খড় দিয়া ছাওয়া কুটীরটি। সম্পূর্ণ দেশীয় আসবাবে সজ্জিত ও আলপনা দেওয়া ঘরখানি দেখিয়া দর্শকদের মনে অপূর্ব্ব আনন্দ হইয়াছিল। আশ্রমের মহিলা কর্ম্মীরা এই ঘরটি সাজাইয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কার্য্যকরী শিল্পের বিভাগে সুরুল কৃষিবিদ্যালয়ের ও সরকারীবয়ন বিভাগের কয়েকটি তাঁত প্রদর্শিত হয়। সুরুলের তাঁতের সঙ্গে সুত্ররঞ্জনের পদ্ধতিও লোকদের দেখান হয়। এতদ্ব্যতীত চর্ম্ম পরিস্কার ও পালিশ করার প্রদর্শনীও ছিল। বলা বাহুল্য এ বিভাগেও সুরুল কৃষিবিভাগের চর্ম্মাদি প্রদর্শিত হয়।

স্বাস্থ্য—এই বিভাগে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপার সুরুলের শ্রীমতী গ্রীণের পরিচালিত শিশুনিরাময় প্রদর্শনীতে সকলকে দেখাইয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বিবিধ ছবি ও জিনিষপত্র দেখাইয়া, এবং কুলি মজুরদের নোংরা ছেলেদের স্নান করাইয়া সাজাইয়া গোজাইয়া হাতে-কলমে মিস গ্রীণ উপস্থিত জনসমক্ষে উপদেশ দিতেছিলেন। বিশ্বভারতীর

কতিপয় ছাত্রী একার্য্যে শ্রীমতি গ্রীণের সাহায্য করিতে-ছিলেন।

মেলার সুবন্দোবস্ত—এবারকার মেলা দুইদিন স্থায়ী করায় পূর্ব্ব হইতেই তাহার সুনির্ব্বাহের জন্য আয়োজন করা—হইয়াছিল। মেলাভূমিতে জল সরবরাহের জন্য একটি চৌবাচ্ছা স্থাপিত হইয়াছিল। এবং মেলাভূমির অদূরবর্ত্তী স্থান যাহাতে দূষিত না হইতে পারে স্বেচ্ছাসেবক ও আশ্রম-সংগঠিত বয় স্কাউটদল তাহার প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। মেলায় সমাগত লোকগণকে সাহায্য করার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। যাহাতে রাত্রিতে কোন প্রকারের চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়া না হইতে পারে তজ্জন্য শ্রীযুক্ত এল কে এলমহার্ষ্ট, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, মিঃ পাটেল, শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, বিনায়ক মসোজি প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে রাত্রি জাগিয়া পাহারার কার্য্য করিয়াছিলেন। সমুদয় ভল্যান্টিয়ারের ও বয়স্কাউটের দলটি দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারি দাস মহাশয়ের অধিনায়কতায় চলিয়াছিল। শ্রীমান মসোজি ও শ্রীমান ধীরানন্দ রায় তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন।

বয়স্কাউট—এই বয়স্কাউটের দলটী শান্তিনিকেতনের ছাত্রগণ ও মোদপুর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীদের ছেলেদের লইয়া সংগঠিত। ইহারা প্রাণপণে না খাটিলে মেলায় সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইত না।

প্যালেষ্টাইন হইতে অতিথি—সম্প্রতি প্যালেষ্টাইন হইতে আশ্রমে মিস ফ্লাউম (Miss Flaum) নামধেয়া ইহুদি মহিলা আসিয়াছেন। ইহার জন্মভূমি রুসিয়ায়। ইনি ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরেজী, ইটালীয় প্রভৃতি সাতটি প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় ভাষায় শিক্ষিতা। কিছুকাল যুক্তরাজ্যস্থ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি এখানকার শিশুবিভাগের ছাত্রদিগকে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিখাইবার ভার লইয়াছেন। জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা দিবার ভারও ইনি লইয়াছেন। ইনি বাংলা ভাষা-শিক্ষা করিতে বিশেষ উৎসুক। তাঁহার ইচ্ছা বাংলা তিনি শিখিয়া তিনি গুরুদেবের সমস্ত গ্রন্থ রুশীয় ভাষায় অনুবাদ করিবেন।

রুশীয় অধ্যাপক—Mr. Bagdanov নামক একজন রুশীয় অধ্যাপক আসিয়াছেন। তিনি বহুপূর্ব্বে St. Petersburg বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব্য ও পারশ্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। এই দুই ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভের জন্য তিনি বহুকাল তুরস্ক ও পারস্যে বাস করিয়াছিলেন। তিনি আগমন করায় পারস্যভাষার একটী ক্লাস খোলা হইয়াছে।

---

## সম্পাদকের নিবেদন

বৎসরান্তে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে আমার সহকর্ম্মীদেরও পাঠকপাঠিকাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে চাই—শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেন, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইঁহাদের বিশেষ আনুকূল্য না পাইলে পত্রিকা পরিচালনা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। 'বলাকা' ক্লাসের পঠিত কবিতাগুলির অনেক গুলির নোট লিখিয়া দিয়া, 'মাটির উপর দস্যুবৃত্তি' প্রবন্ধটির সুন্দর সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়া দিয়া, এবং অন্যান্য নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার সেন আমার ধন্যবাদার্হ এবং কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

৩০শে পৌষ
১৩২৯।

Printed & Published by Jagadananda Roy, at the Santiniketan Press, Santiniketan.